

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান

দাখিল
নবম-দশম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দাখিল নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলুপে নির্ধারিত

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান

দাখিল নবম-দশম শ্রেণি

রচনা
প্রফেসর ইসমাত রুমিনা
সোনিয়া বেগম
গাজী হোসনে আরা
শামসুন নাহার বীঠি
সৈয়দা সালিহা সালিহীন সুলতানা
রেহানা ইয়াছমিন

সম্পাদনা
প্রফেসর লায়লা আরজুমান্দ বানু
প্রফেসর সৈয়দা নাসরীন বানু

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪

পুনর্মুদ্রণ : ২০১৯

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণ :

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমর্প্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরস্তরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান একটি জীবন ও কর্মমূর্খী শিক্ষা। এই শিক্ষা শিক্ষার্থীকে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের চারটি ক্ষেত্র অর্থাৎ গৃহ ও গৃহ ব্যবস্থাপনা, শিশুর বিকাশ ও পারিবারিক সম্পর্ক, খাদ্য ও পুষ্টি এবং বন্ত ও পরিচ্ছদ সম্পর্কিত যথার্থ ধারণা ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। তাছাড়া এই বিষয়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে, গৃহ ও গৃহের বাইরে বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা মোকাবেলা করতে এবং গৃহ পরিবেশে উত্তৃত বিভিন্ন সমস্যা উত্তরণের জন্য দক্ষ ও কৌশলী করে তোলে।

২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে মাধ্যমিক স্তরে প্রবর্তিত পাঠ্যপুস্তক মাদ্রাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উপযোগী করে দাখিল স্তরের পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রবর্তন করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশান্তি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

চেয়ারম্যান

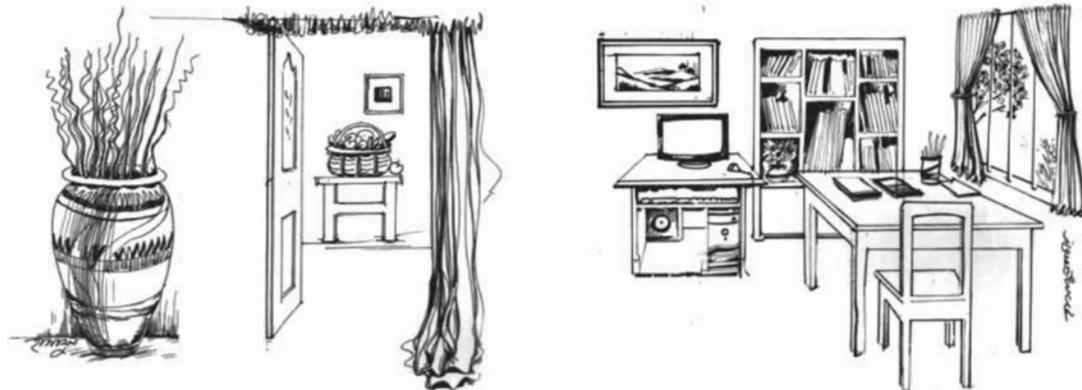
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিভাগ ও শিরোনাম	পৃষ্ঠা
ক বিভাগ : গৃহ ও পারিবারিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা		
প্রথম	গৃহ ব্যবস্থাপনা	২-১০
দ্বিতীয়	গৃহ ব্যবস্থাপক	১১-১৭
তৃতীয়	গৃহসম্পদ	১৮-২৩
চতুর্থ	গৃহসম্পদের ব্যবস্থাপনা	২৪-৩৩
পঞ্চম	গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জা	৩৪-৪৬
খ বিভাগ : শিশুর বিকাশ ও পারিবারিক সম্পর্ক		
ষষ্ঠি	শিশুর বর্ধন ও বিকাশ	৪৮-৫৯
সপ্তম	শিশুর বিকাশ ও পারিবারিক পরিবেশ	৬০-৭০
অষ্টম	কৈশোরের মনোসামাজিক সমস্যা-প্রতিকার ও প্রতিরোধ	৭১-৭৮
নবম	প্রতিবন্ধী শিশু	৭৯-৮৫
গ বিভাগ : খাদ্য ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা		
দশম	খাদ্যের কাজ ও উপাদান	৮৭-১১০
একাদশ	খাদ্যের পরিপাক ও খাদ্য পরিকল্পনা	১১১-১১৮
দ্বাদশ	নিয়মতাত্ত্বিক জীবনযাপন ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা	১১৯-১২৭
ত্রয়োদশ	খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন	১২৮-১৩৯
ঘ বিভাগ : বস্ত্র ও বয়ন তত্ত্ব		
চতুর্দশ	বয়ন তত্ত্ব	১৪১-১৪৯
পঞ্চদশ	পোশাকের শিল্প উপাদান ও শিল্পনীতি	১৫০-১৬০
ষষ্ঠিদশ	বস্ত্র ছাপা ও রংকরণ	১৬১-১৬৪
সপ্তদশ	ড্রাফটিং	১৬৫-১৬৯
অষ্টদশ	পোশাকের যত্ন ও পারিপাট্যতা	১৭০-১৮৪

ক - বিভাগ

গৃহ ও পারিবারিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা



এই বিভাগ অধ্যয়ন করে আমরা—

- গৃহ ব্যবস্থাপনার ধারণা কাঠামো ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারব ;
- গৃহ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পদ্ধতি বা পর্যায় ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে উদ্দুল্প হব ;
- গৃহ ব্যবস্থাপকের গুণাবলি, দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- গৃহ সম্পদের বৈশিষ্ট্য, শ্রেণিবিভাগ ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব এবং সূচুভাবে গৃহসম্পদ ব্যবহারে অন্যকে উদ্দৃশ্য করতে পারব ;
- বাজেটের ধারণা, গুরুত্ব এবং বাজেট তৈরির নিয়ম বর্ণনা করতে পারব এবং পরিবারের জন্য মাসিক বাজেট প্রণয়ন করতে পারব ;
- সময় ও শক্তি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- কাজ সহজে করনের কৌশল বর্ণনা করতে পারব ;
- গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জার উপকরণ ও বিন্যাসের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- গৃহ সজ্জার নামনিক দিক সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব ;
- গৃহে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংরক্ষণের উপায় বর্ণনা করতে পারব ;
- অব্যবহৃত জিলিসপত্র দিয়ে গৃহসজ্জার সামগ্রী তৈরি করতে পারব।

প্রথম অধ্যায়

গৃহ ব্যবস্থাপনা

পাঠ-১ গৃহ ব্যবস্থাপনার ধারণা

নাতাশা, সাইরা, আরিবা ও কয়েকজন বন্ধু মিলে সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা একসাথে ২১শে ফেব্রুয়ারি তোর ৬.৩০ মিনিটে শহীদ মিনারে যাবে। সেখানে উপস্থিত হয়ে সবাই মিলে পুষ্প অর্পন করে শ্রদ্ধাঙ্গলি জানাবে। কিন্তু ২১ফেব্রুয়ারি তোর ৬.৩০ মিনিট পার হয়ে গেল। নাতাশার ঘূম ভাঙলো না। ঘূম থেকে জেগে তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। তার আর শহীদ মিনারে যাওয়া হলো না। এক্ষেত্রে তার উচিত ছিল ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখা অথবা বাবা-মাকে বলে রাখা যাতে তারা তাকে জাগিয়ে দেন। বুদ্ধি, পরিকল্পনা ও সময়টাকে সে ভালোমতো কাজে লাগায় নি। কাজেই বোবা যাচ্ছে এখানে ওর মধ্যে কিছুর অভাব ছিল। বলতে পারো সেটা কি? সেটা হলো ব্যবস্থাপনা।

মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন ধারার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। গৃহে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নানাবিধি কার্যকলাপে ব্যবস্থাপনার বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। পরিবারে বসবাস করে প্রতিটি মানুষ তার কাঞ্চিত লক্ষ্যসমূহ অর্জন করার জন্য বিভিন্ন রকম কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সে কাজের পরিকল্পনা বা কর্মসূচি প্রণয়ন করে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, পরামর্শ করে কাজগুলো সংঘটিত করে, কাজের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং অবশেষে কাজের ভালোমন্দ মূল্যায়ন বা যাচাই করে। তার এসব ধারাবাহিক কার্যকলাপের মধ্যেই গৃহ ব্যবস্থাপনার প্রতিফলন ঘটে।

যে কোনো প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য যেমন ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য তেমনি গৃহকে পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। একটি পরিবারকে তার সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে পরিবার কতগুলো কাজ সম্পাদন করে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জন করতে চেষ্টা করে। যেখানে কিছুসংখ্যক ব্যক্তি কোনো একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংঘবন্ধ হয়, সেখানেই ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয়। সুতরাং প্রতিষ্ঠান হিসেবে গৃহ তথা পরিবারের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন আছে।

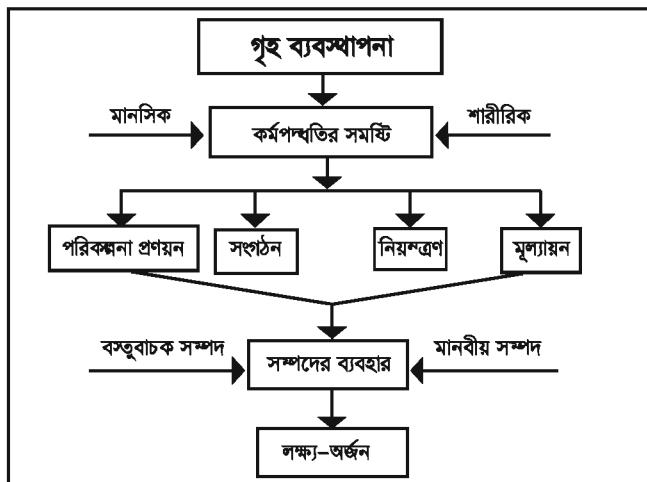
নিকেল ও ডরসি গৃহ ব্যবস্থাপনাকে পারিবারিক জীবনযাপনের প্রশাসনিক দিক বলে অভিহিত করেন। তাঁরা বলেন যে, পারিবারিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য মানবীয় ও বস্তুবাচক সম্পদসমূহের ব্যবহারে পরিকল্পনা, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়ন করাই হচ্ছে গৃহ ব্যবস্থাপনা।

গৃহ ব্যবস্থাপনা হলো একটি ধারাবাহিক গতিশীল প্রক্রিয়া, যার জন্য প্রয়োজন সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং যা কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে সম্প্রসাৰণ করা হয়। গৃহ ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করলে তিনটি বিষয় লক্ষ করা যায়। যেমন :

- কাঞ্চিত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নির্ধারণ
- সম্পদের সঠিক ব্যবহার
- সম্পদ ব্যবহারে ধারাবাহিক কর্মপন্থা-পরিকল্পনা, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়ন।

লক্ষ্য স্থির হওয়ার পর সব রকম সম্পদের ধারণা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হয়। যেমন— কোনো কাজ করতে গেলে প্রথমে কাজের একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা করতে হবে। এরপর পরিকল্পিত

কাজগুলোকে সংগঠিত উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। শেষ ধাপে কাজের ফলাফল যাচাই করে দেখতে হবে যে, কাজটি কতোটা সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে। এভাবে ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম শেষ হলে, আরও নতুন উদ্দেশ্য স্থির হয় এবং তা অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম নতুন করে শুরু হয়।



গৃহ ব্যবস্থাপনার ধারণা কাঠামো।

কাজ – গৃহ ব্যবস্থাপনার ধারণা কাঠামোটির একটি পোষ্টার তৈরি করে প্রেণিকক্ষে প্রদর্শন কর।

পাঠ ২ – লক্ষ্য ও লক্ষ্যের প্রকারভেদ

লক্ষ্য কী?

লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য গৃহ ব্যবস্থাপনার মূল চাবিকাঠি। লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই আমাদের সকল কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয়। যেখানে লক্ষ্য অর্জনের প্রশ্ন রয়েছে সেখানেই ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন দেখা দেয়। সাধারণতাবে বলা যায় ব্যক্তি বা পরিবার কী চায় বা কী করতে চায় তাই হচ্ছে লক্ষ্য। লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সব সময় মানুষের চেতন মনে অবস্থান করে, খুবই স্পষ্টভাবে বোঝা যায় এবং সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। সকল মানুষের মনে সর্বদাই কোনো না কোনো লক্ষ্য বিরাজ করে। একটি লক্ষ্য অর্জন হলেই আমরা নতুন কোনো লক্ষ্য স্থির করে ফেলি। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আমাদের কাজের ধারা নির্ধারণ করে দেয়, ফলে আমরা সে অনুযায়ী এগিয়ে যাই।

প্রতিটি পরিবার ছেট-বড় নানারকম লক্ষ্য পোষণ করে। সাধারণত মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে আমাদের লক্ষ্য স্থির হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো পরিবার অর্থ উপার্জনকে বেশি প্রাধান্য দেয়, আবার কেউ সম্পত্তি বৃদ্ধি করতে চায়, কেউ বা তার সদস্যদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চায়।

লক্ষ্য হচ্ছে একটি কাম্য উদ্দেশ্য, যার সুনির্দিষ্ট পরিধি আছে এবং যা ব্যক্তির কার্যবলিকে নির্দেশ দান করে। লক্ষ্যের নির্দিষ্ট পরিধি থাকতে হবে এ জন্য যে, কাম্য লক্ষ্যটি ব্যবস্থাপনাকের কাছে সুস্পষ্ট না হলে, তা অর্জন করা সম্ভব নয়। লক্ষ্য নির্দিষ্ট হলেই তা অর্জনের কার্যবলি সঠিকভাবে সম্পাদিত হবে। অর্থাৎ লক্ষ্য ব্যবস্থাপনাকে সহজতর করে এবং তাকে সাফল্যের সাথে কার্যকর করতে সাহায্য করে। পরিবারের প্রত্যেকেরই নিজস্ব কিছু লক্ষ্য থাকে। তবে যখন সম্মিলিতভাবে কোনো কাজ স্থির করা হয়, তখন দৃষ্ট করে এবং লক্ষ্য অর্জনও সহজতর হবে।

লক্ষ্যের প্রকারভেদ

নিকেল ও ডরসি লক্ষ্যকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। যথা-

- দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য
- মধ্যবর্তীকালীন লক্ষ্য
- তাৎক্ষণিক লক্ষ্য

দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য

দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যকে স্থায়ী লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ লক্ষ্য সময় সাপেক্ষ এবং এটা সর্বদা মনের মধ্যে বিরাজমান। এ লক্ষ্য মধ্যবর্তী লক্ষ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে বলে এর গুরুত্ব অনেক বেশি।

মধ্যবর্তীকালীন লক্ষ্য

পরিবার তার দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রায়ই মধ্যবর্তীকালীন বা স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্য নির্ধারণ করে থাকে। এ লক্ষ্যগুলো দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যের তুলনায় অধিক স্পষ্ট। সেজন্য এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য অনেক বেশি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

তাৎক্ষণিক লক্ষ্য

এ লক্ষ্য হলো ছেট ছেট লক্ষ্য, যার মধ্যে খুব বেশি একটা কাজের প্রয়োজন হয় না। অল্প কাজ করলেই অনেক সময় লক্ষ্যটি অর্জন করা যায়। অর্থাৎ লক্ষ্য নির্ধারণের সাথে সাথেই তা অর্জন করা যায়।

উদাহরণের সাহায্যে এ তিনি প্রকার লক্ষ্যকে ব্যাখ্যা করা যায়। সোমা নবম শ্রেণির ছাত্রী। সে ভবিষ্যতে প্রকৌশলী হতে চায়। এটা তার দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য। সে বিজ্ঞান বিভাগে পড়ছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উন্নীর্ণ হওয়ার জন্য সে নিজেকে প্রস্তুত করছে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য তাকে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। তাই সে এখনই যোগ্য টিউটরের সম্মতান করছে— এগুলো হলো সোমার দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য অর্জনের জন্য মধ্যবর্তীকালীন লক্ষ্য।

উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সোমার নিয়মিত স্কুল-কলেজে যাওয়া, মনোযোগসহকারে পড়াশোনা করা, শ্রেণির কাজ ঠিকমতো সম্পন্ন করা এবং ভালো রেজাল্ট করা এ সবই তাৎক্ষণিক লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত।

কাজ – তোমার একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির কর। সে লক্ষ্য পৌছাতে হলে তোমার করণীয় কাজগুলোর একটি তালিকা করে দেখাও।

পাঠ ৩ – গৃহ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য

গৃহ ব্যবস্থাপনার কর্মক্ষেত্র শুধু গৃহাঙ্গনেই সীমাবদ্ধ নয়। গৃহের বাইরের সমাজে ও পরিবেশে এবং কর্মক্ষেত্রে বিস্তৃত। সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিবর্তনশীল সমাজের প্রভাব গৃহ ও পরিবারের উপর পড়ে। সে অনুযায়ী ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে পরিবর্তন আনা অথবা পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে খাপ খাওয়ানোর শিক্ষা গৃহ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নিহিত রয়েছে।

আমাদের চাহিদার তুলনায় সম্পদ সীমিত। এ অবস্থায় চাহিদাগুলো পূরণ করতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ও সম্পদের ব্যবহারে দক্ষতা বাড়ানো একান্ত অপরিহার্য। দক্ষতা বাড়াতে হলে সম্পদের প্রকৃতি ও তার বিকল্প ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একান্ত দরকার। এ রকম পরিস্থিতিতে গৃহ ব্যবস্থাপনার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান যুগে পরিবার একটি অর্থনৈতিক একক হিসেবে বিবেচিত। বেশির ভাগ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেমন— পরিবারের আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ইত্যাদির মূল উৎস হচ্ছে পরিবার। পরিবারের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো দেশের জাতীয় অর্থনৈতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এ পরিস্থিতিতে ভোক্তা এবং ক্রেতা হিসেবে ব্যক্তি তথা পরিবারের কী অধিকার এবং অধিকার রক্ষায় কী করণীয় সে সম্পর্কে সচেতন থাকা একান্ত প্রয়োজন। গৃহ ব্যবস্থাপনার জ্ঞান এ ব্যাপারে দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে।

গৃহ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হলো কর্মসূচী আচরণ দ্বারা পরিবার তথা দেশের কল্যাণ সাধন করা। মানুষ তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করে সফলতা অর্জন করতে পারে। এই সফলতাই পারিবারিক জীবনে কল্যাণ, শাস্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনতে পারে।

গৃহ ব্যবস্থাপনার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলো—

- পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে সকল সম্পদ ব্যবহারে পারদর্শিতা অর্জন।
- ব্যক্তিগত ও পারিবারিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে লক্ষ্য স্থির করা ও তা বিশ্লেষণ করা।
- গৃহ ও গৃহের বাইরে একটি সুস্থ বাসোপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলা।
- সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- ভোক্তার অধিকার ও দায়িত্ব কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হওয়া।
- দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তা সমাধানে সচেষ্ট হওয়া।
- ভবিষ্যতে নিজের ও পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছতা লাভের উপায় নির্ধারণ করা।
- পেশাগত ক্ষেত্রে যোগ্যতা বৃদ্ধি করা।
- উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ গ্রহণ করা।
- আধুনিক জীবনযাত্রার সাথে তাল মিলিয়ে গৃহস্থালির আধুনিক সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্রের সাথে পরিচিত হয়ে এগুলোর যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণে পারদর্শিতা অর্জন করা।
- দুষণমুক্ত, বাসযোগ্য পরিবেশ গড়ে তোলা।
- বর্তমান ও ভবিষ্যতে জ্ঞালানি সংকটের ক্ষেত্রে সচেতন হয়ে তা দূরীকরণে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা।

গৃহ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা শিক্ষার্থীদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য পরিবারের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়ন বিধানের যাবতীয় গুণাবলি অর্জন করতে সহায়তা করে। গৃহ ও কর্মক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতি ও সমস্যা অনুধাবন করে, কীভাবে এর সাথে অভিযোজন করা বা খাপ খাওয়ানো যায় গৃহ ব্যবস্থাপনার জ্ঞান সে বিষয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

পাঠ ৪ – গৃহ ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি বা পর্যায়

গৃহ ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা হতে স্পষ্ট ধারণা করা যায় যে, গৃহ ব্যবস্থাপনা পারিবারিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য কতোগুলো ধারাবাহিক কর্মপদ্ধতির সমষ্টি মাত্র। এ পদ্ধতিগুলো ধারাবাহিকভাবে সম্মন করতে হয় বলে এগুলোকে গৃহ ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি বা পর্যায় বলা হয়। পদ্ধতিগুলো হলো— পরিকল্পনা, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ, মূল্যায়ন। প্রতিদিনের কাজে সচেতনভাবে এই ধাপগুলো আমাদের অনুসরণ করতে হয়। লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে প্রতিদিনের কাজের পরিকল্পনা করা হয়। পরিকল্পনা থেকে আরম্ভ করে মূল্যায়ন, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ, ধারাবাহিকভাবে চক্রাকারে চলতে থাকে। গৃহ ব্যবস্থাপককে পরিকল্পনা প্রণয়নকারী, সংগঠক, নিয়ন্ত্রণকারী ও মূল্যায়নকারীরূপে দায়িত্ব পালন করতে হয়।

পরিকল্পনা

গৃহ ব্যবস্থাপনার প্রথম ধাপ পরিকল্পনা করা। লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে যে সব কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয় তার পূর্বে কাজটি কীভাবে করা হবে, কেন করা হবে ইত্যাদি সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করার নাম পরিকল্পনা। অর্থাৎ পরিকল্পনা হলো পূর্ব থেকে স্থিরকৃত কার্যক্রম।

সদস্যদের মধ্যে অবশ্যই ভালো সম্পর্ক থাকতে হবে। সম্পর্ক ভালো থাকলে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সহজতর হয়।

পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় কিছু বিষয় বিবেচনায় আনতে হয়। যেমন—

- পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের মতামত যাচাই করে এবং প্রত্যেকের সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা করে পরিকল্পনা করতে হবে।
- বিভিন্ন কার্যকলাপে সফলতা লাভ করতে হলে সদস্যদের দক্ষতা, ক্ষমতা, অভিজ্ঞতা, কাজ করার ইচ্ছা-অনিষ্ট ইত্যাদি পরিকল্পনায় বিবেচনার বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। সুতরাং সঠিক পরিকল্পনা করতে হলে বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে অবশ্যই ভালো সম্পর্ক থাকতে হবে। সম্পর্ক ভালো থাকলে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সহজতর হয়।
- পরিকল্পনা এমন হতে হবে যেন প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন করা যায় অর্থাৎ নমনীয় হতে হবে। হঠাত করে কোনো জটিল সমস্যার সৃষ্টি হলে তা সমাধান করার উপযোগী পরিবেশ যেন সৃষ্টি করা যায়, সে বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে। তা ছাড়া পরিকল্পনা যত দূর সম্ভব সহজ সরল হওয়া উচিত।
- পরিবারের সকলের গ্রহণযোগ্য পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।

সংগঠন

গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিবারের বিভিন্ন কাজগুলোর মধ্যে সংযোগ সাধন করার নাম সংগঠন। সংগঠনের পর্যায়ে কোন কাজ কোথায় ও কীভাবে করা হবে তা স্থির করা হয়। সংগঠনের পর্যায়ে পরিবারের বিভিন্ন সম্পদ সম্পর্কে বিশদ ভাবে খুঁচিনাটি চিন্তা করে কোথায় কী সম্পদ ব্যবহার করা হবে তা স্থির করা হয়ে থাকে। কাজ করতে গেলে—কোন কাজ কাকে দিয়ে করানো হবে, সে কাজ সম্পর্কে কার অভিজ্ঞতা আছে, কীভাবে কাজটি করতে হবে, কী কী সম্পদ ব্যবহার করা হবে ইত্যাদি বিবেচ্য বিষয়সমূহ সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত। এক কথায় কাজ, কর্মী ও সম্পদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাকে সংগঠন বলে। সংগঠনের তিনটি পর্যায় আছে—

গৃহ ব্যবস্থাপনা

- প্রথম পর্যায়ে ব্যক্তি তার করণীয় কাজের বিভিন্ন অংশের একটি ধারাবাহিক বিন্যাস রচনা করে।
- দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যক্তি তার কোন কাজ আগে এবং কোন কাজ পরে হবে তার ধারাবাহিকতা রচনা করে।
- তৃতীয় পর্যায়ে ব্যক্তি তার একটি নির্দিষ্ট কাজ বা কাজসমূহ বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন করার জন্য একটি কর্ম কাঠামো রচনা করে।

সুতরাং বলা যায়, যে কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ করাই সংগঠন।

নিয়ন্ত্রণ

গৃহ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ করা। নিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায় পরিবারের সকল ব্যক্তি শৃঙ্খলাবন্ধভাবে পরিবারিক লক্ষ্য অর্জনের কাজে নিয়োজিত কি না তা পর্যবেক্ষণ করা। পরিকল্পিত কর্মসূচি ও পূর্ব নির্ধারিত মান অনুসারে কার্য সম্পাদিত হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করা ও প্রয়োজনবোধে উপযুক্ত সংশোধনীর ব্যবস্থা করা এ পর্যায়ের কাজ।

কাজ চলাকালীন অবস্থায় কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে যে পরিকল্পনা করা হয়েছে সে অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কি না, যাকে যে কাজ দেওয়া হয়েছে সে কাজ সঠিকভাবে করছে কি না ইত্যাদি। প্রয়োজনবোধে কাজের ধারা পরিবর্তন করে কাজ সম্পাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। পূর্বের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কতোগুলো স্তরে পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হয় যেমন-

- **কর্মে সক্রিয় হওয়া**- প্রথম স্তরে কাজে উদ্যোগ নেওয়া বা সক্রিয় হয়ে কাজ করা বোঝায়। কাজের উদ্যোগ নিয়ে কাজ শুরু করাটা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কী কাজ করতে হবে এবং কীভাবে করতে হবে জানা থাকলে কাজ আরম্ভ করা সহজ হয়।
- **পর্যবেক্ষণ করা**- কাজ করার দ্বিতীয় স্তরে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কাজের অগ্রগতি পরীক্ষা করতে হয়। কাজটি করতে সম্পদের সঠিক ও সুষ্ঠু ব্যবহার হচ্ছে কি না, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কী রকম সাফল্যের সঙ্গে হচ্ছে ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখতে হয়। কাজ চলাকালীন অবস্থায় এগুলো পর্যবেক্ষণ করতে হয়।
- **অভিযোজন করা/খাপ খাওয়ানো**- নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির তৃতীয় স্তরে পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে হয় অথবা কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা মোকাবিলা করতে হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী গৃহীত পরিকল্পনায় কিছুটা রদবদল করে নতুন কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাই হচ্ছে অভিযোজন বা খাপ খাওয়ানো।

মূল্যায়ন

গৃহ ব্যবস্থাপনায় সর্বশেষ পর্যায় হলো মূল্যায়ন করা। কাজের ফলাফল বিচার বা যাচাই করাই হচ্ছে মূল্যায়ন। পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের ওপর কাজের ফলাফল নির্ভর করে। কাজটি করার পেছনে যে লক্ষ্য ছিল তা অর্জনে পূর্ববর্তী পর্যায়গুলোর অবদান পুঁজানুপুঁজরূপে মূল্যায়ন করতে হবে। মূল্যায়ন ছাড়া কাজের সফলতা ও বিফলতা নিরূপণ করা যায় না। কাজের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে ফলাফল যাচাই করতে হয়। উদ্দেশ্য সাধিত না হলে ফলাফল ভালো হলো না বুঝতে হবে। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আরও সচেতন হতে হবে। মূল্যায়নের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জিত হলো কি না, আর যদি হয়ে থাকে, কতোটা হলো তা পরিমাপ করা যায়। লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হলে ব্যর্থতার কারণ নির্ণয় করে পরবর্তীতে সংশোধনের ব্যবস্থা করা যায়। সঠিক

মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে—

- লক্ষ্য অনুযায়ী পরিকল্পিত কাজগুলো ঠিকমতো হয়েছে কি না
- কাজের সফলতা বা ব্যর্থতা নিরূপণ করা
- কাজে ব্যর্থ হলে ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করে পরবর্তীতে সংশোধনের মাধ্যমে কাজে সফল হওয়া।

কাজ – গৃহ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায় অনুসরণ করে একটি পিকনিকের আয়োজন কর।

পাঠ ৫– সিদ্ধান্ত গ্রহণ

গৃহ ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এর প্রতিটি স্তরে বা ধাপে ছেট-বড় নানা ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। গ্রস এবং ক্রান্তেলের মতে—সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল কথা হলো সমস্যা সমাধানে একাধিক কার্যক্রম বা পন্থা থেকে একটি বিশেষ কার্যক্রম পছন্দ করা। পরিবার যে কোনো সময় পরিবর্তিত অবস্থার বা সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য বিভিন্ন বিকল্প পন্থা থেকে সবচেয়ে উন্নত পন্থাটি বেছে নেওয়াটাই হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

একটি পরিবারের ব্যক্তিগত ও দলগত উভয় প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয়। পরিবার কী ধরনের সিদ্ধান্ত নেবে তা নির্ভর করে কাজের প্রকৃতির উপর। পরিবারের ছেটখাটো অনেক সমস্যায় এককভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। কোনো সূজনশীল কাজে বা কোনো জটিল সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে দলীয় সিদ্ধান্তের ভূমিকা অনেক বেশি। এক্ষেত্রে কাজটির জন্য বিকল্প উপাগনে একজন ব্যক্তির তুলনায় দলগত প্রভাব বেশি কার্যকর। পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজের সিদ্ধান্ত দলীয়ভাবে গ্রহণ করাই উন্নত। এতে কাজটি সুন্দর হয় এবং ভুল হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি বা পর্যায়

যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক পর্যায় রয়েছে। একজন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে পর্যায়ক্রমে এগুলো অনুসরণ করতে হয়। এ পর্যায়গুলো হলো—

- সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি
- বিকল্প অনুসন্ধান
- বিকল্পসমূহ সম্পর্কে চিন্তা
- একটি সমাধান গ্রহণ
- গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ
- সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি – সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রথম পর্যায়ে যে সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে, তার প্রকৃতি নির্ণয় করা। সমস্যার স্বরূপ অবগত না হলে সুষ্ঠু সমাধান আশা করা যায় না। সমস্যা কখনো সাধারণ আবার কখনো কঠিন বা জটিল হতে পারে। সাধারণ ছেটখাটো সমস্যায় এককভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে সমাধান করা যায়। কিন্তু কঠিন সমস্যায় অনেক চিন্তাবন্ধন করে সিদ্ধান্তে পৌছাতে হয়।
- সমস্যা সমাধানের বিকল্প অনুসন্ধান – সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্বিতীয় পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ এবং সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য পন্থাগুলো অনুসন্ধান করা হয়। যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য অনেক বিকল্প পন্থা থাকতে

পারে। বিকল্প পন্থাগুলো পর্যালোচনা করার জন্য অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও সময়ের প্রয়োজন হয়। এগুলোর সীমাবদ্ধতার কারণে সঠিক পন্থা নির্বাচন করা সম্ভব হয় না। ফলে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দূরবর্তী কোনো স্থানে অমগে যেতে কী ধরনের যানবাহন নির্বাচন করা যুক্তিশুক্ত হবে তা যাচাই করতে হবে। অর্থ, সময়, শক্তি ইত্যাদি সম্পদ ব্যবহারের আলোকে বিকল্প ব্যবস্থাগুলো যাচাই করে সিদ্ধান্তে পৌছাতে হয়।

- **বিকল্পসমূহ সম্পর্কে চিন্তা-** এ পর্যায়ে সমস্যা সমাধানের বিকল্প পন্থাগুলো বিশদভাবে মূল্যায়ন করা হয়। প্রতিটি বিকল্পের ফলাফল, এর সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে দেখতে হয়। যেমন- সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হতে হয়। তা সত্ত্বেও ভবিষ্যতে অনেক পরিবর্তন দেখা দিতে পারে, যার ফলে কাঞ্চিত ফলাফল লাভ সম্ভব নাও হতে পারে। অনেক সময় সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে বিভিন্ন বিকল্প সম্পর্কে চিন্তা করা সম্ভব হয় না। এ ব্যাপারে সময় নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে হয় কোন বিকল্প সমাধানটি বেশি কার্যকর। সিদ্ধান্তের এ পর্যায়ের জন্য প্রথর চিন্তাশক্তির প্রয়োজন।
- **একটি সমাধান গ্রহণ- সিদ্ধান্ত গ্রহণের চতুর্থ স্তর হচ্ছে অনেকগুলো বিকল্প পন্থার মধ্য হতে একটি পন্থা বেছে নেওয়া।** এ স্তরটি খুবই প্রভাবশালী। এটা মানুষের সমস্ত জীবনধারাকে প্রভাবিত করে। মানুষ যদিও একটি যুক্তিপূর্ণ বিকল্প খুঁজে নেয়, তবুও তারা সবচেয়ে ভালো পন্থাটা নির্বাচনের জন্য খুব কমই চেষ্টা করে। সময় এবং পারিবারিক অবস্থার দ্বারা মানুষ অনেক সময় প্রভাবিত হয়। যেমন- দোকানে সুন্দরভাবে সাজানো জিনিসপত্র দেখে আকৃষ্ট হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে অল্প সময়ে সে দ্রব্য কেনাকাটা করে ফেলতে পারে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছাড়াও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর বয়স, চাহিদা, আয় ইত্যাদির উপর একটি সমাধান গ্রহণ অনেকাংশে নির্ভর করে। একটি সমাধান গ্রহণের সময় দেখতে হবে তা যথেষ্ট কার্যকর কি না এবং এতে মন পরিতৃপ্ত হবে কি না।
- **গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ-** যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো তার ফলাফল জেনে দায়িত্ব গ্রহণ করাই হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বশেষ পর্যায়। গৃহীত সিদ্ধান্তটির দায়িত্ব গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। নতুবা পূর্ববর্তী পর্যায়গুলোর সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। সুতরাং বিকল্প বাছাইকরণের পর যে সমাধান গ্রহণ করা হলো তা কার্যকর করার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করতেই হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন। পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব তিনিই বহন করবেন যার সাথে পরিবারের সকলের সুসম্পর্ক বিদ্যমান এবং যিনি যথেষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতন।

কাজ - - পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একক সিদ্ধান্ত ও দলীয় সিদ্ধান্তের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো তুলে ধর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। গৃহ ব্যবস্থাপনাকে পারিবারিক জীবনের প্রশাসনিক দিক বলে কে অভিহিত করেছেন-

- | | |
|----------------------|---------------------|
| ক) নিকেল ও গ্রস | খ) গ্রস ও ক্রান্ডেল |
| গ) ক্রান্ডেল ও নিকেল | ঘ) নিকেল ও ডরসি |

২। গৃহ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া প্রধানত কোনটিকে ক্ষেত্র করে আবর্তিত হয়?

- | | |
|---------------|--------------|
| ক) লক্ষ্য | খ) পরিকল্পনা |
| গ) নিয়ন্ত্রণ | ঘ) মূল্যায়ন |

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ঢ ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উভয় দাও :

মনোয়ারা জামান একজন গৃহিণী। পারিবারিক স্বাচ্ছন্দের কথা বিবেচনা করে তিনি মুরগির ফার্ম খোলার পরিকল্পনা করেন। প্রয়োজনীয় মূলধনের ব্যবস্থা করে তিনি কর্মী নিয়োগ করেন। মাসখানেক পর তিনি ফার্মে এসে অনেক অব্যবস্থাপনা দেখতে পান।

৩। মনোয়ারা জামানের কর্মপদ্ধতিতে কোনটির অভাব লক্ষ্য করা যায়?

- | | |
|-----------|--------------------|
| ক) উদ্যোগ | খ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ |
| গ) সংগঠন | ঘ) নিয়ন্ত্রণ |

৪। মনোয়ারা জামানের করণীয় ছিল –

- i. পরিকল্পনা করা।
- ii. উদ্যোগ নেওয়া।
- iii. কাজের অগ্রগতি পরীক্ষা করা।

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১। সায়হাম নবম শ্রেণির ছাত্র। ভবিষ্যতে সে একজন চিকিৎসক হতে চায়। বাবা মা লক্ষ করছেন সায়হাম প্রায়ই স্কুলে যেতে চায় না। পড়াশোনায়ও তেমন একটা আগ্রহ নেই। বিষয়টি নিয়ে পারিবারিক আলোচনা শেষে সায়হামের মাকে এ ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব পালনের ভার দেওয়া হয়।

- ক. গৃহ ব্যবস্থাপনার মূল চাবিকাঠি কোনটি?
- খ. কীভাবে লক্ষ্য অর্জন সহজতর হয় তা বুঝিয়ে লেখ।
- গ. সায়হামের কার্যকলাপে কোন ধরনের লক্ষ্যের ঘাটতি রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. সায়হামের পরিবারের সদস্যদের পদক্ষেপ মূল্যায়ন কর।

২। আজ খাদিজা খাতুনের ছোট মেয়ের জন্মদিন। হঠাৎ করে এ উপলক্ষে অতিথিদের আপ্যায়ন করার সিদ্ধান্ত নেন। স্বামী অসুস্থ থাকায় তিনি স্কুলপড়ুয়া ছেলেকে বাজারের দায়িত্ব দেন। ঘরকুনো স্বভাবের বড় মেয়েকে তিনি অতিথিদের আপ্যায়ন করার দায়িত্ব দেন। অনুষ্ঠান চলাকালে তিনি নিজে সার্বক্ষণিক তদারকি করেন। অনুষ্ঠান শেষে তিনি আরও কোশলী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

- ক. গৃহ ব্যবস্থাপনার প্রথম ধাপ কোনটি?
- খ. গৃহ ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝায়?
- গ. খাদিজা খাতুনের ত্রুটি ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. আয়োজক হিসেবে খাদিজা খাতুনের কাজের ধাপগুলোর যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়

গৃহ ব্যবস্থাপক

পাঠ ১ - গৃহ ব্যবস্থাপকের গুণাবলি

প্রতিটি মানুষ কতোগুলো ব্যক্তিগত ও সামাজিক কারণে গৃহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। মানুষের জীবনের লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গৃহের ভূমিকা অপরিসীম। পরিবারের সব সদস্যের আন্তরিক ইচ্ছা, একে অন্যের প্রতি সহযোগিতা ও সমর্থনের মাধ্যমে গৃহেই পরিবারের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এর জন্য প্রয়োজন হয় সঠিক ও দক্ষ গৃহ ব্যবস্থাপনার। সুষ্ঠু গৃহ ব্যবস্থাপনা একটি সাধারণ গৃহকেও অনন্য সাধারণ করে তুলতে পারে। আর যিনি গৃহ ব্যবস্থাপনার প্রধান দায়িত্বে থাকেন, তিনি হলেন গৃহ ব্যবস্থাপক। পরিবারের মা-বাবা উভয়েই এই ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করতে পারেন। গৃহ ব্যবস্থাপক হচ্ছেন গৃহের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্রবিদ্যু। তার ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করে পারিবারিক সুখ-শান্তি, স্বচ্ছতা, সুশৃঙ্খল গৃহপরিবেশ। গার্হস্থ্য অর্থনীতিবিদ নিকেল ও ডরসি (Nickel and Dorsey, 1950) গৃহ ব্যবস্থাপনাকে পারিবারিক জীবনের প্রশাসনিক দিক বলে অভিহিত করেন। গৃহ ব্যবস্থাপক তার শক্তি, সামর্থ্য ও বিভিন্নমুখী দক্ষতার জোরে এ প্রশাসনকে সার্থকভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেন। এই গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য গৃহ ব্যবস্থাপকের অভ্যাস ও অনুশীলনের মাধ্যমে অবশ্যই কতোগুলো গুণের অধিকারী হতে হয়। এই গুণগুলো হলো-

বুদ্ধিমত্তা	উদ্দীপনা
বিচারবুদ্ধি	ব্যক্তিত্ব
অধ্যবসায়	সূজনীশক্তি
আতাসংযম	অভিযোজ্যতা
মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান	

বুদ্ধিমত্তা- একজন গৃহ ব্যবস্থাপককে অবশ্যই বুদ্ধিমান হতে হয়। ব্যক্তির পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা, জ্ঞানস্ফূর্তি ইত্যাদি তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। কোনো সমস্যাকে অনুধাবন করে পরিস্থিতির বিচার-বিশ্লেষণ করা, বিগত দিনের কোনো অভিজ্ঞতাকে সময়মতো কাজে লাগানো এ সবই বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল। পারিবারিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে সফল করার জন্য ব্যবস্থাপককে অবশ্যই বুদ্ধিমান হতে হবে। গৃহের সৌন্দর্যবর্ধনে, শৃঙ্খলা আনয়নে, যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন। ব্যবস্থাপক তার বুদ্ধির জোরে পরিবারের সীমিত সম্পদ ব্যবহার করেও সব চাহিদা পূরণ করতে পারেন।

উদ্দীপনা- গৃহ ব্যবস্থাপকের একটি বিশেষ গুণ হলো উদ্দীপনা। উৎসাহ-উদ্দীপনা ছাড়া কোনো কাজেই সফলতা আসে না। যখন যে কাজের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন সে কাজের গুরুত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস রেখে নিষ্ঠার সাথে কাজটি সম্পন্ন করার চেষ্টাকেই উৎসাহ ও উদ্দীপনা বলা যেতে পারে। গৃহ ব্যবস্থাপকের এই গুণটি অন্য সদস্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায়। উদ্দীপনা থাকলে আগ্রহ ও আনন্দের সাথে সব কাজ সম্পন্ন করা যায়। আবার দেখা যায় উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাবে অনেক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় না। ফলে লক্ষ্য অর্জনও সম্ভব হয় না।

বিচারবুদ্ধি- সংসারে ন্যায়-অন্যায়, ভালোমন্দ ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে নিরপেক্ষ রায় দেওয়ার সামর্থ্য যার ভালো, তাকেই বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই একজন গৃহ ব্যবস্থাপকের বিচার-বুদ্ধি থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে নানা রকম জটিলতা দেখা দেওয়াটা স্বাভাবিক। সেসব জটিলতা

সমাধান করাও সহজ হয় যদি গৃহ ব্যবস্থাপকের তীক্ষ্ণ বিচার ক্ষমতা থাকে। পরিবারের প্রয়োজনে কোন জিনিসটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আবার কোন জিনিসটি না হলেও চলে এসব ভেবে দেখা ও সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়াটা বিচার বুদ্ধিসম্মত গৃহ ব্যবস্থাপকের কাজ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পরিবারের ছোট শিশুটিকে কোন স্কুলে ভর্তি করানো যায়, সে স্কুলের মান, বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব ইত্যাদি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়াটা বিচার ক্ষমতার মধ্যে পড়ে।

ব্যক্তিত্ব- মানুষের চাল-চলন, কথা-বার্তা, আচার-আচরণে ও ঝুঁটি বৌধে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। একজন গৃহ ব্যবস্থাপককে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হয়। গৃহ ব্যবস্থাপকের আচার-ব্যবহার এমন হওয়া উচিত যাতে তিনি পরিবারের সকলের নিকট পছন্দনীয় হতে পারেন তার মার্জিত ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, কথা-বার্তায় শালীনতা ও পরিমিতি বৌধ, ন্যায়পরায়ণতা, দায়িত্ববোধ ইত্যাদি গুণাবলি থাকতে হবে।

সৃজনীশক্তি - গৃহ পরিবেশকে আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যময় করে তুলতে হলে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে হয়। সেটিই সৃজনশীলতার প্রতীকরূপে সবার নজরে পড়ে। গৃহ ব্যবস্থাপককে এ রকম সৃজনশক্তির অধিকারী হতে হয়, যিনি তার কল্পনাশক্তি দিয়ে নতুনত্ব তৈরি করতে পারেন। সৃজনীশক্তির সাহায্যে গৃহ ব্যবস্থাপকের যে কোনো কাজের পরিকল্পনা করা সহজ হয় এবং কাজের ফলাফল কী হতে পারে সে সম্বন্ধে অন্দাজ করতেও কোনো অসুবিধা হয় না। পূর্ব নির্ধারিত কোনো কাজে যদি পরিবর্তন করতে হয়, তাতেও সৃজনীশক্তি প্রয়োগ করে, তা সহজে করা সম্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় গৃহ পরিবর্তনের কারণে নতুন ঘরের আসবাবপত্র নির্বাচন, ক্রয় ও বিন্যাসের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক তার সৃজনীশক্তি ও কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে পারেন।

অধ্যবসায় - অধ্যবসায় ছাড়া কোনো কাজে সফলতা আসে না। যে কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য শেষ পর্যন্ত কাজটি করে যাওয়াটাই হচ্ছে অধ্যবসায়। গৃহ ব্যবস্থাপকের এই গুণের কারণেই যে কোনো কঠিন কাজও সহজেই সম্পন্ন হয়। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও একাগ্রতা ইত্যাদি গুণাবলী অধ্যবসায়ী হতে সাহায্যে করে। যেমন বিশেষ কোনো নতুন কাজ যদি একবারে রূপ্ত করা না যায়, তাহলে বারবার চেষ্টা করে তা রূপ্ত করা যায়। গৃহের নানাবিধি কাজের সুষ্ঠু পরিসমাপ্তির জন্য গৃহ ব্যবস্থাপকের এই গুণটি থাকা আবশ্যিক। ঘরে শিশুদের পরিচালনা এবং তাদের লেখাপড়া করার ক্ষেত্রে অধ্যবসায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

অভিযোজ্যতা - পরিবর্তনশীল পরিবেশে বাস করার কারণে প্রায়ই আমাদের নানা রকম পরিবর্তনের মুখোমুখি হতে হয়। যেকোনো পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাওয়ানো বা অভিযোজ্যতার গুণটি প্রত্যেক গৃহ ব্যবস্থাপকের থাকা একান্ত প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাড়িতে কেউ অসুস্থ হলে সময়মতো চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। বাড়িতে থাকলে তার বিশেষ যত্ন নিতে হয়। অথবা চিকিৎসকের নির্দেশে হাসপাতালে নিতে হতে পারে। এ রকম পরিবর্তিত অবস্থার সাথে অভিযোজন করে যাবতীয় কাজ সমাধান করতে হয়। গৃহ ব্যবস্থাপককে যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা থাকতে হয়। যিনি যত ভালোভাবে অভিযোজন করতে পারবেন, তিনি যে কোনো পরিস্থিতি সহজেই নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবেন।

আত্মসংযম - স্বাভাবিকভাবে জীবন চলার মাঝে পরিবারে বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে। পরিবারিক সংকটকালে নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখাটাই আত্মসংযম। একজন সুব্যবস্থাপকের আত্মসংযমী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই গুণের মাধ্যমে অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান করা যায়। আত্মসংযম ক্ষমতা থাকলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখা সহজ হয়। পরিবারে অনেক সময় সদস্যদের মধ্যে নানা রকম ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়ে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার আশঙ্কা থাকতে পারে। এ রকম পরিস্থিতিতে গৃহ ব্যবস্থাপক উন্নেজিত না হয়ে নিজেকে সংযত রেখে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেন। ফলে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে পরিবারে শাঙ্গি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়।

মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান – মানব চরিত্র সম্পর্কে অধ্যয়ন করার ক্ষমতা গৃহ ব্যবস্থাপকের একটি বিশেষ গুণ। প্রতিটি মানুষই বিভিন্নভাবে একে অন্য থেকে আলাদা। পরিবারে বিভিন্ন ব্যক্তির স্বত্বাব, আচরণ, পছন্দ, অপছন্দ, মেজাজ-মর্জি ইত্যাদি এক রকমের হয় না। পরিবারে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে হলে পরিবারের সকল সদস্যের সামগ্রিক আচরণগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা প্রয়োজন। একজন গৃহ ব্যবস্থাপক পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলনের দ্বারা মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। ফলে তিনি সদস্যদের দ্বারা উত্সুক যে কোনো সমস্যা সহজেই মোকাবিলা করতে পারেন। পরিবারে শিশুরা যেমন স্নেহ-তালোবাসা চায়, তেমনি বড়ো চান শুন্ধা-ভক্তি। আবার শিশুদের নির্দেশ দিয়ে কাজ করাতে হয়, পক্ষান্তরে বড়দের পরামর্শ নিয়ে কাজ করাতে হয়। এতে পরিবারে শৃঙ্খলা, শান্তি বজায় থাকে।

উপরোক্ত গুণগুলোর সমন্বয়ে একজন গৃহব্যবস্থাপক উন্নত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারেন। এরকম ব্যক্তিসম্মত ব্যক্তিকে সবাই মান্য করে এবং তাঁর প্রতি সহযোগী মনোভাব পোষণ করে। ফলে তিনি যে কোনো ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সফল হন।

কাজ – গৃহ ব্যবস্থাপকের গুণাবলি চার্টের মাধ্যমে দেখাও।

পাঠ ২ – গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

গৃহ ব্যবস্থাপকের নানাবিধি গুণ সম্পর্কে আমরা ইতোমধ্যে অবগত হয়েছি। পরিবারে বিভিন্ন রকম কাজ থাকে। একজন গৃহ ব্যবস্থাপক তার করণীয় কাজগুলো সম্পর্কে সচেতন হয়ে তার গুণাবলির প্রকাশ ও বিকাশ ঘটাতে পারেন। তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে তাকে সব সময় সচেত্ন থাকতে হয়। গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্যে সামান্য অবহেলার কারণে পারিবারিক জীবনে অনেক বিপর্যয় ঘটতে পারে। সুস্থ ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবারের ছেট-খাটো কাজ থেকে বড় রকমের বিভিন্ন গুরুদায়িত্ব পালনের ভারও গৃহব্যবস্থাপকের উপর ন্যস্ত থাকে। তাকে পরিবারের সার্বিক কাজের দায়িত্বে থাকতে হয়। সকল কাজ সুস্থভাবে সম্পন্ন করানো গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তার সঠিক নির্দেশনা পেলে অন্য সদস্যরাও কাজে আগ্রহী হয়ে উঠে।

পরিবারের সীমিত সম্পদের সম্বৃদ্ধি করে কীভাবে প্রয়োজনীয় সকল চাহিদা মেটানো যায়, গৃহ ব্যবস্থাপককে তার সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এ ছাড়া নির্ধারিত কাজগুলো কে করবে, কীভাবে করা হবে, কখন এবং কেন করা হবে এসব বিষয়ের প্রতি সচেতন হয়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করাটা গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। সদস্যদের মধ্যে কাজগুলো বণ্টন করে, তার সার্বিক তদারকি করাটাও তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের আওতাভুক্ত।

পরিবারে গৃহব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

- গৃহে সুস্থ কর্মব্যবস্থা সৃষ্টি করা
- পরিবারের আয় ও ব্যয়ের সুব্যবস্থা নিশ্চিত করা
- পরিবারের সদস্যদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা
- পরিবারের সুস্থ নিরাপত্তাব্যবস্থা নিশ্চিত করা
- পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুস্থ ভোগ আচরণ গড়ে তোলা
- কাজের উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা।

গৃহে সুষ্ঠু কর্ম ব্যবস্থা সৃষ্টি করা- পরিবারিক কাজগুলো সকল সদস্যের মধ্যে বর্ণন করে দেওয়া গৃহ ব্যবস্থাপকের অন্যতম দায়িত্বের অন্তর্গত। পরিবারে এমন অনেক কাজ আছে যা গৃহের মধ্যেই সম্পাদিত হয়। যেমন- রান্না ও পরিবেশন করা, ঘর-বাড়ি পরিষ্কার ও পরিপাটি রাখা, কাপড় ধোওয়া, ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ায় সাহায্য করা, বয়স্ক বা অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করা, চিন্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। আবার কিছু কাজ বাড়ির বাইরে করতে হয়। যেমন- বাজার করা, লাঞ্ছিতে যাওয়া, বাগান করা, আত্মীয়স্বজনের খোজ খবর নেওয়া ইত্যাদি। গৃহ ব্যবস্থাপক পরিবারের সদস্যদের শক্তি, সামর্থ্য, বয়স, কর্মসূহা ইত্যাদির ভিত্তিতে কাজগুলোকে বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে বর্ণন করে থাকেন। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাজগুলোর তদারকি করা ও সদস্যদের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করা গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব।

পরিবারের আয় ও ব্যয়ের সুব্যবস্থা নিশ্চিত করা- পরিবারে সকলের সব রকম চাহিদা পূরণের জন্য আয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হয়। আয়ের মাধ্যমে পরিবার যে অর্থ উপার্জন করে তার দ্বারাই প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য সামগ্রী ও সেবা ক্রয় করা হয়। আয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত থাকলে পরিবারে অভাব-অভিযোগ থাকে না। ফলে সেখানে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিরাজ করে। গৃহ ব্যবস্থাপকের এ বিষয়ে বিশেষ দ্রষ্টি দিতে হয়।

আয়কে যথাযথভাবে ব্যবহারের প্রতিও গৃহব্যবস্থাপককে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হয়। আয় অনুযায়ী ব্যয় করার জন্য তাকে অর্ধ ব্যয়ের পূর্ব পরিকল্পনা করতে হয়, যা বাজেট হিসেবে পরিচিত। পরিবারের সীমিত আয়ের মধ্যে সুষ্ঠু ক্রয় নীতি অনুসরণ করে পরিবারের সব রকম চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করতে হয়। এর পাশাপাশি ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য আয়ের কিছু অংশ সংরক্ষণ করে রাখার ব্যবস্থা করাও গৃহ ব্যবস্থাপকের কাজ। তার সুষ্ঠুভাবে অর্ধ ব্যবস্থাপনার ফলে, পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে ব্যয় করার সদত্যাস গড়ে উঠে, তারা মিতব্যয়ী ও সংরক্ষণ্যী মনোভাব সম্পন্ন হতে পারে।

পরিবারের সদস্যদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা - পরিবারে বিভিন্ন বয়স ও সম্পর্কের সদস্যরা অবস্থান করে। গৃহ ব্যবস্থাপনার সাথে একাধিক কাজ সম্পৃক্ত থাকে। পরিবারের সকল সদস্যের মিলিত প্রচেষ্টায় কাজগুলো সম্পন্ন হয়। সদস্যদের মধ্যে আন্তসম্পর্ক যদি ভালো হয়, তাহলে সেখানে সুশঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করে। গৃহ ব্যবস্থাপক নিজে অন্যান্য সদস্যদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবেন। এ ছাড়াও অন্য সদস্যরাও যেন একে অন্যকে শুন্দৰ করেন, মর্যাদা দেন সে বিষয়েও তাকে সচেতন থাকতে হবে। পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজন ও চাহিদার কথা বিচেচনা করে, সেগুলো সম্ভাব্য সহজ উপায়ে মিটানোর পদক্ষেপ নিতে হয়। অনেক সময় পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তির সাথে নবীনদের মতের অমিল থেকে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রবীণ ও নবীনদের প্রকৃতি অনুধাবন করে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে পরিস্থিতি মোকবিলা করার দায়িত্ব গৃহ ব্যবস্থাপকের। সকল সদস্যের যুক্তিসংগত চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারলে গৃহ ব্যবস্থাপকের সাথে তাদের সম্পর্কের উন্নতোভাব উন্নতি ঘটতে থাকে।

পরিবারের সুষ্ঠু নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা - গৃহ ব্যবস্থাপককে পরিবারের সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়ে বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে। গৃহ, গৃহের সদস্যগণ এবং পণ্যসামগ্রীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হয়। গৃহ যাতে নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। বাসস্থানের নিরাপত্তার জন্য অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা, পয়ঃনিষ্কাশনের সুব্যবস্থা ও ময়লা আবর্জনা যথাযথ স্থানে অপসারণ করা, গৃহকে দূষণমুক্ত রাখা ইত্যাদি গৃহের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব গৃহব্যবস্থাপকের। গৃহের সকল সদস্যের দৈহিক ও মানসিক নিরাপত্তার বিষয়টির প্রতি যত্নবান হতে হবে। বাড়িতে সদস্যরা কোনো দুর্ঘটনায় পড়লে, তাকে সাময়িক আরাম দেওয়ার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সামগ্রীর ব্যবস্থা রাখতে হবে। বিপজ্জনক দ্রব্যসামগ্রী নিরাপদ স্থানে

সত্ত্বক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। অসুস্থ ব্যক্তির সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করে তার সুস্থতা নিশ্চিত করতে হবে। পণ্যসামগ্রীর নিরাপত্তার জন্য গৃহে সুষ্ঠু সংরক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব।

পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুষ্ঠু ভোগ আচরণ গড়ে তোলা – বর্তমান যান্ত্রিক জীবন ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্য আরও বেড়েছে। পরিবর্তনশীল জগতের সাথে মিল রেখে সত্ত্বানদের মানসিক বিকাশ হচ্ছে কি না তা লক্ষ রাখতে হয়। সেজন্য বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুযোগ–সুবিধা সমূহ পরিবারের ছেলেমেয়েরা যাতে ভোগ করতে পারে, তার যথাযথ ব্যবস্থা করাও গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব। এ ছাড়া সদস্যদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদির চাহিদা পূরণে সঠিক পণ্য নির্বাচন ও ব্যবহারের প্রচেষ্টা থাকতে হবে। উদাহরণস্বরূপ খাদ্য নির্বাচন সূচন হতে হবে, কস্ত্র নির্বাচন প্রয়োজন ও সামাজিক রীতিনীতি অনুসারে হতে হবে, বাসস্থান স্থান্ধ্যকর হওয়া প্রয়োজন। এ সকল লক্ষ্য অর্জনে গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া, যাতে সাধ্যের মধ্যে সদস্যদের চাহিদাগুলো পূরণ হয়। গৃহের সীমিত সম্পদের উপযোগ বা অভাব পূরণের ক্ষমতা বাড়িয়ে কীভাবে প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটানো যায়, সে প্রচেষ্টা গৃহ ব্যবস্থাপককে নিতে হবে।

কাজের উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা – পরিবারের সকল সদস্য যেন তাদের করণীয় কাজগুলো ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পারে, সেজন্য কাজের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব। কাজের পরিবেশ উন্নত ও আরামদায়ক হলে উৎসাহ–উদ্দীপনার সাথে কাজ করা সম্ভব হয়। যেমন– লেখাপড়া করার জন্য যথেষ্ট আলো–বাতাস পূর্ণ এবং কোলাহলমুক্ত একটি স্থানের প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া বই–খাতা, কলম, পেনসিল ইত্যাদি শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো সঠিকভাবে নির্দিষ্ট স্থানে গোছানো থাকলে সহজেই সেগুলো ব্যবহার করা যায়। এ রকম পরিবেশে নির্বিশ্বে ও আরামদায়ক অবস্থায় লেখাপড়া করা যায়। একইভাবে প্রতিটি কাজ অনুযায়ী কাজের ভালো পরিবেশ বজায় রাখার ব্যপারে গৃহ ব্যবস্থাপককে দায়িত্ব নিতে হয়।

উপরোক্ত কাজের দায়িত্ব পালন ছাড়াও গৃহ ব্যবস্থাপককে পরিবারে আরও অনেক অনুষ্ঠান, উপলক্ষ ও বিভিন্ন ঝুঁতুর সাথে সম্পর্কিত নানাবিধি কর্মকান্ডের আয়োজন করতে হয়। আর সেসব কর্মকান্ডের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতি স্তরে ব্যবস্থাপককে বিভিন্নমুখী গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়।

একথা মনে রাখতে হবে যে, গৃহ ব্যবস্থাপক গৃহের সার্বিক ব্যবস্থাপনার গুরুদায়িত্ব বহন করেন। তাকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করা প্রত্যেক সদস্যের কর্তব্য। তার প্রতি শুন্ধ্যশীল হয়ে, তার আদেশ, নির্দেশ পালন করে সবাই মিলে পারিবারিক কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে। পরিবারের কর্মকান্ডগুলো গৃহ ব্যবস্থাপকের সুচারু ব্যবস্থাপনার দ্বারা সম্পাদিত হয়। তিনি যাতে এ রকম দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সফল হতে পারেন সেজন্য প্রত্যেক সদস্যকে যার যার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে নিষ্ঠাবান হতে হবে। তাহলেই আশা করা যাবে যে, সুষ্ঠু গৃহ ব্যবস্থাপনার দ্বারা পরিবার তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে।

কাজ – তোমার পরিবারের গৃহ ব্যবস্থাপককে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে তুমি কীভাবে সহযোগিতা করতে পার? তা ক্রমানুসারে সাজিয়ে লেখ।

পাঠ ৩ – গৃহ ব্যবস্থাপকের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

পরিবার হলো সমাজের মূল ভিত্তি। পরিবারের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যরা সামাজিক রীতিনীতি, মতাদর্শ ও সামাজিক মূল্যবোধের শিক্ষা পায় এবং সামাজিকভাবে গড়ে উঠে। গৃহ ব্যবস্থাপক পরিবারের সদস্যদের এবং নিজেকে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে সম্পৃক্ত করে সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে অবদান রাখতে পারেন। যেমন–

লিও ক্লাব, গার্ল গাইড, রেড ক্রিস্টে ইত্যাদিতে সম্মত হয়ে বিভিন্ন দুর্যোগাকালীন আর্ত মানবতার সেবায় নিয়োজিত হতে পারেন।

গৃহ ব্যবস্থাপক পরিবারে সদস্যদের সামাজিক রীতিনীতি শিক্ষা দিয়ে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে মেলামেশা ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে ব্যবস্থা নিতে পারেন। শিক্ষাচার, আদর্শ মূল্যবোধ শিক্ষাদানের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। পরমতসহিষ্ণুতা, বিপদে ধৈর্যধারণ, অন্যকে সাহায্য করা, সমাজশ্রীতি শিক্ষা দানের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের নেতৃত্বে চরিত্রে অধিকারী করতে পারেন। এতে সামাজিক অবক্ষয়তা রোধের পাশাপাশি বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ রোধ করা সম্ভব হবে।

গৃহ ব্যবস্থাপক মা-বাবা যিনি হোন না কেন তাকে পরিবারের সদস্যদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, স্নেহ-ভালবাসা শিক্ষাদানের পাশাপাশি প্রতিবেশিদের প্রতি দায়িত্ববোধ, সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনে আগ্রহী করে তুলতে হয়। যেমন- বিয়ে, জন্মদিন, মিলাদ, ঈদ, পুজা, বড়দিন, মৃত্যুবার্ষিকী, অসহায় ও দুষ্পদের সাহায্য করা ইত্যাদি বিষয়ে পরিবারের সদস্যদের শিক্ষাদান একজন গৃহ ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

গৃহ ব্যবস্থাপক জাতি, জাতীয় অনুষ্ঠান, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে তার পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা দানের মাধ্যমে দয়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। আর যখন গৃহ ব্যবস্থাপক সদস্যদের সামাজিক রীতিনীতি শিক্ষাদানের মাধ্যমে সামাজিকভাবে গড়ে তুলতে পারবেন তখন গৃহ ব্যবস্থাপকের সামাজিক দায়িত্ব পালন যথাযথ হয়েছে বলে মনে করা হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ১। কাজে সফলতা অর্জনের জন্য কোন গুণটি থাকা প্রয়োজন?
 - ক) বিচারবুদ্ধি
 - খ) সৃজনশক্তি
 - গ) অধ্যবসায়
 - ঘ) উদ্দীপনা
- ২। একজন গৃহ ব্যবস্থাপক আত্মসংযম গুণের অধিকারী হলে—
 - i. পারিবারিক সম্পর্ক তালো থাকে।
 - ii. পারিবারিক সমস্যা সমাধান সহজ হয়।
 - iii. সদস্যদের আচরণগত বৈশিষ্ট্য জানা যায়।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ও ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সায়মার বড় ছেলেটি অবসরে ঘরে বসে টিভি দেখে ও গল্পের বই পড়ে। আর ছেট ছেলেটি সময় পেলেই বাসার পাশের মাঠে খেলতে চলে যায়। একদিন সায়মা বড় ছেলেকে দোকান থেকে কিছু জিনিস কিনে আনতে বললে সে বিরক্ত হয়ে যায়।

৩। সায়মার মধ্যে কোন গুণের অভাব রয়েছে?

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| ক) মানব প্রকৃতি সম্বলেখে জ্ঞান | খ) অভিযোজ্যতা |
| গ) বিচার ক্ষমতা | ঘ) বৃদ্ধিমত্তা |

৪। উক্ত গুণ অর্জনে সায়মার করণীয় কোনটি?

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| ক) সন্তানদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করা | খ) সন্তানদের আদর করা |
| গ) ধৈর্য ধারণ করা | ঘ) নিজেই কাজটি করা |

সূজনশীল প্রশ্ন

১। স্বামী-সন্তান নিয়ে সানজিদা খাতুনের সুর্খের সংসার। সন্তানদের লেখা-পড়ায় ভালো ফলাফল লাভের জন্য বিভিন্নভাবে তিনি উৎসাহ দিয়ে থাকেন। তবে বাসায় মেহমান এলে তাদের যত্ন ও আপ্যায়ন করতে তিনি প্রায়শ বিরক্ত হন।

- ক. গৃহে যাবতীয় কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রবিদ্যু কে?
- খ. গৃহে সুষ্ঠু কর্ম-ব্যবস্থা সৃষ্টি করা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর।
- গ. সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যাপারে সানজিদা খাতুনের কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. সানজিদা খাতুনের মেহমান আপ্যায়নের বিষয়টি দক্ষ গৃহ ব্যবস্থাপকের গুণাবলির সাথে সামঞ্জস্য কি না - বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়

গৃহসম্পদ

পাঠ ১ – ২ সম্পদ ও সম্পদের বৈশিষ্ট্য

প্রতিটি পরিবারেই কিছু না কিছু সম্পদ থাকে। এই সম্পদ দ্বারাই পরিবার সুস্থ, সুন্দর এবং স্বাভাবিক জীবন প্রবাহের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। একটি পরিবারের সর্বাপেক্ষা বড় সম্পদ হচ্ছে মানুষ এবং এই মানব সম্পদ অপরাপর বস্তুগত সম্পদ সৃষ্টির হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। অনেকের অর্থ, জমিজমা, বাড়ি-ঘর নাও থাকতে পারে কিন্তু একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব, শিক্ষা, কর্মদক্ষতা, সময় ও শক্তি ইত্যাদি দ্বারা অর্থ সঞ্চাহের পথ সুপ্রশস্ত হয় এবং অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা করে পরিবারের বস্তুগত সম্পদ বৃদ্ধি করা যায়।

প্রতিটি পরিবারে দেখা যায় গৃহকর্তা তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, সময়, শক্তি, ধৈর্য, কর্মক্ষমতা ইত্যাদির দ্বারা পরিবারের অর্থ উপার্জন করে থাকেন। আর গৃহকর্তা যদি অর্থ উপার্জন নাও করেন তবুও তিনি তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, সময়, শক্তি, ধৈর্য, কর্মতৎপরতা দ্বারা অর্থকে সুস্থুভাবে পরিচালনা করে পরিবারের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন এবং অন্যান্য সম্পদও বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করেন।

‘সম্পদ’ গৃহ ব্যবস্থাপনার মৌলিক উপকরণ। সম্পদ ছাড়া লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। অর্থনীতিতে যেসব বস্তু বা সেবা সামগ্ৰী মানুষের অভাব মোচনে সহায়ক এবং যার বিনিময়মূল্য আছে তাই সম্পদ। কিন্তু গার্হস্থ্য বিজ্ঞানে যা দ্বারা পরিবার সকল চাহিদা পূরণ করে এবং অভিষ্ঠ লক্ষ্য অর্জন করে তাই সম্পদ। যেমন: অর্থ, জমি, বাড়ি, গাড়ি, গৃহের যাবতীয় দ্রব্যসামগ্ৰী এবং শক্তি, সময়, স্বাস্থ্য ইত্যাদি। সুতরাং আমরা বলতে পারি, যা ব্যবহার করে আমরা তৃপ্ত হই, আমাদের চাহিদা মেটাতে পারে, অভাব দূর করতে পারে এবং লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে তাই সম্পদ।

সম্পদের বৈশিষ্ট্য— সম্পদ আমাদের যাবতীয় চাহিদা পূরণের হাতিয়ার। সম্পদ ব্যবহার করে আমরা উপকৃত হই। সম্পদের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে : ১. উপযোগ (Utility) ২. আয়ন্তাধীন (Accessibility) ৩. সীমাবন্ধতা (Limitation) ৪. পরস্পর পরিবর্তনশীলতা (Inter-changeability) ৫. পরিচালনা যোগ্যতা (Manageability)

১। **উপযোগ (Utility)**— মানুষের অভাব মোচনে পণ্যের ক্ষমতাই হলো উপযোগ। যেসব দ্রব্যসামগ্ৰীর উপযোগ আছে সেসব দ্রব্যসামগ্ৰী মানুষ পেতে চায়। কারণ উপযোগ বিশিষ্ট দ্রব্যসামগ্ৰী ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ তার অভাব মেটাতে সক্ষম হয়। তাই পণ্য বা সম্পদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো উপযোগ।

শিক্ষা, বুদ্ধি, স্থান, সময়, আকার, স্বত্ব ও সৃজনশীলতার উপর উপযোগ নির্ভর করে। যেমন—শিক্ষার ক্ষেত্ৰে বইয়ের উপযোগ বেশি। স্বল্প মূল্যে পুষ্টিৰ খাদ্য তৈরিতে পুষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান ও বুদ্ধিৰ উপযোগ বেশি। গ্ৰীষ্মেৰ সময় পানিৰ ও পাখাৰ উপযোগ বেশি। আবাৰ যখন কুধা পায় তখন খাদ্যেৰ উপযোগ বৃদ্ধি পায়। পিপাসা পেলে পানিৰ উপযোগ বৃদ্ধি পায়। আবাৰ একটা দ্রব্যেৰ উপযোগিতা সবাৰ কাছে এক রকম নয়। যেমন : যে পান খায় তাৰ কাছে পানেৰ উপযোগ বেশি কিন্তু যে পান খায় না তাৰ কাছে এৱে কোনো উপযোগ নাই।

চারটি উপায়ে উপযোগ বৃদ্ধি কৱা যায় —

ক. আকৃতিৰ পরিবৰ্তন কৱে — যেমন : চাউলকে সিদ্ধ কৱে ভাত রান্না কৱা হয়, যখন গুঁড়া কৱে পিঠা তৈৰি কৱা হয় তখন এৱে উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

- খ. সময়েগ্রামী ব্যবহার করে – আমরা ব্যাংকে অর্থ সঞ্চয় করি, যদি জমি বা বাড়ি ক্ষেত্রে এই অর্থ ব্যবহার করতে পারি তবেই অর্থের উপযোগিতা বৃদ্ধি পায় ।
- গ. স্থানান্তরকরণ দ্বারা – সম্পদের উপযোগ স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে বাড়ানো যায় । যেমন – রাজশাহী অঞ্চলে প্রচুর আম উৎপন্ন হয় । এই আম অন্যান্য অঞ্চলে স্থানান্তর করে আমের উপযোগ বাড়ানো হয় ।
- ঘ. চাহিদা মেটানোর দ্বারা – একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো জিনিসের চাহিদা অনেক প্রকট থাকে । যেমন: পিপাসা পেলে পানির চাহিদা প্রকট । পরীক্ষার সময় কাগজ ও কলমের চাহিদা প্রকট ।

২। **আয়ত্তাধীন (Accessibility)**– সম্পদ আয়ত্তাধীন হতে হবে । সম্পদ ব্যবহার করতে হলে আয়ত্তাধীন বা মালিকানাধীন হতে হবে । অন্যের অর্থ নিজের খুব কমই কাজে লাগে । সম্পদ নিজের আয়ত্তাধীন না হলে তার উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না । অন্যের সম্পদ যদি ধার নেওয়া যায় বা কেউ দান করে তখনই অন্যের সম্পদ কাজে আসে । সম্পদের আয়ত্তাধীন মালিকানা সম্পদের গুণগত বৈশিষ্ট্য । এই গুণগত দিক নির্ভর করে সম্পদের ব্যবহারের উপর । যেমন – জমির উর্বরতা যত বাড়ানো যাবে মালিক তত লাভবান হবে । ব্যাংকের গচ্ছিত অর্থ প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করতে না পারলে পরে সে অর্থ ততটা কাজে আসে না ।

কিছু কিছু সম্পদ আছে যা আয়ত্ত বা অর্জন করার জন্য অনুশীলন প্রয়োজন । যেমন : দক্ষতা, সুস্থান্ত্য ইত্যাদি ।

৩। **সীমাবদ্ধতা (Limitation)** সীমাবদ্ধতা সম্পদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য । সম্পদ গুণগত ও পরিমাণগত দিক দিয়ে সীমাবদ্ধ । যেমন : শক্তি গুণগত দিক দিয়ে সীমাবদ্ধ এবং সময় পরিমাণগত দিক থেকে সীমাবদ্ধ ।

তবে কোনো সম্পদের সীমাবদ্ধতা স্থিতিস্থাপক । যেমন : শিক্ষক যখন শ্রেণিকক্ষে পাঠ দেন, তখন জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে একই শ্রেণিকক্ষের সকলে ব্যক্তিগত বৃদ্ধি ও আকাঙ্ক্ষার সীমাবদ্ধতার জন্য সমান জ্ঞান লাভ করতে পারে না । সময়ের সীমাবদ্ধতা সর্বজনীন । আবার শক্তির সীমাবদ্ধতা ব্যক্তি বিশেষে তারতম্য ঘটে । তবে সুষৃদ্ধ ব্যবস্থাপনা দ্বারা সময় ও শক্তির সীমাবদ্ধতা নিয়ন্ত্রণ করা যায় ।

৪। পরস্পর পরিবর্তনশীলতা (Inter-changeability)

সম্পদ পরস্পর পরিবর্তনশীল । পরস্পর পরিবর্তন আমরা কয়েকটি ভাবে করতে পারি ।

- **বিকল্প সম্পদ ব্যবহার :** বিকল্প বলতে একটার পরিবর্তে অন্যটি ব্যবহার বোঝায় । যেমন : ভাতের পরিবর্তে বুটি খাওয়া । পরিবেশ রক্ষার জন্য পলিথিনের পরিবর্তে কাগজ বা কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহার করা ইত্যাদি ।
- **বহুবিধ ব্যবহার :** একই সম্পদকে বহুবিধ কাজে ব্যবহার করা যায় । যেমন : খাবার টেবিল – চেয়ারকে পড়াশোনা, আলোচনা, কাপড় ইস্ত্রি করা ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা যায় ।
- **বিনিময় :** সম্পদ বিনিময়যোগ্য । যেমন : টাকার বিনিময়ে পণ্য ক্রয় ।
- **বৃগান্তরযোগ্য –** একটা সম্পদকে আর একটি সম্পদে বৃপ্তির করা যায় । যেমন : পুরনো শাড়ি দিয়ে কাঁথা, ঘরের পর্দা, শিশুর জামা তৈরি করা । এতে সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি পায় ।
- **স্থান –** একটা সম্পদ ব্যবহার করে অন্য সম্পদ স্থান করা যায় । যেমন – জমিতে চাষাবাদ করে ফসল উৎপাদন করা । বাড়ির ছাদে সবজি উৎপাদন করা ।

৫। পরিচালনা যোগ্যতা (Manage ability)

সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারকেই পরিচালনা বলা হয়। মানুষ সচেতন বা অবচেতনভাবেই হোক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। যেমন— বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে সময়, জ্ঞান, দক্ষতা, অর্থ ইত্যাদি সম্পদের ব্যবহার করা হয়। এসব সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন— পরিবেশনা, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ তত্ত্বাবধায়ন ও মূল্যায়নের প্রয়োজন হয়।

সম্পদের পরিচালন যোগ্যতা বৈশিষ্ট্যের কারণেই আমরা উপকৃত হই। যেমন—

- লক্ষ্য অর্জন করা যায়
- সম্পদ বৃদ্ধি পায়
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে
- অভাব ও দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা মোকাবিলা করা যায়
- পরিতৃপ্তি লাভ করা যায় ইত্যাদি।

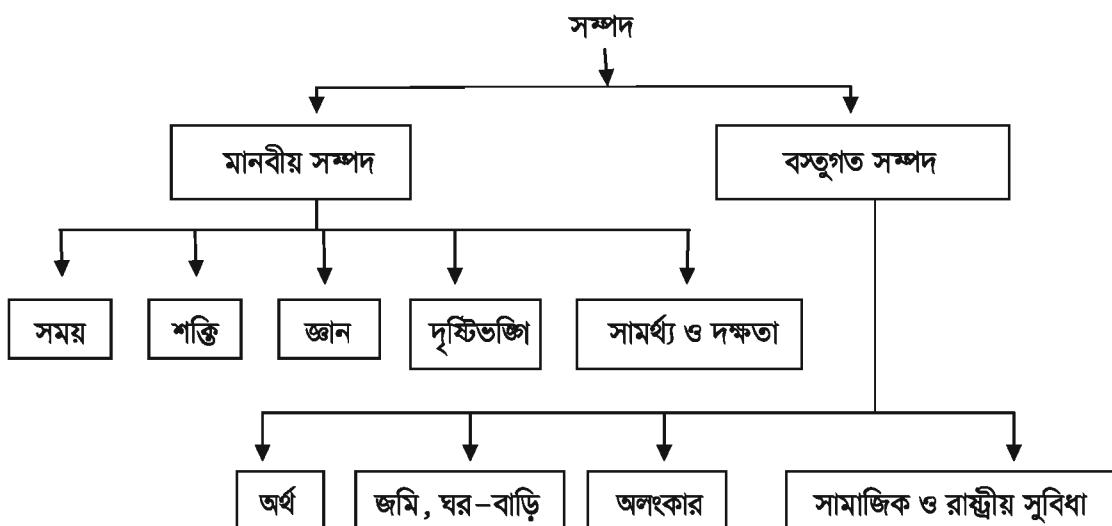
কাজ – ‘সম্পদ পরস্পর পরিবর্তনশীল’ এই বৈশিষ্ট্যটি দুর্যোগকালে কীভাবে প্রয়োগ করা যায় উদাহরণসহ লেখ।

পাঠ ৩ – সম্পদের শ্রেণিবিভাগ

প্রতিটি মানুষই কিছু না কিছু সম্পদের অধিকারী। তাই সম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ও সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য সম্পদের শ্রেণি বিভাগ সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

সম্পদকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় –

১। মানবীয় সম্পদ ২। বস্তুগত সম্পদ



১। **মানবীয় সম্পদ** – যা মানুষের গুণ, চর্চা বা অনুশীলনের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় তাকে মানবিক সম্পদ বলে।
যেমন : সময়, বিদ্যা, শক্তি, দক্ষতা, জ্ঞান ইত্যাদি। প্রতি পরিবারে একাধিক সদস্য থাকে। প্রত্যেক সদস্যের

সামর্থ্য অনুযায়ী সময়, শক্তি, জ্ঞান, দক্ষতার যদি সুষ্ঠু ব্যবহার করা যায় তবে পরিবারটি সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়ে লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। পরিবারের সদস্যদের দক্ষতা, পারদর্শিতা, মনোভাব গৃহ ব্যবস্থাপনাকে সহজ করে এবং অমানবীয় বা বস্তুবাচক সম্পদের অপচয় হ্রাস করে এবং সমৃদ্ধি ঘটায়। যেমন— বাজেট করে চলা। বাজেট করে চললে অর্থকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়। অর্থের অপচয় হ্রাস পায়।

আবার সময় তালিকা করে চললে সব কাজ সময়মতো শেষ করে জীবনে সফলতা অর্জন করা যায়। গৃহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় ও বস্তুগত সম্পদ বৃদ্ধিতে মানবীয় সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে মানবীয় সম্পদগুলোর গুরুত্ব আলোচনা করা হলো।

সময় (Time) — গার্হস্থ্য অর্থনীতিবিদগণ সময়কে মানবীয় সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। সময় ছোট-বড়, ধনী-গরিব সব মানুষের জন্যই সমান। সবার জন্যই ২৪ ঘণ্টা সময় নির্ধারিত। যে এর সুষ্ঠু ব্যবহার করতে পারে সে জীবনে সফল হয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

শক্তি (Energy) — শক্তি দুই ধরনের হয়। শারীরিক শক্তি ও মানসিক শক্তি। যে কোনো কাজ করার জন্য দুই ধরনের শক্তির প্রয়োজন হয়। উপযুক্ত অভ্যাস, অনুশীলন ও সূচিস্থিত পরিকল্পনা দ্বারা শক্তি ব্যয় করার দক্ষতা বৃদ্ধি করে সফলতা অর্জন করা যায়।

জ্ঞান (Knowledge) — গৃহকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ হচ্ছে জ্ঞান। পুষ্টিবিষয়ক জ্ঞান, বস্ত্র বিষয়ক জ্ঞান, শিশু পালনের জ্ঞান, গৃহপরিচালনা সম্পর্কিত জ্ঞান, ধর্মীয় জ্ঞান, বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানই একজন মানুষকে পরিবারে ও কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

দৃষ্টিভঙ্গি (Out look) — ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দেখা যায়। চিন্তা, চেতনা, অনুভূতি, বিশ্বাস ইত্যাদি ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির সমষ্টি। শৈশবে শিশুর দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে পিতা-মাতার চিন্তাধারা থেকে। তারপর বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশুর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে। এই দৃষ্টিভঙ্গিই জীবনকে পরিচালিত করে।

সামর্থ্য ও দক্ষতা (Ability and Skill) — পরিবারের সদস্যদের সামর্থ্য ও দক্ষতা পরিবারের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে। তাই সামর্থ্য ও দক্ষতা পরিবারের সম্পদ। যে পরিবারের সদস্যদের সামর্থ্য ও দক্ষতা যত বেশি সে পরিবার তত উত্তীর্ণ। তবে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যদের সামর্থ্য ও দক্ষতা এক রকম নয়। সামর্থ্য ও দক্ষতা অনুযায়ী পরিবারের সকল কাজ ভাগ করে নিলে কাজের মান ভালো হয় এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুসম্ঝুরণ গড়ে উঠে।

কাজ – মানবিক সম্পদের গুরুত্ব সেখ।

২। বস্তুগত সম্পদ : যে বস্তু ও সেবা চাহিদা পূরণে সহায়ক তাই বস্তুগত সম্পদ। যেমন: টাকা, জমি, বাড়িঘর ইত্যাদি। আবার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুবিধাদি, যেমন— রাস্তা-ঘাট, বাজার, স্কুল-কলেজ, পরিবহন সুবিধা ইত্যাদি আমাদের চাহিদা পূরণ করে এবং গৃহজীবনকে সহজ করে।

অর্থ (Money) — অর্থ একটি বস্তুগত সম্পদ। এর বিনিময় মূল্য আছে এবং হস্তান্তরযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য। মানুষের জীবনে অর্থের গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থ দ্বারা আমরা দ্রব্য ও সেবাকর্ম ক্রয় করে থাকি। এর সুষ্ঠু ব্যবহার জীবনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দান করে।

জমি, বাড়ি ও অঙ্গকার (Land, House and Ornament) – এর বিনিময় মূল্য আছে। পরিমাপ করা যায়। মালিকানা হস্তান্তর করা যায়। তবে এর ব্যবহারে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রয়োজন। অপরিকল্পিতভাবে সম্পত্তি গড়ে তুললে দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুবিধা (Social and National Facilities) – সমাজ থেকে আমরা যেসব সুযোগ–সুবিধা লাভ করি তাই সামাজিক সম্পদ। রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, গ্যাস, স্কুল–কলেজ, বাজার ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সুবিধা অধিকার সুত্রে মানুষ পেয়ে থাকে। পার্ক, বিনোদন কেন্দ্র ইত্যাদি পারিবারিক জীবনের একঘেয়েমি দূর করে। এইগুলো একটি দেশের জনগণ অধিকার সুত্রে ভোগ করার সুযোগ পায়।

পাঠ ৪ – সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা –

সম্পদ ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্যই হলো এর ব্যবহার দ্বারা সর্বোচ্চ তৃপ্তি লাভ করা এবং লক্ষ্য অর্জন করা। আমাদের চাহিদা অসীম, কিন্তু সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই অসীম চাহিদাকে সীমিত সম্পদ দ্বারা পূরণ করতে হলে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার প্রয়োজন।

- সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার পরিবারের আয় বাঢ়াতে, ব্যয় ত্রাস করতে ও অর্থ সঞ্চয় করতে সহায়তা করে। পরিবারের সদস্যদের সময়, শক্তি, ক্ষমতা, দক্ষতা ও বৃদ্ধি ইত্যাদি মানবীয় সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করে পরিবারের আয় বাঢ়ানো যায় এবং ব্যয় ত্রাস করা যায়। যেমন – গৃহের আঞ্জিনায় সবজি উৎপাদন, ইঁস–মুরগি পালন, ঘরে পোশাক তৈরি ইত্যাদি।
- সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের ফলে সম্পদের সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। যেমন— গৃহিণী যদি পরিবারের কাজের দায়িত্ব পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেন তবে গৃহিণী নিজের অনেক সময় ও শক্তি বাঁচাতে পারেন। সে সময় ও শক্তি পরিবারের উন্নয়নমূলক কাজে বা অবসর বিনোদনে ব্যয় করতে পারেন। এতে পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জন্মে।
- সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে মানবীয় ও অমানবীয় সম্পদের সুষ্ম বর্ণন হয়। ফলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক ভালো থাকে। যেমন— বাজেট করে চলা। সময় তালিকা করে চলা। ফলে অল্প সম্পদ দ্বারাই অধিক তৃপ্তি লাভ করা যায় এবং মানসিক প্রশান্তি পাওয়া যায়।
- সম্পদের আয় বাঢ়াতে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার প্রয়োজন। গৃহের বিভিন্ন সরঞ্জামাদি বিশেষ করে রেফ্রিজারেটর, ইস্ত্রি, প্রেসারকুকার, ওভেন, আসবাবপত্র ইত্যাদির সঠিক যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ আর্থিক অপচয় ত্রাস ও মানসিক প্রশান্তি দান করে।

কাজ – সমাজ থেকে আমরা যে সকল সুযোগ–সুবিধা ভোগ করি সেগুলো সম্পর্কে লেখ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। উপযোগ নির্ভর করে কোনটির উপর?

- | | |
|-----------------|-----------|
| ক) জ্ঞান | খ) বৃদ্ধি |
| গ) দ্রষ্টিভঙ্গি | ঘ) দক্ষতা |

২। পরিবারকে সঠিকভাবে চালনার জন্য বেশি প্রয়োজন হয় কোনটির ?

- ক) শারীরিক শক্তি
- খ) মানসিক শক্তি
- গ) ডাঙ
- ঘ) সময়

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

হায়দার সাহেব বাড়ি তৈরি করতে গিয়ে নিজে দেখাশোনা করতে পারলেন না। যাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তিনি তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করলেন। কিছুদিন পর দেখা গেল তার বাড়ির দেয়ালে ফাটল ধরেছে।

৩। হায়দার সাহেব বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি অবস্থান করলে এই অবস্থার সৃষ্টি হতো না-

- ক) বিকল্প সম্পদের ব্যবহার করা
- খ) সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি করা
- গ) ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি অনুসরণ করা
- ঘ) সম্পদকে বহুবিধ কাজে ব্যবহার করা।

৪। হায়দার সাহেবের বাড়ির দেয়ালে ফাটল ধরার কারণ কী ?

- i. সময় না দেওয়া।
- ii. লক্ষ্য অর্জন না করা।
- iii. ব্যবস্থাপনার ধাপ না মানা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক) i ও ii
- খ) i ও iii
- গ) ii ও iii
- ঘ) i, ii ও iii

সূজনশীল প্রশ্ন

১। আয়েশা বেগম একজন গৃহিণী। তিনি সীমিত সম্পদের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করেন। প্রয়োজনে তিনি তার পুরোনো শাড়ি দিয়ে থবের পর্দা, পাপোষ তৈরি করেন। আয়েশা বেগমের নিজস্ব প্রচেষ্টার মাধ্যমে তার পরিবারের চাহিদা মেটান। পরিবারের সকলে তার উপর সন্তুষ্টি।

- ক. শক্তি কোন দিক দিয়ে সীমাবদ্ধ ?
- খ. কোন ধরনের সম্পদ হস্তান্তরযোগ্য ব্যাখ্যা কর।
- গ. আয়েশা বেগমের কাজের মাধ্যমে সম্পদের কোন বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের ফলে আয়েশা বেগমের উপর সকলে সন্তুষ্টি-বিশ্বেষণ কর।

২। রহিমা খাতুন একজন গৃহিণী। তার কাছ থেকে পরিবারের অন্য সদস্যরা গৃহকর্মে সাহায্য-সহযোগিতা পাচ্ছে। তিনি সৎসারের কাজ অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করে নিজে ইস-মুরগি পালন করে পরিবারের চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করেন। তার কফ্টের উপার্জিত অর্থ তার কলেজ পড়ুয়া ছেলে বিভিন্ন বাহানায় নষ্ট করে। বললেও শোনে না।

- ক. উপযোগ কী ?
- খ. সম্পদের সীমাবদ্ধতা বলতে কী বোঝায় ?
- গ. রহিমা খাতুনের ছেলে কোন ধরনের সম্পদ নষ্ট করে – ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. গৃহপরিচালনায় রহিমা খাতুন বিভিন্ন প্রকার সম্পদ ব্যবহারে পারদর্শী কি না? মূল্যায়ন কর।

চতুর্থ অধ্যায়

গৃহসম্পদের ব্যবস্থাপনা

পাঠ ১ – অর্থ ব্যবস্থাপনা – বাজেট, বাজেটের প্রয়োজনীয়তা ও বাজেটের খাত

গৃহ ব্যবস্থাপনায় অর্থকে বস্তুবাচক সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অর্থ বস্তুবাচক সম্পদগুলোর মধ্যে অন্যতম ও প্রধান। মানবজীবনে অর্থের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের যে কোনো চাহিদা পূরণ করতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় অর্থের। অর্থের বিনিময়ে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা সংগ্রহ করি। অর্থকে সুস্থ ও সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমাদের অসীম চাহিদাগুলো সীমিত অর্থ দ্বারা পূরণ করা সম্ভব। অর্থ ব্যবস্থাপনা বলতে বোঝায় লক্ষ্য অর্জন বা চাহিদা পূরণ করতে অর্থকে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে। গৃহ ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগুলো অর্থ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন- চাহিদা পূরণ করে লক্ষ্য অর্জনের জন্য অর্থ ব্যবহারের পরিকল্পনা, পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করা এবং সবশেষে মূল্যায়ন করা। পরিবার বিভিন্ন ভাবে আয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে থাকে। অন্যান্য সম্পদের মতো পরিবারের অর্থসম্পদও সীমিত। যেহেতু অর্থ একমাত্র বিনিময়ের মাধ্যম তাই অর্থ দিয়েই আমাদের সব চাহিদা পূরণের উপকরণগুলো সংগ্রহ করতে হয়। ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য আমরা অর্থ সঞ্চয় করতে পারি। এ মূল্যবান সম্পদকে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যয় করতে যে কৌশল অবশ্যন্দন করা হয় তা বাজেট নামে পরিচিত।

বাজেট

বাজেট হচ্ছে অর্থ ব্যয়ের পূর্বপরিকল্পনা। আরও স্পষ্টভাবে বলা যায়, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট আয়ের ব্যয় ও সঞ্চয় করার পূর্বপরিকল্পনা হচ্ছে বাজেট। বাজেটে সম্ভাব্য আয়কে কোন কোন খাতে, কোন কোন সময়ে কী পরিমাণে ব্যয় করা হবে, তার লিখিত বিবরণ থাকে। সুপরিকল্পিতভাবে ব্যয় করলে মূল্যবান অর্থের অপচয় ঘটে না। অধিকন্তু আমাদের সব চাহিদা পূরণ হয়ে থাকে।

বাজেটের প্রয়োজনীয়তা

বাজেট অর্থ ব্যয়ের একটি চমৎকার কৌশল। বাজেট সীমিত অর্থে আমাদের সকল চাহিদা পূরণ করতে সাহায্য করে। বাজেটের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রয়োজনীয়তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

- বাজেট পরিবারের আয় ও ব্যয় সম্বন্ধে ধারণা দেয়।
- পরিবারের অপচয় রোধ করে স্বচ্ছতা আনয়নে সাহায্য করে।
- ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের ব্যবস্থা নিতে সাহায্য করে।
- গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পূরণ করে।
- বাজেট পরিবারের সদস্যদের মিতব্যয়ী হতে সাহায্য করে।
- বাজেট করে অর্থ ব্যয় করলে সময় ও শক্তির সাম্প্রয় হয়।
- বাজেট পরিবারের সদস্যদের সকল চাহিদা পূরণ করে তাদের সন্তুষ্টি দিতে পারে।

বাজেটের খাত

প্রকৃত বাজেট প্রস্তুত করার সময় কোন কোন খাতে অর্থ ব্যয় করতে হবে সেগুলো স্থির করতে হয়। পারিবারিক জীবন যাপনের যেসব ক্ষেত্রে ব্যয় করতে হয়, সেগুলোই বাজেটের খাত হিসেবে পরিচিত। গুরুত্ব

অনুযায়ী খাতগুলো সাজিয়ে নিয়ে প্রতিটি খাতের মধ্যে কোন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তা নির্ধারণ করতে হবে। খাতগুলো সাজানো হয় পরিবারের প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুসারে। জীবনধারণের প্রয়োজনে সাধারণত খাতগুলো নিম্নোক্তভাবে সাজানো থাকে—

খাদ্য ক) শুকনা বাজার, যেমন-চাল, আটা, ডাল, চিনি, চা, সেমাই, বিভিন্ন শুকনা মসলা ইত্যাদি। খ) কাঁচাবাজার, যেমন-মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, শাকসবজি, ফল ইত্যাদি।	চিকিৎসা ক) চিকিৎসকের ফি খ) ঔষধ ও পথ্য
বাসস্থান ক) ভাড়া খ) বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, জ্বালানি খরচ ইত্যাদি। গ) নিজস্ব বাড়ির ট্যাক্সি, মেরামত ও যত্নবাবদ ব্যয় ইত্যাদি।	সদস্যদের ব্যক্তিগত কার্যাবলি ক) ভাতা বা হাত খরচ খ) আমোদ-প্রমোদ ব্যয়।
বস্ত্র ক) বস্ত্র ও পোশাক ক্রয় খ) পোশাক তৈরি ও মেরামত গ) বস্ত্র ধোত ও ইস্ত্রি।	অন্যান্য খরচ ক) মেহমানদারি খ) উপহার ও চাঁদা গ) যাতায়াত ঘ) খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন ইত্যাদি। ঙ) গৃহকর্মীর বেতন।
শিক্ষা ক) মাদরাসার বেতন খ) বই, খাতা, কলম, পেনসিল ইত্যাদি। গ) গৃহশিক্ষকের বেতন।	সঞ্চয় ক) ভবিষ্যৎ তহবিল খ) ব্যাংক, ইনসিউরেন্স, প্রাইজবন্ড, সঞ্চয়পত্র ইত্যাদি।

কাজ - ‘প্রকৃত বাজেট সময় ও শক্তির সাথ্য করে’— তোমার যুক্তিগুলো লিপিবদ্ধ কর।

পাঠ ২ - বাজেট তৈরির নিয়ম

বাজেট তৈরির ক্ষতকগুলো নিয়ম আছে, যা অনুসরণ করে প্রকৃত বাজেট তৈরি করা যায়। প্রতিটি কাজ যেমন নিয়ম মাফিক না করলে কাজগুলো সঠিক ও সুন্দরভাবে করা সম্ভব হয় না, তেমনি বাজেট করার সময় নিয়ম অনুযায়ী না করলে বাজেট যথার্থ এবং কার্যকরী হবে না। বাজেট তৈরি করার নিয়মগুলো নিচে বর্ণিত হলো—

- বাজেট সাধারণত মাসিক ভিত্তিতে করা হয়। তাই মাসের সম্মান্তর মোট আয় নির্ধারণ করে নিতে হবে। আয়ের হিসাব করার সময় পরিবারের সব রকম উৎসের দিকে নজর দিতে হবে। যেহেতু অর্থ দিয়ে বাজেট করতে হয়, তাই পরিবারের মোট আর্থিক আয় নির্ণয় করতে হবে।
- যে সময়ের বাজেট করা হবে সে সময়ে পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবাকর্মের একটি তালিকা নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলোকে প্রধান খাতে শ্রেণিভুক্ত করে প্রত্যেক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দ্রব্যের নাম উল্লেখ করতে হবে।

- তালিকাভুক্ত প্রতিটি দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করার আগে সব জিনিসের বাজারদর সঠিকভাবে জানতে হবে। এরপর সবগুলোর মূল্য একত্রে বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের মতামত নেওয়া ভালো। বিভিন্ন সদস্যদের কাছ থেকে দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের তথ্য পাওয়া যেতে পারে। ভালোভাবে না জেনে জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করলে বাজেট বাস্তবায়নে অসুবিধার সমুরোচ্চ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
- আনুমানিক আয়ের সাথে ব্যয়ের একটা সমতা রক্ষা করতে হবে। মোট আয় জানার পর সম্ভাব্য ব্যয়ের টাকার পরিমাণের সঙ্গে হিসাব করে দেখতে হবে যেন আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা থাকে। ব্যয় যেন কখনোই আয়ের অংক থেকে বেশি না হয়। তবে পারিবারিক আয় বাড়িয়ে অথবা খরচের পরিমাণ কমিয়ে এ অবস্থার মোকাবিলা করা যায়।
- কোন খাতে কতো ব্যয় করা যাবে তা নির্ধারণ করতে হবে। সাধারণত খাদ্য খাতে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ দিতে হয়। মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর বাজেটে খাদ্য খাতে শতকরা ৪০ থেকে ৬০ ভাগ পর্যন্ত বরাদ্দ দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে নিম্নবিত্তের বাজেটে এ খাতে আয়ের শতকরা ৮০ ভাগ খরচ হতে পারে। আয় যত বাড়ে শতকরা হারে খাদ্য খাতে ব্যয়ও তত কমে যায়। সাধারণত সর্বনিম্ন বরাদ্দ দেওয়া হয়—সংগ্রহ, চিকিৎসা ইত্যাদি খাতে।
- পরিশেষে বাজেটটিকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যেন তা বাস্তবায়ন করা যায়। কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় রাখলে বাজেটকে বাস্তবমূর্খি করা যায়। যেমন—প্রত্যেক সদস্যের প্রয়োজনগুলোর দিকে খেয়াল রাখা, জরুরি অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য কিছু বাড়তি অর্থ সব সময় হাতে রাখা, দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যের দিকে খেয়াল রাখা ইত্যাদি।

একটি মাসিক বাজেটের নমুনা দেওয়া হলো—

পরিবারের মাসিক মোট আয়—৩০,০০০/- টাকা

সদস্য সংখ্যা—৪ জন।

খাত	সম্ভাব্য খরচ (টাকা)	মোট খরচ (টাকা)	শতকরা হার %
১। খাদ্য ক) শুকনা বাজার খ) কাঁচাবাজার	৫০০০/- ৭০০০/-	১২,০০০/-	৪০%
২। বাসস্থান ক) ভাড়া খ) বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, জ্বালানি খরচ ইত্যাদি।	৭০০০/- ২০০০/-	৯,০০০/-	৩০%
৩। বস্ত্র ক) বস্ত্র ও পোশাক ক্রয় খ) পোশাক তৈরি ও মেরামত গ) বস্ত্র ধোত ও ইস্ত্রি।	১০০০/- ৮০০/- ২০০/-	১,৬০০/-	৫.৩৩%
৪। শিক্ষা ক) মাদরাসার বেতন খ) বই, খাতা, কলম, পেনসিল ইত্যাদি। গ) গৃহশিক্ষকের বেতন।	১০০০/- ৫০০/- ২০০০/-	৩৫০০/-	১১.৬৭%

৫। চিকিৎসা			
ক) চিকিৎসকের ফি	৮০০/-	৬০০/-	২%
খ) ঔষধ ও পথ্য	২০০/-		
৬। সদস্যদের ব্যক্তিগত কার্যাবলি			
ক) ভাতা বা হাত খরচ	৩০০/-		
খ) আমোদ-প্রমোদ ব্যয়।	৮০০/-	৭০০/-	২.৩৩%
৭। অন্যান্য খরচ			
ক) মেহমানদারি	৮০০/-		
খ) উপহার ও টাঁদা	৮০০/-	২২০০/-	৭.৩৩%
গ) যাতায়াত	২০০/-		
ঘ) খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন ইত্যাদি।	২০০/-		
ঙ) গৃহকর্মীর বেতন।	১০০০/-		
৮। সংগ্রহ	৮০০/-	৮০০/-	১.৩৩%
		৩০,০০০/-	১০০%

বিঃদ্রঃ ৪: বর্তমান সময়ের বাজার মূল্যের আলোকে বাজেটটি শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ব্যাখ্যা করবেন।

মন্তব্য- উল্লিখিত বাজেটটিতে আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ সমান। এ রকম বাজেটকে সুষম বাজেট বলে। যে বাজেটে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হয়, তাকে বলে ঘাটতি বাজেট। এ ছাড়া বাজেটে যদি আয়ের চেয়ে ব্যয় কম হয় সেটি হচ্ছে উন্নত বাজেট। উন্নত বাজেট হলো সবচেয়ে ভালো বাজেট। ঘাটতি বাজেট কখনোই কাম্য নয়। কারণ এ রকম বাজেটে খণ্ডের বোঝা বাড়ে।

কাজ – অভিভাবকের সহায়তায় তুমি তোমার পরিবারের মাসিক বাজেট তৈরি কর।

পাঠ ৩ – সময় ও শক্তির ব্যবস্থাপনা–সময় তালিকার প্রয়োজনীয়তা ও বিবেচ্য বিষয়

পারিবারিক মানবীয় সম্পদগুলোর মধ্যে সময় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। সময় এমনই এক সম্পদ যা কখনোই থেমে থাকে না বা কারও জন্য অপেক্ষা করে না। সময় সবচেয়ে সীমিত সম্পদ যা কোনো অবস্থাতেই বাঢ়ানো বা কমানো যায় না। সময় কখনো সংগ্রহ করা যায় না। বরং কোনো না কোনো কাজে একে ব্যবহার করতে হয়। যে ব্যক্তি যত বেশি অর্থবহু কর্মসূচি দিয়ে যথাযথভাবে নিজেকে সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারে জীবনে সেই তত বেশি সফলতা অর্জন করতে পারে। সময়কে যথাযথভাবে ব্যবহার করে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে, সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

সময়কে যথাযথভাবে ব্যয় করার জন্য প্রতিটি ব্যক্তিরই দৈনিক ২৪ ঘণ্টা সময়ের একটি পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। কোনো দিনের শুরু থেকে আবার নতুন দিন শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়ে কী কী কাজ করা প্রয়োজন, কখন করা প্রয়োজন এবং দৈনিক নির্ধারিত কাজের জন্য কতোটুকু সময় ব্যয় হবে ইত্যাদি বিবেচনা করে সময় তালিকা বা সময় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। প্রত্যেক মানুষের জীবনে সময় যেমন তার একান্ত নিজস্ব সম্পদ সে রকম সময় তালিকাও প্রত্যেক ব্যক্তির পৃথক হয়ে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির অভ্যাস, প্রয়োজন, পছন্দ, চাহিদা ইত্যাদির ভিত্তিতে সময় তালিকা তৈরি হয়।

সময় তালিকার প্রয়োজনীয়তা

দৈনন্দিন কাজগুলোকে সময় অনুযায়ী লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করে সময় তালিকা তৈরি করতে হয়। তালিকাটি এমন স্থানে রাখতে হবে, যাতে সহজেই নজরে পড়ে। তালিকা দেখে কাজ করতে থাকলে, একসময় তা অভ্যাসে পরিণত হবে। এর ফলে সময়মতো সব কাজ সম্পন্ন করার ভালো অভ্যাস গড়ে উঠে এবং সময়ের অপচয় করার প্রবণতা কমে যায়। সময়ের সম্ব্যবহারের মাধ্যমেই জীবনে সফলতা আনয়ন করা সম্ভব হয়। সময় তালিকার প্রয়োজনীয়তা নিচে বর্ণিত হলো।

- **করণীয় কাজ সম্পর্কে ধারণা জন্মে-** সময় তালিকা করে কাজ করলে করণীয় কাজ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হয়। কারণ কোন কাজ একান্ত প্রয়োজন, কোন কাজ করলে ভালো হয় ও কোন কাজ প্রয়োজনে বাদ দেওয়া যায়— এসব কিছু বিবেচনা করে সময় তালিকা করা হয়।
- **সময়মতো কাজ করার অভ্যাস হয়-** কাজের সময় নির্ধারিত থাকে বলে নির্ধারিত সময়েই কাজ সম্পন্ন করার প্রবণতা থাকে যা তবিষ্যতে অভ্যাসে পরিণত হয়।
- **সময়ের সাথে কাজের সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা বাড়ে-** সময় তালিকা করলে কোন কাজগুলোর জন্য সময় অপরিবর্তনীয় এবং কোন কাজগুলো প্রয়োজনে রদবদল করা যায় সে বিষয়ে ধারণা জন্মে। যেমন— ডাক্তারের কাছে যাওয়া, স্কুলে যাওয়া, দুপুরের ধর্মীয় কাজ এই সময়গুলো ইচ্ছে করলে বদলানো যায় না। তবে ঘুমের সময়, গল্প করার সময় ও পড়ার সময় প্রয়োজনে বদলানো যায়।
- **কাজের প্রয়োজনীয় সময় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হয়-** সময় তালিকায় কোন কাজে কটোটুকু সময় বরাদ্দ দেওয়া হবে তা নির্দিষ্ট করতে হয়। সুতরাং সে অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে প্রতিটি কাজের প্রয়োজনীয় সময় সম্বন্ধে ধারণা সৃষ্টি হয়।
- **অবসর বিনোদন সম্ভব হয়-** সময় তালিকায় কাজের সাথে বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা রাখতে হয়। ফলে অবসর বিনোদন ভোগ করার সুযোগ থাকে, যা ক্লাস্টি দূর করে নতুন উদ্দীপনায় কাজ করার প্রেরণা জোগায়।
- **কাজের দক্ষতা ও গতিশীলতা বাড়ে-** সময় তালিকা করলে সময়মতো বুচিনমাফিক কাজগুলো সম্পন্ন হয়ে যায়। ফলে অভ্যাসের কারণে কাজে দক্ষতা ও গতিশীলতা বাড়ে। সৃজনশীল কাজ করার সময় ও সুযোগ পেয়ে বিভিন্ন রকম কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

সময় তালিকায় বিবেচ্য বিষয়

কার্যকর সময় তালিকা প্রণয়নের সময় কিছু বিষয় বিবেচনায় আনতে হয়।

- দৈনিক করণীয় কাজগুলো ঠিক করতে হবে
- গুরুত্ব অনুসারে কাজগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সাজাতে হবে
- পরিবারের সদস্যদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সময় তালিকা করা প্রয়োজন
- কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য যতটুকু সময় প্রয়োজন সেভাবে সময় তালিকা প্রণয়ন করতে হয়
- পারিবারিক অবস্থা, সুযোগ-সুবিধা, সদস্যদের কাজের অভ্যাস বিবেচনা করে সময় তালিকা করতে হবে

- যে কাজগুলো একসাথে করলে সময় বাঁচে, সেভাবে কাজের সমন্বয় করতে হবে
- পারিবারিক কাজগুলোকে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক হিসেবে ভাগ করতে হবে। যে সব কাজ সাপ্তাহিক বা মাসিক, সেগুলোকে দৈনিক সময় তালিকা থেকে পৃথক রাখতে হবে
- সময় তালিকায় কাজের সময়, বিশ্রাম, শুম ও অবসরের ব্যবস্থা থাকতে হবে
- কঠিন কাজের পর হালকা কাজ দিতে হবে। এতে ক্লান্তি দূর হয় এবং পরবর্তী কাজে উৎসাহ পাওয়া যায়
- সময় তালিকা নমনীয় হতে হবে। যাতে প্রয়োজনে কিছুটা রদবদল করা যায়

কাজ – সময় তালিকা অনুযায়ী কাজ করলে কী কী সুবিধা হয়, চার্টের মাধ্যমে দেখাও।

পাঠ ৪ – দৈনিক সময় তালিকা প্রস্তুত

দৈনিক সময় তালিকা অনুসরণ করে কাজ করলে করণীয় সব কাজ সঠিক সময়ে সম্পন্ন হয়ে যায়। ফলে কাজে সফলতার আনন্দে নতুন উদ্যমে আরও কাজ করার ইচ্ছা বেড়ে যায়। ছাত্রজীবনে সময় তালিকা অনুসরণ করলে সফলতা লাভ করা যায়। প্রত্যেকের উচিত মূল্যবান সময় অপচয় না করে সময়ের কাজ সময়ে সম্পন্ন করা।

একজন মাদরাসা শিক্ষার্থীর জন্য সময় তালিকার দুইটি নমুনা দেওয়া হলো। তবে ঝুতুভুদে এতে সময়ের কিছু তারতম্য হতে পারে। কেননা শীতের দিনে রাত বড় দিন ছেট হয়। এ ছাড়া নামাজ/ধর্মীয় প্রার্থনার সময়ও ঝুতুভুদে তফাও হয়। তাই ঝুতু অনুযায়ী এ সময়গুলো নির্ধারণ করে নিতে হবে। এ ছাড়া বিশেষ প্রয়োজনে সময় তালিকায় কাজের কিছুটা পরিবর্তন আনা যায়। তবে তা আবার অন্য সময়ের কাজের সাথে খাপ খাওয়াতে হয়। ছাত্রজীবন থেকেই সময় তালিকা অনুযায়ী কাজ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

একজন মাদরাসা শিক্ষার্থীর জন্য একটি দৈনিক (মাদরাসা খোলার দিনে)

সময় তালিকার নমুনা

কাজের বিবরণ	সময়ের ব্যাপ্তিকাল, থেকে-পর্যন্ত	কাজের জন্য ধর্য সময়
সকালে শুম থেকে উঠা	৫.৩০	-
প্রাক্তিক কাজ সম্পাদন	৫.৩০-৫.৪৫	১৫ মিনিট
দ্বাত মাজা ও হাতমুখ ধোয়া	৫.৪৫-৫.৫৫	১০ মিনিট
প্রাতঃকালীন নিজ ধর্মীয় কাজ করা		
নিজের বিছানা গোছানো	৫.৫৫-৬.০৫	১০ মিনিট
মাদরাসার বুটিন দেখে সেদিনকার পড়া ও বই গোছানো	৬.০৫-৭.০৫	১ ঘণ্টা
নাশতা খাওয়া ও মাদরাসার জন্য তৈরি হওয়া	৭.০৫-৭.৩০	২৫ মিনিট
যাওয়া-আসাসহ মাদরাসায় অবস্থান সময়	৭.৩০-২.০০	৬ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
মাদরাসা থেকে ফেরার পর মাদরাসার কাপড় বদলানো ও স্বল্প বিশ্রাম গ্রহণ	২.০০-২.২০	২০ মিনিট
গোসল ও নামাজ/প্রার্থনা	২.২০-২.৩৫	১৫ মিনিট

কাজের বিবরণ	সময়ের ব্যাপ্তিকাল, থেকে—পর্যন্ত	কাজের জন্য ধার্য সময়
দুপুরের খাওয়া	২.৩৫-২.৫০	১৫ মিনিট
বিশ্রাম গ্রহণ	২.৫০-৪.০০	১ ঘণ্টা ১০ মিনিট
মাদরাসা থেকে দেওয়া বাড়ির কাজ করা	৪.০০-৫.০০	১ ঘণ্টা
হাতমুখ ধোয়া ও বিকেলের নামাজ/প্রার্থনা	৫.০০-৫.১৫	১৫ মিনিট
চুল আঁচড়ানো ও পরিপাটি হওয়া	৫.১৫-৫.৮০	২৫ মিনিট
মা-বাবা ও ভাইবেন্দের কাজে সাহায্য করা ও গজ করা এবং সবার সাথে কিছু নিয়ে আলোচনা	৫.৮০-৬.৮০	১ ঘণ্টা
হাতমুখ ধোয়া ও সম্ম্যোয় নামাজ/প্রার্থনা	৬.৮০-৭.০০	২০ মিনিট
হালকা নাশতা পরিবেশনে মাকে সাহায্য করা	৭.০০-৭.৩০	৩০ মিনিট
মাদরাসার পড়া তৈরি করা	৭.৩০-৮.৪৫	১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট
টেলিভিশন দেখা	৮.৪৫-৯.৮০	৫৫ মিনিট
রাতের খাবার খাওয়া এবং শোয়ার জন্য বিছানা তৈরি করা	৯.৪০-১০.০০	২০ মিনিট
টেলিভিশনে খবর শোনা	১০.০০-১০.১৫	১৫ মিনিট
মাদরাসার পড়ার বাকি অংশ শেষ করা	১০.১৫-১১.০০	৪৫ মিনিট
হাতমুখ ধোয়া এবং নামাজ/প্রার্থনা শেষ করে ঘুমাতে যাওয়া	১১.০০-১১.১৫	১৫ মিনিট
ঘুম	১১.১৫-৫.৩০	৬ ঘণ্টা ১৫ মিনিট
		মোট ২৪ ঘণ্টা

সময় তালিকা

একজন মাদরাসা শিক্ষার্থীর জন্য বল্দের দিনের সময় তালিকার নমুনা

কাজের বিবরণ	সময়ের ব্যাপ্তিকাল, থেকে—পর্যন্ত	কাজের জন্য ধার্য সময়
সকালে ঘুম থেকে উঠা	৫.৩০	-
প্রাকৃতিক কাজ সম্পাদন, দাঁতমাজা ও হাতমুখ ধোয়া	৫.৩০-৫.৪৫	১৫ মি.
ফজর নামাজ পড়া	৫.৪৫-৫.৫৫	১০ মি.
নিজের বিছানা গোছানো	৫.৫৫-৬.০৫	১০ মি.
মাকে নাশতা তৈরির কাজে সাহায্য করা ও নাশতা খাওয়া	৬.০৫-৭.২০	১ ঘণ্টা ১৫ মি.
ভাইবেন্দের সেখাপড়ায় সাহায্য করা	৭.২০-৮.০৫	৪৫ মি.
নিজের সাম্পত্তি নোঝা কাপড় আলাদা করা ও ধোয়ার জন্য প্রস্তুত করা	৮.০৫-৯.০৫	১ ঘণ্টা
মাকে ঘর পোছানো ও রান্নার কাজে সাহায্য করা	৯.০৫-১০.০৫	১ ঘণ্টা
টেলিভিশন দেখা	১০.০৫-১১.৩৫	১ ঘণ্টা ৩০ মি.
নখকাটা, চুল শ্যাঙ্গু করা, কাপড় ধোয়া ও গোসল করা	১১.৩৫-১.০৫	১ ঘণ্টা ৩০ মি.
নিজে পরিপাটি হওয়া	১.০৫-১.৩৫	৩০ মি.
দুপুরের খাবার খাওয়া, পরিবেশন করা ও টেবিল পোছানের কাজে মাকে সাহায্য করা ও যহরের নামাজ পড়া	১.৩৫-২.৩৫	১ ঘণ্টা
মা-বাবা, ভাইবেন্দের সাথে সময় কাটানো ও বিশ্রাম গ্রহণ	২.৩৫-৩.৩৫	১ ঘণ্টা
মাদরাসার সাম্পত্তি বাড়ির কাজ তৈরি করা	৩.৩৫-৪.৩৫	১ ঘণ্টা

ওয়ু করে আসরের নামাজ পড়া	৪.৩০-৪.৫০	১৫ মি.
বাইরে বেড়াতে যাওয়া কেনাকাটা করা	৪.৫০-৬.১০	১ ঘণ্টা ২০ মি.
ওয়ু করে মাগরীবের নামাজ পড়া	৬.১০-৬.৩০	২০ মি.
ভাইবোনদের লেখাপড়ায় সাহায্য করা	৬.৩০-৭.৪৫	১ ঘণ্টা ১৫ মি.
নিজের মাদরাসার পড়া তৈরি করা	৭.৪৫-৯.০০	১ ঘণ্টা ১৫ মি.
টেলিভিশন দেখা	৯.০০-৯.৫৫	৫৫ মি.
রাতে খাবার খাওয়া ও শোয়ার জন্য বিছানা তৈরি করা	৯.৫৫-১০.১৫	২০ মি.
মাদরাসার পড়ার বাকি কাজ শেষ করা	১০.১৫-১১.০০	৪৫ মি.
এশার নামাজ শেষ করা ও ঘুমাতে যাওয়া	১১.০০-১১.১৫	১৫ মি.
ঘুম	১১.১৫-৫.৩০	৬ ঘণ্টা ১৫ মি.
		মোট- ২৪ ঘণ্টা

কাজ - গ্রীষ্মের ছুটির বন্ধে এক দিনের একটি সময় তালিকা তৈরি কর।

পাঠ ৫ – শক্তি ব্যবস্থাপনা

অর্থ ও সময়ের মতো শক্তি পরিবারের একটি অন্যতম মৌলিক সম্পদ। মানবীয় এ সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের উপর পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য ও মানসিক পরিত্বক্ষিতি নির্ভর করে। অন্যান্য সম্পদের মতো শক্তির সংযবহারের প্রতি সকলের যত্নবান হওয়া উচিত। চাহিদা পূরণ করে লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের অনেক কাজ করতে হয়। যে কোনো কাজ এমনভাবে করতে হবে যাতে সে কাজে কম শক্তি ব্যবহার হয়। অথবা একই পরিমাণ শক্তি ব্যবহার করে যেন অনেক কাজ করা যায়। তাহলেই আমাদের সীমিত শক্তি দিয়ে আমরা অনেক কাজ করতে পারব। শক্তিকে যথাযথভাবে ব্যবহার না করলে তা ক্ষয় হয়ে যায়। ফলে কাজে অনীহা, ক্লান্তি ও বিরক্তির সৃষ্টি হয়। উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শক্তি ব্যবহার করলে, এর অপচয় রোধ করা যায়। শক্তির যথাযথ ব্যবহারের জন্য কিছু বিষয় বিবেচনা করতে হয়। যেমন-

- একটি কর্মতালিকা অনুসরণ করে কাজ করতে হবে।
- কোন কাজে কেমন শক্তি ব্যবহার করতে হয়, কীভাবে সহজে কাজটা করা যায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।
- বয়স, ব্যক্তিগত পছন্দ, আগ্রহ অনুযায়ী পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কাজগুলো বণ্টন করে দিতে হবে।
- কাজের সময় দুই হাত ব্যবহার করতে হয়। এ ছাড়া সঠিক দেহতন্ত্রিক বজায় রেখে কাজ করলে শক্তির অপচয় হয় না। যেমন- দাঁড়িয়ে ঘর মুছলে, বসে ঘর মোছার চেয়ে কম শক্তি ব্যবহার করতে হয়।
- ভারী কাজের পর বিশ্রাম গ্রহণ বা হালকা কাজ করতে হয়।
- বিভিন্ন রকম শ্রমলাভের যন্ত্রপাতির ব্যবহার করে শক্তির খরচ কমানো যায়। যেমন- প্রেসারকুকার, ওয়াশিং মেশিন, ওভেন, বৈদ্যুতিক ইস্ত্র ইত্যাদি।

এ ছাড়া শক্তির সুষ্ঠু ব্যবহারে কিছু কৌশল অবলম্বন করে, সহজে বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করা যায়। গৃহ ব্যবস্থাপনায় এ রকম কৌশলগুলো কাজ সহজকরণ পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত। কাজ সহজকরণ পদ্ধতিতে

শক্তির সুষ্ঠু ব্যবহারের প্রয়োজনীয় কৌশলগুলো নিম্নরূপ-

- দেহের সঠিক অবস্থান ও সঠিক গতি রক্ষা করে কাজ করা- শক্তির সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য কর্মকেন্দ্রের পরিসর এমন হওয়া উচিত, যাতে দেহের অবস্থান এবং দেহভঙ্গি ঠিক রেখে কাজ করা যায়। কাজের সরঞ্জামগুলো হাতের নাগালের মধ্যে থাকলে শক্তির সাধ্য হয়।
- কাজের সঠিক স্থান ও সঠিক সরঞ্জামের ব্যবহার- কাজের জন্য নির্ধারিত স্থানে কাজ করলে, কম শক্তি খরচ করে কাজ করা যায়। যেমন- খাবার ঘরে খাওয়ার কাজ সম্পন্ন করা, ধোয়ার স্থানে ধোয়া ইত্যাদি ব্যবস্থাগুলো সুবিধাজনক। প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলো কাজের স্থানে থাকলে অথবা হাঁটাহাঁটিতে শক্তির অপচয় হয় না। কাজের উপযোগী সঠিক সরঞ্জামও শক্তির সাধ্য করে। যেমন- ঘর মোছার জন্য কাপড়ের পরিবর্তে মপ ব্যবহার আরামদায়ক।
- সঠিক পদ্ধতিতে কাজ করা- সব কাজের সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম আছে, তা অনুসরণ করে কাজ করলে শক্তির সাধ্য হয়। যেমন- অনেক কাপড় আলাদা আলাদাভাবে না ধুয়ে সবগুলো একসাথে সাবান পানিতে ভিজিয়ে রেখে, একত্রে ধুয়ে শুকাতে দিলে কাজ সহজ হয় ও শক্তি বাঁচে।
- ব্যবহৃত সামগ্রী পরিবর্তন করা- বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত সামগ্রীর পরিবর্তন করেও শক্তির সাধ্য করা যায়। যেমন- খাবার টেবিলে কাপড়ের টেবিল ক্লথ ব্যবহার না করে প্লাস্টিকের টেবিল ক্লথ ব্যবহার করলে শক্তির অপচয় কম হয়।
- উৎপাদিত সামগ্রীর মান পরিবর্তন করা- উৎপাদিত সামগ্রীর মান পরিবর্তন করেও শক্তি বাঁচানো যায়। যেমন- সালাদ বানাতে শসা, টমেটো কুঁচি করে না কেটে স্লাইস করে কাটা যায়। এতে সময় ও শক্তির সাধ্য হয়।

কাজ - দৈনন্দিন কাজে শক্তির সাধ্য করার জন্য তুমি কী কী পদক্ষেপ নিতে পার তা শিখে জানাও।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ১। মানুষের চাহিদা পূরণে কোনটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন?

ক) সময়	খ) অর্থ
গ) শ্রম	ঘ) পরিকল্পনা
- ২। নির্ধারিত আয়ের মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখাকে কী বলা হয়?

ক) সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য	খ) সঠিক পরিকল্পনা
গ) যথাযথ তালিকা	ঘ) সুষম বাজেট

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আমেনা বেগম সংসারের সব কাজ একাই করেন। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত একটানা ভারী কাজগুলো করে তিনি ইঁপিয়ে উঠেন।

৩। আমেনা বেগম কীভাবে কাজ করলে ইঁপিয়ে উঠবেন না ?

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ক) ভারী কাজগুলো আগে করলে | খ) হালকা কাজগুলো আগে করলে |
| গ) ভারী কাজের পর হালকা কাজ করলে | ঘ) হালকা কাজের পর ভারী কাজ করলে |

৪। আমেনা বেগমের কাজের ক্ষেত্রে কোনটির অভাব পরিলক্ষিত হয় ?

- i) পরিকল্পনার
- ii) সময় তালিকার
- iii) নতুন উদ্যয়ে কাজ করার

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১। তানজিল সাহেব একজন চাকরিজীবী। তার মাসিক আয় ১০,০০০/- টাকা। স্ত্রী, স্কুল পড়ুয়া দুই সন্তান এবং অসুস্থ মাকে নিয়ে তাঁর সংসার। মাসের শুরুতে সংসার চালানোর টাকা স্ত্রীর কাছে দেন। মাস শেষ হওয়ার আগেই টাকা শেষ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে কষ্ট করে বাকি দিন চালাতে হয়।

ক. বাজেট কী ?

খ. বাজেটের খাত বলতে কী বোঝায় ?

গ. তানজিল সাহেবের পরিবারের জন্য একটি মাসিক বাজেট প্রণয়ন করে দেখাও।

ঘ. তানজিল সাহেবের সংসারে বাজেট করার প্রয়োজনীয়তা আছে কি? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

পঞ্চম অধ্যায়

গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জা

আমাদের মৌলিক চাহিদার মধ্যে বাসস্থান অন্যতম। গৃহকে বাসেপযোগী করার জন্য প্রয়োজন হয় আসবাবপত্র। আর গৃহকে মনোরম ও আকর্ষণীয় করে নাম্বনিকতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয় গৃহের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা। এই ক্ষেত্রে দামি আসবাবের প্রয়োজন নেই। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কমদামি জিনিস দিয়েও গৃহ সজ্জা করে বুটি ও শিল্পী মনের পরিচয় দেওয়া যায়। গৃহকে সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করে বসবাসের উপযোগী করে তোলার জন্য অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা একান্ত প্রয়োজন। পরিবার গৃহসজ্জার মাধ্যমে জীবনযাপনের মান উন্নত করে মানসিক তৃপ্তি লাভ করে। আর গৃহের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যকে কেন্দ্র করেই সামাজিক উন্নতির বিকাশ ঘটে।

পাঠ ১ – আসবাব নির্বাচন

আসবাবপত্র বলতে টেবিল, চেয়ার, সোফাসেট, খাট, ওয়ারড্রোব, আলমিরা, বুকশেলফ ইত্যাদি ভারী অথচ বহনযোগ্য গৃহসজ্জা সামগ্ৰীকে বোৰায়। গৃহের বিভিন্ন কাজ সম্পাদন সহজতর করার জন্য আসবাবের ভূমিকা অনেক। তাছাড়া আরাম ও সৌন্দর্য বাড়াতেও এগুলোর জুড়ি নেই।

শহর কিংবা গ্রাম সর্বত্রই গৃহের বিভিন্ন কাজের জন্য আসবাবপত্র ব্যবহার করা হয়। পরিবারের জীবন্যাত্মাৰ মান, অবস্থানের স্থান অর্থাৎ শহর কিংবা গ্রাম, পারিবারিক জীবন চক্রের স্তর ইত্যাদির ভিন্নতায় আসবাবের চাহিদার ধৰন বদলায়।

গ্রামাঞ্চলের গৃহগুলো যেহেতু স্থায়ী আবাসস্থল এবং পর্যাপ্ত আয়তনবিশিষ্ট হয়ে থাকে তাই বড় আকৃতির ভারী কাঠের আসবাবের ব্যবহার বেশি দেখা যায়। গ্রামাঞ্চলে ব্যবহৃত আসবাবপত্রসমূহের মধ্যে খাট, টেকি, চেয়ার, টেবিল, টুল, বেঞ্চ, মিটসেফ, আলমিরা, আলনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আম, জাম, কঁঠাল, কড়ই ইত্যাদি গাছের কাঠ ব্যবহার করে কাঠমিস্ত্র দিয়ে বাঢ়িতেই এই আসবাবগুলো নিজেদের চাহিদামতো বানিয়ে নেওয়া হয়।

শহরাঞ্চলে অস্থায়ীভাবে বসবাসকারী কর্মজীবী মানুষের সংখ্যাই বেশি। অধিকাংশ লোকই ভাড়াবাড়িতে বসবাস করে। যারা নিজেদের বাড়িতে থাকেন তারাও আয়তনের সীমাবদ্ধতার জন্য নিজেদের চাহিদা মেটানোর উপযোগী হালকা ও যুগোপযোগী আসবাব ব্যবহার করে থাকেন। তা ছাড়া এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করতে যাতে কষ্ট না হয় সেজন্য হালকা ও বুচিশীল আসবাব ব্যবহারের প্রবণতা বেশি দেখা যায়। শহরাঞ্চলে ব্যবহৃত আসবাবপত্রসমূহের মধ্যে খাট, বক্স খাট, নানা সাইজের টেবিল, লুকিং গ্লাসযুক্ত কাঠের আলমিরা, সোফাসেট, গদিওয়ালা চেয়ার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। শহরাঞ্চলে সীমিত আয়তনের নকশাদার, শৌখিন ও আধুনিক মডেলের আসবাব ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায়। এক্ষেত্রে আম, কঁঠাল, কড়ই কাঠের পাশাপাশি সেগুন কাঠ, প্লাই উড, পারটেক্স ইত্যাদি কৃত্রিম কাঠের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। শহরাঞ্চলে রেডিমেড বা তৈরি আসবাব বেশি ব্যবহার করতে দেখা যায়।

বর্তমান গ্রাম ও শহর সর্বত্রই প্লাস্টিকের তৈরি আসবাব যেমন— চেয়ার, টেবিল, খাট, র্যাক ইত্যাদির বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

আসবাব নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়গুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো—

- প্রয়োজনীয়তা— আসবাব ক্রয়ের প্রথমেই বিবেচনা করতে হবে আসবাবটির প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা। প্রয়োজন না থাকলে হুজুরের বশে ক্রয় করলে পরে অপচয়ের সামিল হয়। এ ছাড়া পুরনো আসবাব যদি রং বা বার্নিশ করে ব্যবহার করা যায় তাহলে নতুন আসবাব ক্রয় করে অর্থের অপচয় করা ঠিক নয়।

- **পরিবারের আয়—** পরিবারের আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আসবাব নির্বাচন করতে হবে। আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আসবাব নির্বাচন করলে তা সমাজেও বেশি প্রহণযোগ্যতা পায়। তা না হলে সমাজের চোখেও তা দৃষ্টিকূট মনে হয়।
- **আসবাবের মূল্য—** আসবাবের মূল্য নির্ভর করে উপকরণের উপর। সেগুন, মেহগনি ইত্যাদি কাঠের আসবাবগুলির দাম অনেক। আবার বেত ও প্লাস্টিকের বা রাজের আসবাবের দাম তুলনামূলক কম।
- **আরাম—** আসবাব নির্বাচনে আরাম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আসবাবের আয়তন, উচ্চতা, গভীরতা আরামদায়ক না হলে ব্যবহারে অসুবিধা হয়। যেমন: টেবিলের উচ্চতা যদি বেশি হয় তবে কাজের সমস্যা হয়। আবার চেয়ারে বসে যদি আরাম না পাওয়া যায় তবে কাজ করা কষ্টকর হয়।
- **উগ্রযোগিতা—** আসবাবের উগ্রযোগিতা হচ্ছে তার চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা। ছোট শিশুর ব্যবহারের আসবাব তার বয়স উগ্রযোগী হবে। খাট, চৌকি এগুলো আমাদের শয়ন কাজের চাহিদা মেটায়। আবার টুল, মোড়া, সোফা, চেয়ার এগুলো আমাদের বসার কাজের চাহিদা মেটায়। আবার আসবাব কী উপাদানের দ্বারা তৈরি তার উপরও উগ্রযোগিতা নির্ভর করে। যেমন: কাঠের আসবাবের চেয়ে গদিওয়ালা আসবাবের আরাম বেশি ফলে এর উগ্রযোগিতা বেশি।
- **রুচি ও পছন্দ—** আসবাব নির্বাচনে পরিবারের সদস্যদের রুচি ও পছন্দ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কক্ষের আকার আয়তন, মেঝে ও দেয়ালের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রুচিসম্মত আসবাব দিয়ে গৃহসজ্জা করলে ঘরের সৌন্দর্য অনেক বেড়ে যায়।
- **স্থায়িত্ব—** আসবাবের স্থায়িত্ব নির্ভর করে উপকরণ ও নির্মাণ কাজের উপর। কাঁচা কাঠ দিয়ে আসবাব নির্মাণ করলে সহজেই ঘুণে ধরে নষ্ট হয়ে যায়। আবার পাকা কাঠ, মজবুত নির্মাণ কৌশল আসবাবের স্থায়িত্ব বাড়ায়।
- **জীবনযাত্রার মান—** পদমর্যাদা ও বিস্তের উপর জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে। উচ্চ পদস্থ ও উচ্চ বিস্তের পরিবারের আসবাব বেশ দামি হয়। এইসব পরিবারের ড্রাইং রুম প্রশংস্য হয় ফলে একটি জীবনযাত্রার সাজানো থাকে। আবার নিম্নবিস্তের পরিবারে শয়ন কক্ষের এক পাশেই বসার ব্যবস্থা থাকে।
- **নকশা—** আসবাবের নকশা রুচিসম্মত হতে হবে। এই ক্ষেত্রে বুগেপযোগী, আরামদায়ক ও শিল্পসম্মত নকশাই বেশি প্রহণযোগ্য। আবার নকশাটি এমন হবে যাতে পরিষ্কার করতে বেশি কষ্ট বা সময় না লাগে।
- **বহুবিধ ব্যবহার—** একটি আসবাব বহুবিধভাবে ব্যবহার করা যায়। যেমন: ডিঙ্গান বসা ও শোয়া দুই কাজে ব্যবহৃত হয়। ডাইনিং টেবিল— খাওয়া, পড়াশোনা, আলাপ-আলোচনা করার কাজে ব্যবহার করা যায়। আধুনিক ঘুণে গৃহের আয়তন কম থাকে তাই আসবাবের বহুবিধ ব্যবহারের কথা বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে।



বিভিন্ন ধরনের আসবাবগুলি

- পরিবারের আকার— পরিবারের আকার যদি বড় হয় তবে নমনীয় ও বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী আসবাবের কথা চিন্তা করতে হবে।
- চাকরির প্রকৃতি— বদলির চাকরি হলে আসবাব হালকা এবং কেবল দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটায় এমন আসবাবই নির্বাচন করতে হবে। বেশি আসবাব বদলির সময় বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। আসবাবও সহজে নষ্ট হয়ে যায়।
- আবহাওয়া— আমাদের দেশে গরম ও ধূলাবালি বেশি। তাই হালকা ডিজাইনের আসবাব বেশি উপযোগী এবং যত্ন নেওয়া সহজ।
- যত্ন— আসবাব নির্বাচনের সময় যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের কথা চিন্তা করতে হবে। কারণ যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর আসবাবের স্থায়িত্ব ও সৌন্দর্য নির্ভর করে।
- কক্ষের আয়তন ও আকার— কক্ষের আয়তন ও আকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আসবাব নির্বাচন করলে ঝুঁটির পরিচয় পাওয়া যায়। এতে কক্ষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

কাজ – ভূমি তোমার পরিবারের জন্য আসবাব ক্রয় করার সময় কোন কোন বিষয় বিবেচনা করবে লেখ।

পাঠ ২- আসবাব বিন্যাস

আসবাব নির্বাচনের পরবর্তী কাজ হলো সঠিকভাবে তা বিন্যাস করা। আসবাবপত্র বিন্যাস যে শুধু ঘর সাজানোর উদ্দেশ্যে করা হয়- তা নয়। সঠিকভাবে আসবাব বিন্যাসের মাধ্যমে গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জাকে আকর্ষণীয়, আরামদায়ক ও সুবিধাজনক করে রাখা হয়। এর ফলে পরিবারের সদস্যদের আরাম ও মানসিক তৃপ্তি বাঢ়ে।

গ্রাম কিংবা শহরে সর্বত্রই অভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জায় আসবাব বিন্যাসের ক্ষতিপয় নিয়ম মেনে চলতে হয়। যথা :

প্রয়োজনীয় আসবাব বিন্যাস— আসবাব বিন্যাসের প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন যে কোনো ঘরেই অতিরিক্ত আসবাব রাখতে নেই। বাসগৃহের জন্য আসবাবপত্র বিন্যাসের সময় প্রথমে দেখতে হবে কক্ষটি কী কাজে ব্যবহার হবে। কক্ষের ব্যবহার অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আসবাব রাখতে হবে। যেমন :

শয়ন কক্ষ— খাট, ওয়ারদ্রোব, আলনা, আলমারি ইত্যাদি।

বসার কক্ষ— সোফাসেট, বেতের চেয়ার, টেবিল, সোকেস, বুকসেলফ ইত্যাদি।

খাবার কক্ষ— ডাইনিং টেবিল, সোকেস, ফ্রিজ ইত্যাদি।

পড়ার কক্ষ— বুকসেলফ, টেবিল, চেয়ার, কম্পিউটার ইত্যাদি।

- **ব্যবহারিক সুবিধা**— আসবাবপত্র বিন্যাসের সময় আসবাবের ব্যবহারিক দিকটি বিবেচনা করতে হবে। অর্থাৎ প্রতিটি কক্ষের কাজ অনুযায়ী আসবাব সাজাতে হবে।
- **চলাচলের সুবিধা**— গৃহের মধ্যে চলাচল, কাজ সম্মাদনের সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখে আসবাবপত্র সাজাতে হবে। ঘরের মধ্যে একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলাচলে যেন অসুবিধা না হয় ও কার্য সম্মাদনে যেন অতিরিক্ত চলাচল প্রয়োজন না হয় আসবাব বিন্যাসের সময় সে দিকে লক্ষ রাখতে হয়। যেমন: বুক সেলফটিকে পড়ার টেবিলের পাশেই রাখতে হয়। ঘরে ছোট শিশু থাকলে তাদের ক্রিয়া কলাপের প্রতি খেয়াল রেখে আসবাবপত্র সাজানো শ্রেয়। শিশুরা যাতে ঘরময় স্থাধীন ও নিরাপদে চলাফেরা করতে পারে সে বিষয়ে লক্ষ রাখা প্রয়োজন।

- কাজ অনুযায়ী আসবাব বিন্যাস— আসবাব সজ্জা এমন হতে হবে যেন কাজের এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ যে কক্ষে যে যে কাজ সম্পন্ন হয় তার সাথে সম্পর্কযুক্ত আসবাব স্থাপন করতে হয়।
- আলো-বাতাস চলাচল সুবিধা— আসবাবসমূহ এমনভাবে বিন্যাস করতে হবে যাতে দরজা-জানালা খুলতে এবং বস্তি করতে কোনো অসুবিধা না হয়। এ ছাড়া গৃহের অভ্যন্তরে আলো-বাতাস প্রবেশ করতে না পারলে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশও ব্যাহত হয়।
- দেয়াল ঘেষে বিন্যাস না করা— আসবাব বিন্যাসের সময় মনে রাখতে হবে যে টেবিল, চেয়ার, সোফা ইত্যাদি কখনো দেয়াল ঘেষে রাখতে নেই। দেয়াল হতে একটু সামান্য দূরত্বে স্থাপন করতে হয়। তা না হলে ঘষা লেগে দেয়ালের রং নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং আসবাবপত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে আসবাবপত্র বিন্যাসের মাধ্যমে কক্ষের গঠনগত ভূটি ঢেকে রাখা যায়।
- গৃহসজ্জায় নতুনত্ব আনা— আসবাবপত্র বিন্যাস কখনো স্থায়ীভাবে একই জায়গায় করা উচিত নয়। এতে গৃহসজ্জায় একধর্মীতাবে চলে আসে। মাঝে মাঝে আসবাবপত্রের বিন্যাসে রুটির রাদবদল করলে গৃহসজ্জায় নতুনত্ব আসে।
- শিল্পনীতির প্রয়োগ— আসবাব বিন্যাসের উপর গৃহসজ্জার সৌন্দর্য নির্ভর করে। এই শিল্পরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে গেলে শিল্প সৃষ্টির মূলনীতি যথা— সমানুপাত, সামঞ্জস্য, ভারসাম্য, ছন্দ এবং প্রাধান্য বজায় রাখতে হয়। নিম্নে আসবাব বিন্যাসে শিল্পনীতির প্রয়োগ বর্ণনা করা হলো—

ক. সমানুপাত (Proportion)— আসবাব বিন্যাসে ঘরের আকৃতির সাথে আসবাবপত্রের আকার নির্ধারণ করা দরকার। বড় ঘরে বড় আসবাব ও ছোট ঘরের জন্য ছোট আসবাব মানানসই। আবার যেখানে বড় ও ছোট আসবাবের সমিশ্রণ প্রয়োজন সেখানে বড় আসবাবের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে ছোট দুই-তিনটি আসবাব একত্রে সাজানো যায়। আসবাবপত্রের পরস্পরের আকৃতির অনুপাত ঠিক হলে সমগ্র গৃহসজ্জার আসবাব বিন্যাসে পারস্পরিক মিত্রতা বা মিল হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

খ. ভারসাম্য (Balance)— আসবাবপত্র বিন্যাসে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজন আছে। কক্ষের একদিকের সঙ্গে অন্য দিকের আসবাবপত্রের, মাঝখানের ও কর্নারের আসবাবপত্রের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে হবে। ঘরের একদিকে বেশি অন্য দিকে কম আসবাব সংরক্ষণ করলে ভারসাম্য রক্ষা হয় না। একটি কক্ষের দুই দিকের আসবাবের গুরুত্ব সমান হলে তাকে প্রত্যক্ষ ভারসাম্য বলে অন্যদিকে একপাশের জিনিসে বেশি গুরুত্ব থাকলে অর্থাৎ বেশি সাজানো থাকলে তাকে অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্য বলে। অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্য গৃহসজ্জায় নতুনত্ব ও আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

গ. সামঞ্জস্য (Harmony)— সবার সাথে সবার মিত্রতাকেই সামঞ্জস্য বলে। ঘরে কেবল দামি আসবাব, চিত্রকর্ম, সো-পিস থাকলেই হবে না। সবকিছুর সাথে একটা সামঞ্জস্য থাকতে হবে।

ঘ. ছন্দ (Rhythm)— আসবাব বিন্যাসে ছন্দ বজায় রাখা দরকার, এতে দৃষ্টি কক্ষের একটা আসবাবে আবশ্য না থেকে সহজ ও সাবলীল ভঙ্গিতে অন্য আসবাবে গিয়ে পৌছায়। কক্ষের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে দৃষ্টি উঠানামা করে। দৃষ্টির এই উঠানামাই ছন্দ। ছন্দের গতি আসবাব বিন্যাসে আকর্ষণ সৃষ্টি করে। একঘেয়েমি দূর করে এবং নতুনত্ব আনয়ন করে।

ঙ. প্রাধান্য (Emphasis)- আসবাব বিন্যাসের অন্যতম নীতি হলো প্রাধান্য। প্রাধান্য বলতে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুকে বোঝায়। বসার ঘরে সুদৃশ্য সেন্টার টেবিলে ফুলদানিতে তাজা ফুলের সমারোহ, খাবার ঘরে টেবিলে বিভিন্ন ফলের সমারোহ, শোবার ঘরে সুদৃশ্য আসবাব বা কার্পেট ইত্যাদি দিয়ে ঘর সাজিয়ে প্রাধান্য সৃষ্টি করা যায়।

কাজ : ভূমি তোমার কক্ষে আসবাব বিন্যাসে কী কী বিষয় লক্ষ রাখবে শেখ।

পাঠ ৩ - বিভিন্ন কক্ষে আসবাব বিন্যাস

শয়নকক্ষ (Bed Room)-

সারা দিন কর্মব্যস্ততার পর মানুষ গৃহে ফিরে আসে। গৃহের শান্তিময় পরিবেশ আমাদের আরাম দেয়। তাই শয়নকক্ষে আসবাব বিন্যাসে ধন্বন্তর হতে হবে।

লক্ষণীয় বিষয়-

- শয়নকক্ষে খাট বা চৌকি, ড্রেসিং টেবিল, আলনা, আলমারি, ওয়ারেন্ট্রোব ইত্যাদি আসবাব থাকে। খাট বা চৌকির অবস্থান এমনভাবে হবে যাতে ঢোকে আলো না পরে।
- কক্ষের দেয়ালের রং হালকা হলে ভালো হয়।
- খাটের পাশে বই বা খবরের কাগজ রাখার জন্য ছোট টেবিল রাখা যায়। টেবিল ল্যাঙ্গ থাকলে পড়ার সময় পর্যাপ্ত আলো পাওয়া যায়।
- দেয়াল সজ্জার জন্য চিত্রকর্ম থাকতে পারে। ড্রেসিং টেবিল বা সাইড টেবিলের উপর একগুচ্ছ ফুল ঘরের সৌন্দর্য অনেকথানি বাড়িয়ে দেয়।



শয়নকক্ষ

বসার ঘর (Drawing Room)

বসারকক্ষে পরিচিত লোকজন বা আত্মীয়স্বজন এসে বসে। সামাজিকভা রক্ষার কেন্দ্রস্থল হলো বসার ঘর। এই কক্ষের বিন্যাস বাড়ির লোকদের বৃচ্ছিবোধ বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ করে।

লক্ষণীয় বিষয়-

- বসার ঘরে সোফাসেট, ডিভান, মোড়া, বুকসেলফ, সোকেস থাকে।
- কক্ষকে আকর্ষণীয় কারার জন্য বড় ফুলদানিতে ফুল,



বসার ঘরের বিন্যাস

একুরিয়াম, চিত্রকর্ম, খ্যাতিমান ব্যক্তির ছবি, কাপেট ইত্যাদি রাখা যেতে পারে।

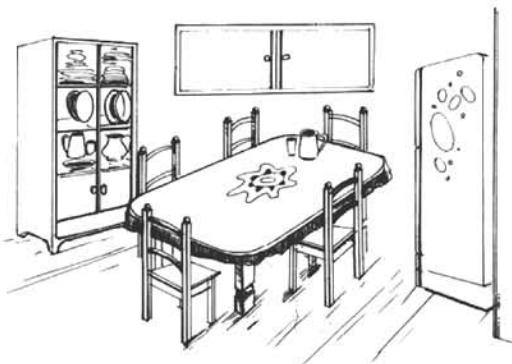
- আলো-বাতাসের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা, চলাচলের সুবিধা, শিল্পনীতি অনুসরণ করে আসবাব বিন্যাস করতে হবে।

খাবার ঘর (Dining Room)

খাবার ঘর পরিবারের সদস্যদের একত্র হওয়ার স্থল।
বাড়ির সবাই একত্রে খেতে বসলে একটা আনন্দধন
পরিবেশের সূক্ষ্ম হয়।

লক্ষণীয় বিষয়—

- খাবার ঘরে খাবার টেবিল, চেয়ার সোকেস, মিটসেক,
ফ্রিজ, ট্রলি ইত্যাদি থাকে। টেবিল গোল,
ডিস্কাউন্টির বা চার কোণাকার হতে পারে।
টেবিলের উপরিভাগ ফর্মিকা, কাচ বা কাঠের হয়।
- খাবার টেবিলে যাতে পর্যাপ্ত আলো পড়ে সে দিকে
লক্ষ রাখতে হবে।
- টেবিলের মাঝখানে সমতল ফুলদানিতে ফুল বা ঝুড়িতে
বিভিন্ন ফলের সমারোহ টেবিলের সৌন্দর্য বাড়িয়ে
দেয়।
- টেবিল এমনভাবে রাখতে হবে যাতে চেয়ারে বসা বা
চলাচলে অসুবিধা না হয়।
- পানির কিন্টার এককোনায় একটু উচুতে রাখতে
হবে। ঘরের বড় দেয়াল দুর্ভে এমনভাবে ফ্রিজ
রাখতে হবে যেন ফ্রিজের পেছনে বাতাস চলাচলের
সুবিধা থাকে।



খাবার ঘর



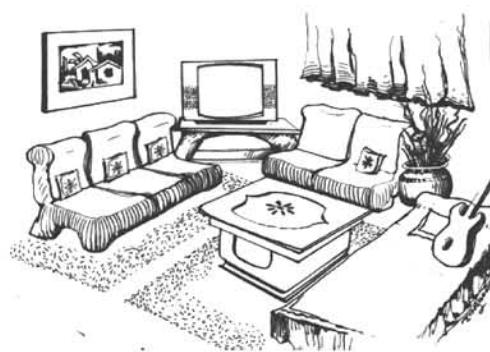
অতিথির ঘর

অতিথির ঘর (Guest Room)

অতিথির ঘর বসার ঘরের পাশে হলে ভালো হয়। এই
কক্ষে খুব বেশি আসবাবপত্রের প্রয়োজন হয় না। থাট,
ড্রেসিং টেবিল, দেয়াল আলমারি হলেই চলে।

লিভিং রুম (Living Room)

বর্তমান আধুনিক বাড়িতে খেলার ঘর ও লিভিং রুম
থাকে। এই রুমে পরিবারের সদস্যরা অবসর সময়
কাটায়। এই রুমে টেলিভিশন দেখা, বসা ও শোয়ার
ব্যবস্থা থাকে। গিটার, হারমেনিয়াম ইত্যাদি বিনোদনের
জিনিসপত্র থাকে।



লিভিং রুম

পড়ার ঘর (Reading Room)

পড়ার ঘর এমন জায়গায় হবে যেখানে কোনো শব্দ বা কথাবার্তা পড়াশোনার ব্যবহার ঘটাতে সা গাঁও। পড়ার ঘরে টেবিল, চেরার, বুকসেল, কম্পিউটার ইত্যাদি থাকে।

টেবিলে থাকে পর্যাপ্ত আলো পড়ে সে দিকে দক্ষ রাখতে হবে।

কানিকলা (Kitchen)

কানিকলা খাবার ঘরের পাশে হয়ে থাকে। এতে খাদ্য পরিবেশন করাতে সুবিধা হয়। কুচার স্বান আনলার পাশে হলে সহজেই হোয়া বের হয়ে যাব। চুলা গ্যাস, কেজোসিন বা মাটির হতে পাও। শহরে এলাকায় গ্যাস, শায়াখলে মাটিক বা কেজোসিনের চুলা দেখা যায়। আবার অনেকেই হিটারেও রান্না করে। রান্নাঘরে পানির কল এক কোণায় রাখলে ভালো হয়। বিডিভি জিনিসের কোঠা মাথার জন্য সেক্ষ ব্যবহার করতে হয়। দা-ইটি, ছুরি ইত্যাদি ধারালো জিনিস শিশুদের নাগাদের বাইরে রাখতে হবে।

কানিকলার ভয়ালে সিলিং পর্যন্ত ক্যাবিনেট করে নিলে অনেক জিনিস রাখা যাব। তবে পোকামাকড় থাকে না অন্যান্য সেমিকে দক্ষ রাখতে হবে।

গাঠ ৪ - গৃহের নামনির্বাচন বৃন্থি

আসবাবপত্র নির্বাচন, বিন্যাসের প্রাই মানুষ চার গৃহের মেঝে, দেবমাল, পর্দা ও শুল বিন্যাসের মাধ্যমে গৃহের সৌন্দর্য বৃন্থি করতে। সব কিছির সামঞ্জস্য বিন্যাসই একটি গৃহকে অস্থাপ করে তোলে। সুরুচির প্রকাশ থাকে।

মেঝের আঙুলদল- আমাদের দেশে ঘরের মেঝে সিমেল্টের বা সিমেল্টের সাথে রং মিশিয়ে মেঝে তৈরি করা হয়। শায়াখলে মাটির মেঝে থাকে। তবে আধুনিক বাড়িতে টাইলস বা মোজাইকেম মেঝে দেখা যায়। শহরাবলম্বন মেঝেতে কাণ্ঠে ব্যবহার করা হয়। কাণ্ঠে আসবাবের সাথে মানানসই হতে হবে। আমাদের দেশে খুলা বেলি তাই ছেটি আকর্ণের কাণ্ঠে ব্যবহার ভালো এতে ব্যক্তি নিতে সহজ হয়।

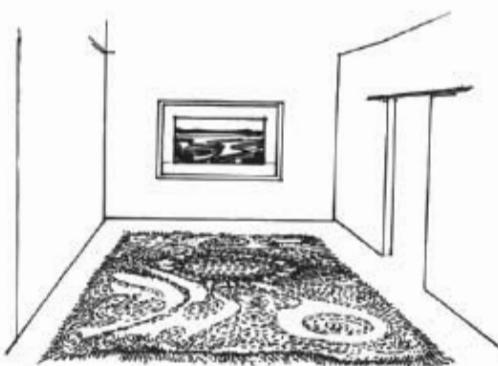
দেয়াল সজ্জা- প্রতিটি গৃহেই বিডিভি কক্ষে ছবি বা চিত্রকর্ম দেখা যায়। গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জায় চিত্রকর্মের



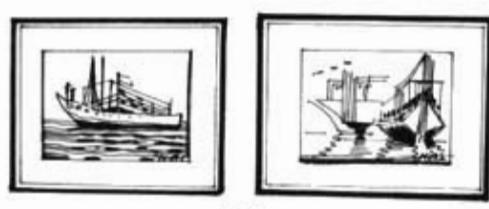
পড়ার ঘর



কানিকলা



মেঝের আঙুলদল



দেয়ালে ছবি বিন্যাস

ভূমিকা অপরিসীম। খ্যাতনামা ব্যক্তির ছবি গৌরবের প্রতীক। মাতৃভূমির ছবি, প্রাকৃতিক দৃশ্য মনে প্রশান্তি আনে।

দেয়ালে ছবি টাঙ্গানোর কিছু নিয়ম আছে। যেমন—

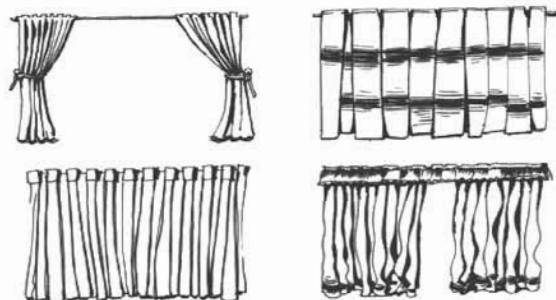
- ছবি টাঙ্গানোর জন্য স্থান নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বড় দেয়ালে বড় ছবি বা ছোট ছোট কয়েকটি ছবি একত্রে টাঙ্গানো যায়।
- ছবি দৃষ্টি বরাবর টানাতে হবে। বেশি উপরে বা নিচে ছবি টানালে সৌন্দর্য ফুটে উঠে না এবং দৃষ্টিনিষ্ঠন হয় না।
- কক্ষের কাজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ছবি টানাতে হবে। বসার কক্ষে খ্যাতনামা ব্যক্তি, প্রাকৃতিক দৃশ্য, খ্যাতনামা ব্যক্তির আঁকা ছবি রাখা যায়। খাবার ঘরে খাবারের ছবি, লিভিং রুমে পারিবারিক ছবি টাঙ্গানো যায়। পারিবারিক ছবি শয়ন ঘরে রাখা রুচিসম্ভব।
- ছবি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের শোপিস, ফুল, লতা-পাতা, ওয়ালমেট, পাটশিল, লোকশিল উপকরণ দিয়েও দেয়াল সজ্জা করা যায়। তবে একেত্রে শিল্পনীতি অনুসরণ করা আবশ্যিক।

পর্দা— পর্দা হচ্ছে দরজা, জানালার আচ্ছাদন। দেয়ালের রং, মেঝের আচ্ছাদন ও অন্যান্য আসবাবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পর্দা নির্বাচন করা উচিত।

পর্দার প্রয়োজনীয়তা—

- ঘরের আবৃ রক্ষা করে।
- ঘরে শীতলতার ভাব আনে।
- খুলাবালি থেকে কক্ষকে রক্ষা করে।
- কক্ষের সৌন্দর্য বাড়ায়।

আমাদের দেশ শ্রীমপুরাণ দেশ তাই হালকা রঁধের পর্দাই আমাদের জন্য উপযুক্ত। এতে করে শীতলতার সূচী হয়। তবে শীতের দিনে গাঢ় রঁধের পর্দা ব্যবহার করা যায়। পর্দার কাগড়টি এমন হতে হবে যাতে যত্ন নেওয়া সহজ হয়।



বিভিন্ন ধরনের পর্দা

পুক্ষবিন্যাস—

পুক্ষবিন্যাস গৃহসজ্জার অন্যতম প্রধান অংশ। ফুল সাজানোর জন্য প্রয়োজন নানা ধরনের ফুলদানি বা পাত্র। এই পাত্রগুলো চীনামাটি, প্রাস্টিক, কাচ, বাঁশ, বিভিন্ন ধাতুর তৈরি হতে পারে। ফুলদানি বা পাত্র গোলাকার, চ্যাপ্টা, ডিম্বাকৃতি বা চারকোনা হতে পারে।



পুক্ষ বিন্যাস

পুষ্পবিন্যাসের নিয়ম-

- রং— পুষ্পবিন্যাসের সময় খেয়াল রাখতে হবে ফুলের রংটি যেন সবাইকে আকর্ষণ করে।
- রেখা— ফুলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তার রেখা বা গড়ন। লিলি, রজনীগন্ধা ফুলের লম্বা ডাটা থাকে। আবার গাঁদা, বেলি, গোলাপ এগুলো স্তুপাকারে সাজানোর উপযোগী।
- শিল্পনীতি— পুষ্পবিন্যাসে শিল্পনীতি অনুসরণ করলে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। যেমন— ফুলদানির সাথে ফুলের সামঞ্জস্য থাকা বাধ্যনীয়।
- পুষ্পবিন্যাসের সময় ফুলের স্বাভাবিক ছবি বজায় রাখতে হয়। অর্থাৎ গাছে যেভাবে ফুল ফুটে থাকে সেভাবে ফুলকে সাজালে ভালো হয়।
- সবচেয়ে আকর্ষণীয় ফুলটিকে প্রাধান্য দিয়ে পুষ্পবিন্যাস করতে হয়। তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অন্যান্য ফুল, পাতা সাজাতে হবে।
- ফুলদানির চেয়ে ফুলের প্রাধান্য বেশি হবে। ফুলদানির আকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পুষ্পবিন্যাস করতে হয়।
- ফুলদানিতে যথেষ্ট পানি থাকতে হবে।
- পিন হোল্ডার ঢেকে পুষ্পবিন্যাস করতে হবে।
- পুষ্পবিন্যাসের জন্য অনেক ফুলের প্রয়োজন হয় না। দুই একটা ফুলের সাথে ডাল, লতা, পাতা দিয়েও পুষ্প বিন্যাস করা যায়। পিন হোল্ডার ব্যবহার করে বাটি, প্লেটেও পুষ্পবিন্যাস করা যায়।
- খুব ভোরে বা পড়স্ত বেলায় গাছ থেকে ডালসহ ফুল কাটলে সেটা তাজা থাকে।
- পাত্রের পানির মধ্যে চিনি মেশালে ফুল অনেক বেশি সময় ধরে তাজা থাকে।

পাঠ ৫ – গৃহে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংরক্ষণ

গৃহকে আসবাবপত্র দিয়ে সুসজ্জিত করলেই চলবে না গৃহের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষার কথাও চিন্তা করতে হবে। নিজ গৃহকে সুসজ্জিত করে রাখলে সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে কেবল দামি, চমৎকার আসবাব দিয়ে ঘর সাজালেই চলবে না, তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে। ময়লা, ধূলা পড়া আসবাব ঘরের সৌন্দর্য নষ্ট করে। যদ্দের অভাবে আসবাবের স্থায়িত্ব হ্রাস পায়, মাকড়সার জাল, পিপড়া, গোকার উপদ্রব হয় এবং রোগ-জীবাণু ছড়ায়।

তাই গৃহের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষার জন্য প্রয়োজন—

- গৃহে প্রাকৃতিক আলো-বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা :

আলো, উত্তাপ এবং জীবাণুনাশক শক্তির অফুরন্ট উৎস হলো সূর্য। সূর্যের আলো অন্ধকার দূর করে। উত্তাপ রোগ-জীবাণু ধ্বনি করে। আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা করে। তাই ঘরের মধ্যে যাতে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে সেই দিকে লক্ষ রেখে আসবাব বিন্যাস করতে হবে।

বায়ুর অঙ্গিজেন আমাদের দেহ কোষকে বাঁচিয়ে রাখে। স্বাস্থ্যের উপর বায়ুর প্রভাব খুব বেশি। তবে গৃহে যাতে সূর্য কিরণ এবং বায়ু প্রবেশ সহজেই করতে পারে সেজন্য গৃহের অবস্থান দক্ষিণ অথবা পূর্বমুখী হলে ভালো হয়।

- গৃহের মেঝে ও আসবাব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা :

প্রতিদিন গৃহের মেঝে ও আসবাব পরিষ্কার করা আবশ্যিক। গৃহের মধ্যে চলাফেরার ফলে মেঝে ময়লা হয় আসবাবের উপর ধুলাবালি জমে। এই ধুলা থেকে সর্দি, কাশি হয়। তাই প্রতিদিন ঘরের মেঝে, রান্নাঘর, গোসলখানার মেঝে ও আসবাবপত্র ধোয়া, মোছা করা আবশ্যিক। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য এক দিন জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। দরজা, জানালা, রান্নাঘরের দেয়াল, বেসিন, টয়লেটের প্যান/কমোড ইত্যাদি প্রতি সম্ভাব্য পরিষ্কার করা উচিত।

- পর্দা, বিছানার চাদর, টেবিল ক্লথ, বিভিন্ন আসবাবের কভার পরিষ্কার করা :

ঘরের পর্দা, চাদরে ও কভারে ধুলা জন্মায়। প্রতি সম্ভাব্য বিছানার ছাদর পরিষ্কার করা উচিত। ৩/৪ মাস পর ঘরের পর্দা ও আসবাবের কভার পরিষ্কার করা উচিত। এতে ঘরের ধুলাবালি দূর হয়ে ঘরের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়।

- রাতে কাজ অনুযায়ী পর্যাপ্ত কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা করা :

কাজ অনুযায়ী পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা না থাকলে চোখের ক্ষতি হয়। তাই পড়াশোনা, রান্নাঘরের কাজ, খাবার টেবিল ইত্যাদি জায়গায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকা আবশ্যিক।

- গৃহের ভিতর ও চারপাশের পরিবেশ পরিষ্কার রাখা :

ঘরের ময়লা ফেলার জন্য ঘরের ভিতর বিন রাখা প্রয়োজন। সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য গৃহের চারপাশের পরিবেশ-পরিষ্কার রাখাও আবশ্যিক। ঘরের চারপাশে ময়লা, আবর্জনা, খোলা নর্দমা, ঝোপ-ঝাড় থাকলে পোকামাকড় ও মশার উপদ্রব হয়। মারাত্মক রোগ ছড়ায়। তাই ঘরের চারপাশ পরিষ্কার রাখতে হবে। ময়লা, আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থান বা ডার্টবিনে ফেলতে হবে। গৃহের চারপাশের ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে পোকামাকড় ধরণ করার ঔষধ স্পে করতে হবে। টবে বা চারপাশে পানি জমে যেন মশার উপদ্রব না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

পাঠ ৬ – অভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জায় অব্যবহৃত জিনিসের ব্যবহার

মানুষ সৌন্দর্যের পূজারি। তাই গৃহের আরাম ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য আসবাবপত্রের পাশাপাশি গৃহসজ্জায় নানা উপকরণ ব্যবহার করা যায়। তবে গৃহসজ্জায় শুধু যে বাজার থেকে মূল্যবান জিনিসই ব্যবহার করতে হয় তা নয়। বরং নিজস্ব সৃজনশীলতার মাধ্যমে গৃহের অব্যবহৃত জিনিস দিয়েও নানা ধরনের শিল্প সামগ্ৰী বানিয়ে ব্যবহার করা যায়। শিল্প সৃষ্টি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এই শিল্প সৃষ্টি করতে যেয়ে সব সময় দামি জিনিসের প্রয়োজন হয় না। হাতের কাছে যা পাওয়া যায় বা ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়েও শিল্প সৃষ্টি করে নিজের সৃজনশীলতা তুলে ধরা যায়।

গৃহে বিভিন্ন অব্যবহৃত জিনিসের নাম :

পানি বা কোণ্ডড্রিঙ্কস এর বোতল, ক্যান, টিসুবক্স, পুরোনো ক্যাণেভার, পুরনো কাপড়, ডিমের খোসা, বিস্কুট, চকলেট বা চিপসের শক্ত কাগজের বক্স, কালি শেষ হয়ে যাওয়া বলপেন, ছেট হয়ে যাওয়া পেনসিল ইত্যাদি।

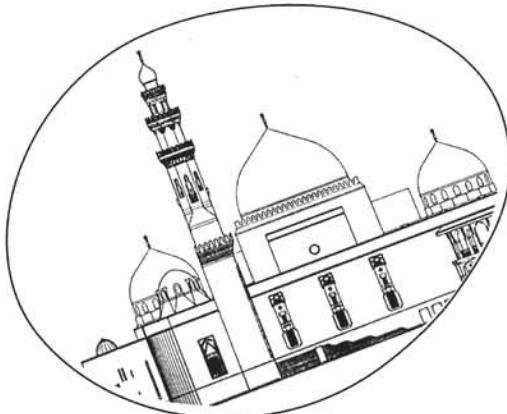
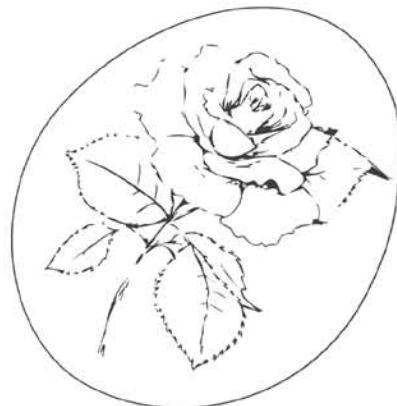
এখন আমরা অব্যবহৃত জিনিসের ব্যবহারের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব :

ডিমের খোসা—

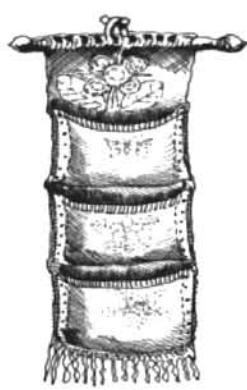
প্রতিদিন আমাদের খাদ্য তালিকায় ডিম থাকে। ডিমের খোসা আমরা ফেলে দিই। কিন্তু এই ফেলে দেওয়া খোসা দিয়েও আমরা শিল্প সৃষ্টি করতে পারি। যেমন :

ডিমটিকে একদিকে ছোট করে ছিদ্র করে ভেতরের অংশ বের করে নিয়ে আসতে হবে। তারপর ঝোলে ভেতরটা শুকাতে হবে। তারপর ডিমের খোসার গায়ে রং দিয়ে চমৎকার বিভিন্ন চিত্র অঙ্কন করে গৃহসজ্জায় ব্যবহার করা যায়।

আবার ডিমের খোসা ছোট ছোট টুকরা করে টুকরাগুলোকে আর্ট পেপারের উপর আঠা দিয়ে আটকিয়ে শুকিয়ে গেলে তার উপর রং দিয়ে একে বিভিন্ন দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা যায়।



ডিমের খোসা ব্যবহার করে তৈরি করা গৃহসজ্জা সামগ্রী



ওয়াল পকেটের নমুনা

চটের তৈরি ওয়াল পকেট

ব্যবহৃত উপকরণ— চট, বর্জারের জন্য রাষ্ট্রিন কাপড়, সেগাই করার জন্য সুই-সূতা। চট দিয়ে ওয়াল পকেট বানিয়ে হুকে ঝুলানোর ব্যবস্থা করে একদিকে গৃহসজ্জার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়, আবার প্রয়োজনীয় জিনিস হাতের কাছে রাখারও ব্যবস্থা করা যায়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সবার সাথে সবার মিত্রতার নাম –

- | | |
|--------------|--------------|
| ক) সমানুপাত | খ) ছন্দ |
| গ) সামঞ্জস্য | ঘ) প্রাধান্য |

২। গৃহের চারপাশের পরিবেশ পরিষ্কার রাখা দরকার কেন ?

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ক) আলো-বাতাসের জন্য | খ) পোকামাকড়ের জন্য |
| গ) ঝোপ-ঝাড় পরিষ্কারের জন্য | ঘ) সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য। |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

শেফালী ঘর গোছাতে গিয়ে ঘরে পড়ে থাকা অনেক অব্যবহৃত জিনিস ফেলে দেয়। মা তাকে এই অব্যবহৃত জিনিসগুলো নানাভাবে ব্যবহার করার পরামর্শ দেন।

৩। শেফালী ঘরে পড়ে থাকা জিনিসগুলো কীভাবে নতুনত্ব আনতে পারে ?

- | |
|----------------------------------------------------------------|
| ক) অব্যবহৃত জিনিসগুলো জমিয়ে বাজারে বিক্রি করে নতুন জিনিস কেনা |
| খ) নিজে ব্যবহার না করে জিনিসের বিনিময়ে বস্তুকে দিয়ে দেওয়া |
| গ) ব্যবহার না করা জিনিসে চিত্রকর্ম করে তার রূপ পাল্টিয়ে ফেলা |
| ঘ) ব্যবহার না করা জিনিসগুলো দিয়ে আবার ঘর সাজিয়ে ফেলা। |

৪। ফেলে দেওয়া জিনিস ব্যবহারের মাধ্যমে শেফালীর –

i. ঘরের পুরনো ও নতুন জিনিসের সামঞ্জস্য হবে।

- ii. নতুন শিল্প সৃষ্টি করার সুযোগ হবে
- iii. সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটবে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) ii ও iii |
| গ) i ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

- ১। কালাম সাহেবের নতুন আসবাব কেনার শখ। তিনি পুরনো আসবাব ব্যবহার করতে চান না। অন্যের কাছ থেকে অর্থ ধার করে তিনি নানা রকম আসবাব ক্রয় করেন। আসবাবপত্র ঘরে সাজাতে গিয়ে তিনি নানা ধরনের অসুবিধায় পড়েন। এতে পরিবারের সদস্যরা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।
- ক. আসবাবপত্র বিন্যাসের উপর গৃহসজ্জার কী নির্ভর করে?
 - খ. গৃহে অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা কেন প্রয়োজন?
 - গ. আসবাব নির্বাচনে কালাম সাহেবের কোন বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার—ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. কালাম সাহেবের আসবাব ক্রয় করাটি কি যুক্তিযুক্ত ছিল? স্বপক্ষে যুক্তি দাও।
- ২। জরিফা বেগম সারা দিন কাজের পর গৃহে ফিরে আসেন। তিনি তার শোয়ার ঘরে ঢুকে সব সময় ক্লান্ত বোধ করেন। খাট, ড্রেসিং টেবিল, আলমারি ইত্যাদি সবকিছুর অবস্থান এমনভাবে রয়েছে যে, ঘরটি কোনোভাবেই তাকে আকর্ষণ করে না। তার বেন বেড়াতে এসে বসার ঘরে ঢেকে এবং কিছু সময় পর শোবার ঘরে এসে তাকে আসবাব বিন্যাসের শিল্পনীতি সম্পর্কে ধারণা দেন।
- ক. গৃহসজ্জার অন্যতম প্রধান অংশ কী?
 - খ. আসবাব বিন্যাসে প্রাধান্য কেন গুরুত্বপূর্ণ?
 - গ. মিসেস জরিফা তার শয়নকক্ষের আসবাব কীভাবে বিন্যাস করতে পারেন— ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. সঠিক শিল্পনীতি অনুসরণের মাধ্যমে জরিফা বেগমের বাসস্থান আকর্ষণীয় হতে পারে— বিশ্লেষণ কর।

খ বিভাগ

শিশুর বিকাশ ও পারিবারিক সম্পর্ক



এই বিভাগ অধ্যয়ন করে আমরা—

- শিশুর বর্ধন ও বিকাশের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব;
- বিকাশের স্তর বা ধাপগুলো চিহ্নিত করতে পারব;
- বিভিন্ন স্তরের বিকাশমূলক কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারব;
- শিশুর বিকাশে বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- শিশুর বিকাশে পারিবারিক বৃক্ষনের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- বিভিন্ন ধরনের পারিবারিক বিপর্যয়ের ধারণা ও স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- শিশু পরিচালনার নীতি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- কিশোর বয়সের বিভিন্ন মনোসামাজিক সমস্যাগুলো বর্ণনা করতে পারব;
- প্রতিবন্ধিতার কারণ শনাক্তকরণ ও প্রতিরোধের উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারব।

ষষ্ঠি অধ্যায়

শিশুর বর্ধন ও বিকাশ

পাঠ ১ – বর্ধন ও বিকাশের ধারণা

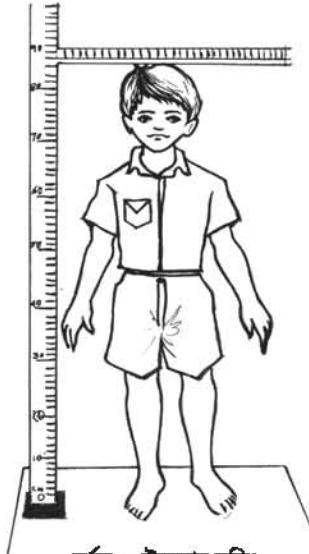
রামিনের বয়স দুই বছর। সে তার খেলনা গাড়ি নিয়ে খেলে। কিন্তু কয়েক মাস আগে সে যেভাবে খেলত, এখন তার খেলা আরও বেশি বাস্তবধর্মী। সে এখন গাড়ি চালানোর সময় শব্দ করে বু বু। গাড়িটি যখন ধাক্কা ধায় কিংবা পড়ে যায় তখন সে অন্য রকম শব্দ করে। অর্থাৎ গাড়ি সম্পর্কে সে নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে খেলছে। পূর্বে রামিন বা-বা, দা-দা এভাবে শুধুমাত্র আওয়াজ করত, এখন সে কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করে কথা বলে, শুধু তা-ই নয়, রামিন এখন ইটতে পারে, দোড়াতে পারে, কোনো কিছু বেয়ে উঠতে পারে যা কয়েক মাস আগেও তার পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। রামিনের মতো বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রতিটি শিশু ধীরে ধীরে কিছু ক্ষমতা অর্জন করে, যা তার আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। এসবই শিশুর বিকাশ। বিকাশ হলো গুণগত পরিবর্তন, যা ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। জীবনের শুরু থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিকাশ ক্ষেত্রে থাকে না।

আমরা বিকাশ (Development) কথাটির পাশাপাশি বর্ধন (Growth) কথাটি ব্যবহার করি। বর্ধন হলো পরিমাণগত পরিবর্তন। যখন দেহের কোনো একটি অংশের বা সমগ্র দেহের বৃদ্ধি ঘটে যার ফলে আকার আকৃতির পরিবর্তন হয় সেটাই বর্ধন। শিশুর উচ্চতা বৃদ্ধি, শুভজনের বৃদ্ধি এর সহজ উদাহরণ। বর্ধন ও বিকাশ—এর অর্থ এক নয়। শিশু যখন জন্ম গ্রহণ করে তখন তার শুভজন থাকে প্রায় ও কেজি। হয় মাসে তার শুভজন দিগুণ হয়, এক বছরে হয় তিনগুণ। শিশুর শুভজন বৃদ্ধি হলো পরিমাণগত পরিবর্তন বা বর্ধন। নবজাতকের শুভজন বাড়ার সাথে সাথে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিছু ক্ষমতা অর্জন করে। জন্মের পর প্রথমে শিশু নিজের হাত-পা নিয়ে খেলে, পাঁচ বছরে সেই হাত দিয়ে সে ছবি আঁকে, দশ বছরে দক্ষতার সাথে হাত দিয়ে ক্রিকেট খেলার বল ছুড়তে পারে। শিশুর হাত শুধু দৈর্ঘ্যেই বাড়ে নি, তার গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তনই হলো বিকাশ। বর্ধনের তুলনায় বিকাশ অনেক ব্যাপক। বর্ধন হচ্ছে বিকাশের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়।

বিকাশ একটি জটিল প্রক্রিয়া। পরিপন্থতা ও অভিজ্ঞতার ফলে বিকাশজনিত পরিবর্তন হতে থাকে। বিকাশে বৃদ্ধি ও ক্ষয় – এ দু'টোই ক্রিয়াশীল থাকে। জীবনের শুরুতে ক্ষয়ের চেয়ে বৃদ্ধি এবং জীবনের শেষ দিকে বৃদ্ধির চেয়ে ক্ষয় বেশি হতে থাকে। বৃদ্ধি বয়সে শারীরিক, মানসিক দক্ষতার ক্ষয় হলেও চূল ও নখের বৃদ্ধি হতেই থাকে।

বর্ধন ও বিকাশের বৈশিষ্ট্য :

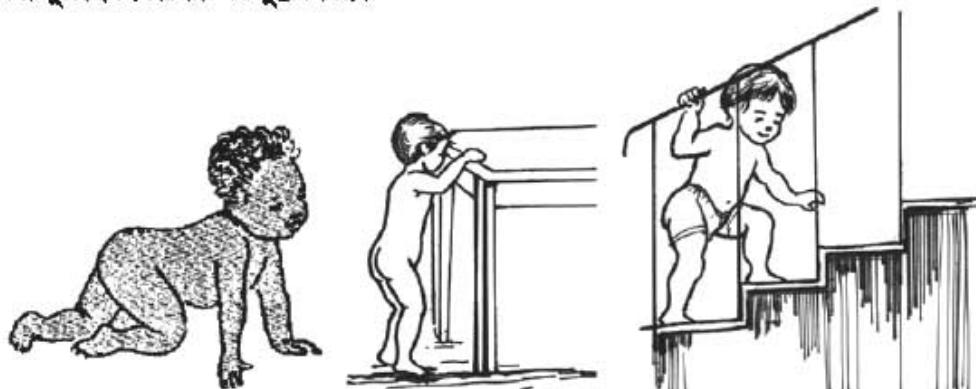
- বর্ধন বলতে দৈহিক আকার-আয়তনের পরিবর্তনকে বোঝায়। বিকাশ বলতে বোঝায়– দৈহিক আকার-আয়তনসহ পরিবর্তন এবং আচরণ, দক্ষতা ও কার্যক্ষমতার পরিবর্তন।
- বর্ধন হলো পরিমাণগত পরিবর্তন। অপর দিকে বিকাশ হলো গুণগত পরিবর্তন। তবে পরিমাণগত পরিবর্তনের সাথে এটি সম্পর্কযুক্ত। পরিমাণগত পরিবর্তনের ফলে যে কার্যকারিতা পাওয়া যায় তাই বিকাশ।



বর্ধন – উচ্চতার বৃদ্ধি

- নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মানবজীবন বর্ধনশীল। সাধারণত ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত মানবদেহে বর্ধন চলে। অপ্রাদিকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিকাশ চলমান। এর কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। বিকাশের গতি জীবনের পূর্বতে উর্ধবমুখী, যথ্য বয়সে মূল্যবান এবং বৃদ্ধ বয়সে নিম্নমুখী। যেমন— কৈশোরে বোঝার ক্ষমতা, যুক্তিপূর্ণ চিন্তার ক্ষমতা বাঢ়ে।

কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে চিন্তাপূর্ণ, অর্থগুরুত্ব ক্ষমতা থাকে। শোনা, দেখা ও বোঝার ক্ষমতা হ্রাস পাই। অর্থাৎ বৃদ্ধি এবং ক্ষমতা দুটোই বিকাশের অভ্যর্থনা বিষয়।



বিকাশ— বয়স বাড়ার সাথে সাথে একই ইচ্ছার পরা

বিকাশের ক্ষেত্রগুলো হলো—

শারীরিক বিকাশ— বিভিন্ন অঙ্গ—প্রত্যঙ্গের আকার ও আকৃতির পরিবর্তন, ঘজনের বৃদ্ধি, উচ্চতার বৃদ্ধি, বুক কাঁধ চওড়া হওয়া ইত্যাদি।

বৃদ্ধিমূলক বিকাশ— কোনো কিছুর অতি মনোযোগ দেওয়া, বুর্বতে চেষ্টা করা, মনে রাখা, যুক্তি দিয়ে চিন্তাকরা, সৃজনী শক্তি, সমস্যার সমাধান করতে পারা ইত্যাদি।

সংকলনমূলক বিকাশ— জন্মের পর হাত—পা নাড়াতে পারা, বসতে পারা, ইটাতে, দৌড়াতে, ধরতে পারা, শাবি শারা, তাঁরসাম্য রাখতে পারা ইত্যাদি।

আবেগীয় বিকাশ— খুশি হলে হাসা, ব্যথা পেলে ঝামা, বিকট শব্দে ভয় পাওয়া, কিন্তু চেয়ে না পেলে রেগে ঘাওয়া ইত্যাদি।

শিশুর আবেগের প্রকাশ— এভাবে ভালো লাগা, খারাপ লাগা, আবেগ সঠিকভাবে প্রকাশ করা এবং প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অর্জন এ সব গুলোই আবেগীয় বিকাশ।



আবেগীয় বিকাশ— খুশি হলে হাসা

সামাজিক বিকাশ- অন্যের পর থেকে বহুস অনুযায়ী মা-বাবা, সাইবোনসহ অন্যদের সাথে মিলতে পারার ক্ষমতা এবং ধীরে ধীরে পরিবার ও সমাজের রাতিনীতি নিয়ম অনুযায়ী খাপ খাইয়ে চলতে পারার ক্ষমতার বিকাশ। যেমন- অন্যকে সাহায্য করা, দয়া প্রদর্শন, সৌজন্যবোধ, সহযোগিতা, বন্ধুত্ব ইত্যাদি।

নৈতিক বিকাশ- সামাজিক ও ধর্মীয় রাতিনীতির উপর ভিত্তি করে তালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বোধ গড়ে উঠা, অন্যান্যের জন্য অনুশোচনা করা, ন্যায় কাজের জন্য ভূক্তি পাওয়াই নৈতিক বিকাশ। মিথ্যা বলা, প্রতারণা করা, অন্যের ক্ষতি করা ইত্যাদি নৈতিকতাবিরোধী কাজ।

শিশুর বিস্তৃত ক্ষেত্রের বিকাশ একে অন্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। শিশু বর্খন বসতে শেখে, হামাগুড়ি দিয়ে চলতে শেখে, ইটতে শেখে, তখন সে তার চারপাশের জগতের সাথে পরিচিত হয়। এতে তার বৃদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ ঘটে। আবার শিশুটি বর্খন নতুন কিছু শেখে তখন বড় সদস্যরা তাকে নানাভাবে উৎসাহিত করে, আনন্দ দেয়। এ কাঙ্গুলোর মধ্যে দিয়ে শিশুর সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশ ঘটে। সুতরাং বলা যায় সকল প্রকার বিকাশের সমন্বয়ে মানব শিশুর পূর্ণবিকাশ ঘটে।



সর্বশস্ত্রমূলক বিকাশ- বসতে পারা, ইটতে পারা



সামাজিক বিকাশ- বন্ধুত্ব

কাজ - বর্ধন ও বিকাশের পার্থক্য চার্ট করে দেখাও।

পাঠ ২ - বিকাশের স্তর

আমরা সবাই জানি, জীবনের সূচনা হয় মাতৃগত থেকে। ২৮০ দিন বা ৪০ সপ্তাহ বা নয় মাস গতে থাকার পর শিশুর জন্ম হয়। অন্যের পর লৈশেব, কৈশোর, প্রাপ্ত বয়স পার হয়ে একজন ব্যক্তি বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়। মানুষের জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ে একই রকম বৈশিষ্ট্য থাকে না। একটি দুই বছতের শিশু এবং একটি দশ বছরের শিশুর বৈশিষ্ট্যের অনেক পার্থক্য থাকে। আবার কৈশোর ও প্রাপ্ত বয়সের বিকাশ কখনেই একরকম নয়। জীবন প্রসারের সম্মূর্ণ সময়কে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলোই বিকাশের স্তর নামে পরিচিত। এই স্তরগুলো হলো –

জন্মগূর্ব কাল (Prenatal Period) - জীবনের সূচনা থেকে জন্মগূর্ব পর্যন্ত সময়কাল। সবচেয়ে দূর্ত পরিবর্তনের সময়কাল হলো মাতৃগতের এই সময়কাল। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে একটি এককোষী জীব একটি পূর্ণাঙ্গ মানব শিশুতে পরিণত হয়। জন্মগূর্বের পর মাতৃগতের বাইরের পরিবেশের সাথে খাপখাওয়ানোর জন্য ত্রুটি শিশুর মধ্যে বিশাল পরিবর্তন ঘটে।



নবজাতকাল (Neonatal Period) - জন্ম মুহূর্ত থেকে দুই সপ্তাহ সময়কাল নবজাতকাল। এ সময়ে নবজাতককে নতুন পরিবেশের সাথে খাপধাওয়াতে হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস, খাদ্য গ্রহণ ও শরীরের বর্জ্য নিষ্কাশনে তার প্রশংসন্ধি সক্রিয় হয়। মাতৃগর্ভের গরম পরিবেশ (100° ফারেনহাইট) থেকে কম তাপমাত্রার পরিবেশের সাথে তাকে সঙ্গতি বিধান করতে হয়। সুস্থ নবজাতক জন্মের সময় চিকিৎসা করে কাঁদে। তারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ২০ ঘণ্টাই শুমিয়ে কাটায়। তার যেকোনো অসুবিধা প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম হলো কান্না।



আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে নবজাতকের স্বাভাবিক উজ্জ্বল আড়াই কেজি থেকে তিন কেজি।

অতি শৈশব ও টডলারহুড (Babyhood & Toddlerhood) - দুই সপ্তাহ থেকে ২ বছর পর্যন্ত সময়কাল। কিছুদিন পূর্বেও যে শিশুটি বড় অসহায় ছিল সে এখন-বসতে পারে, ইঠতে পারে, কথা বলতে পারে। এই বয়সের মধ্যে তার অন্যের সাথে অন্তরজ্ঞতা তৈরি হয়। ১ম বৎসর অতি শিশু, ২য় বৎসর হলো টডলার। শিশুর দুই বছর বয়সের মধ্যে আননিকভাবে প্রথম পদক্ষেপ শুরু হয়, যা তাদের স্বাধীনভাবে চলতে সহায়তা করে।



প্রারম্ভিক শৈশব (Early childhood) - ২ থেকে ৬ বছর। এ সময়ে শিশু নম্বা ও ক্ষীণকায় হয়। ইটা, দৌড়ানো, আঝোহণ করা, ধরা ইত্যাদিতে আরও বেশি দক্ষতা অর্জন করে। তারা অনেক বেশি নিজের কাজগুলো করতে পারে। যেমন-নিজে খাওয়া, নিজে নিজে পোশাক পরা, পরিষ্কার-পরিষ্কন্ত হওয়া ইত্যাদি। তারা পরিবারের সদস্যদের অনুকরণ করে থেকে। তারা সমবয়সীদের সাথে সমর্পক তৈরি করতে শুরু করে। এ বয়সে তারা কৌতুহলী হয় ও অনেক প্রশ্ন করে।



মধ্য শৈশব (Middle Childhood) - ৬ থেকে ১১ বছর। এই বয়সে ছেলেমেয়েরা তাদের পরিবেশ সম্পর্কে অনেক কিছু জানে এবং নতুন নতুন দায়িত্ব পালনে দক্ষ হয়। খেলাখুলায় দক্ষ হয়, নিয়ম সম্মত খেলায় (যেমন-গোলাছুট, বৌচি, ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি) অংশ নেয়। তারা যুক্তিপূর্ণ চিন্তা, ভাষার দক্ষতা অর্জন করে এবং ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে তাদের ধারণা আরও স্পষ্ট হয়। তারা বন্ধুত্ব তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখে।



বয়ঃসন্ধি বা কৈশোরকাল (Adolescence) - ১১ থেকে ১৮ বছর - এই সময়টি শিশু থেকে প্রাপ্ত বয়সে যাওয়ার সময়কাল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে ১০-১৯ বছর বয়স এই সময়টা হলো কৈশোর কাল। বয়ঃসন্ধিক্ষণে প্রাপ্ত বয়সক্রম মতো দেহের আকার আকৃতি ও যৌন বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয়। যৌন ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশে তারা প্রজনন ক্ষমতা অর্জন করে। বিমূর্ত বিষয় চিন্তা করতে পারে অর্ধাং যে বিষয় চোখে দেখা যায় না যেমন- সততা, মেহ, ভালোবাসা ইত্যাদি বিষয়গুলো বুঝতে পারে। কে কোন পেশায় যাবে সে অনুযায়ী পঢ়াশোনা করে।



তার মধ্যে নিজস্ব লক্ষ্য, মূল্যবোধ- তৈরি হয়। তারা বিশ্বাসীক শিখনের প্রতি আকর্ষণ অনুভূত করতে আরম্ভ করে। এ বয়সে নিজ চেহারার প্রতি তাদের মনোযোগ বাঢ়ে।

প্রারম্ভিক বয়ঃঘাস্তিকাল (Early Adulthood) - ১৮ থেকে ২৫ বছর। পেশা ও সঙ্গী নির্বাচনের প্রস্তুতি- এ সময়ের অন্যতম কাজ। এ বয়সে বিয়ে ও পরিবার গঠনের আগ্রহ তৈরি হয়। তাদের পেশা সম্পর্কে বিষয় সিদ্ধান্তে আসে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণি উচ্চরণের পর বাস্তবযুক্তি পেশা নির্বাচনের পথ বিষয় হয়। খেলাধুলায় অংশগ্রহণের চেয়ে এই বয়সে দর্শকের কৃতিকা পালনে তারা আগ্রহী হয়। তারা সন্তোষ, ঝোঁকনীতি, বিশ্ব পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে বক্ষ্যদের সাথে চিন্তার আদান-প্রদান করে।



বয়ঃঘাস্তির শেষভাগ (Late Adulthood) - ২৫ থেকে ৪০ বছর। বয়ঃঘাস্তির সবচেয়ে পুরুষপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো যা-বাৰা হিসেবে পরিবারের দায়িত্ব প্রাপ্তি। এ সময়ে বিদের পর দুইটি তিনি পরিবেশ থেকে আসা সুজনের মধ্যে খাপ খাওয়ানো শিখতে হয়। সন্তান শালম-শালন একটি সত্ত্বন কাজ, যা তাদের অবশ্যই শালন করতে হয়। স্বামী স্ত্রীর সুস্থির সময়োত্তাম পৃথক পরিচালনায় সকলভা আসে। চাকরি, বিয়ে, সন্তান স্বাক্ষিক নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, তারা এসবের বাইরে অন্য কোনো বিষয়ে মনোযোগী হওয়ার অবকাশ পাই না।



মধ্যবয়স (Middle Age) - ৪০ থেকে ৬৫ বছর। কাজ থেকে অবসর গ্রহণের সময় পর্যন্ত এই বয়সের ব্যাপ্তি। এটা প্রাপ্ত বয়স থেকে বার্ষিকে অবজীর্ণ হওয়ার মধ্যবর্তী সময়। কর্মক্ষেত্রে সফলতা বা নেতৃত্বদান এ বয়সেই হয়ে থাকে। মধ্য বয়সে প্রধান শারীরিক লক্ষণগুলো হলো-তজন বৃদ্ধি, তুল পাকা, বুঁচকানো দৃঢ়, হাত পায়ের জোড়ায় ব্যথা, সূর্য পর্যবেক্ষণ সমস্যা ইত্যাদি।



বার্ষিক্য (Old Age) - ৬৫ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এটি মানব বিকাশের সর্বশেষ স্তর। বার্ষিক্য কয়েক সূচনা করে। এই সময়ে শারীরিক, মানসিক অবস্থার ধারাবাহিক অবস্থাক দেখা যায়। তাদের কাজ করার প্রক্রিয়াস পার। বৃদ্ধয়া তাদের নিজেদেরকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে। তারা খুব কম গঠনযুক্ত কাজ করতে পারে। তাদের ধর্মীয় আগ্রহ বাঢ়ে। বার্ষিক্যে হতাশা, জীবন সম্পর্কে বিরক্তি, মৃত্যু ক্ষয় মোকাবিলা করা যাব ক্ষেত্রে এ সম্বন্ধিতে পরিচ্ছিক্রম অনুভূতি আসে।



গঠি ৩ - বিকাশমূলক কার্যক্রম

আমরা জানি, বিকাশ ধারাবাহিকতাবে চলে। এটা কখনো থেমে থাকে না। জীবনের প্রতিটি স্তরে বিকাশ সম্পর্কে সমাজের নির্দিষ্ট প্রত্যাশা থাকে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক সম্পর্কে সমাজের প্রত্যাশা এমন থাকে যে সে উপর্যুক্ত করবে, পরিবার ও সমাজের বিভিন্ন দারিদ্র্য প্রহর করবে। যে ব্যক্তি প্রাপ্তবয়সেও পিতামাতার উপর নির্ভরশীল থাকে সে সঠিকভাবে সমাজের প্রত্যাশা অনুযায়ী কার্যক্রম পালন করতে পারছে না থাকে নেওয়া হয়। জীবনের প্রতিটি স্তরে যে নির্দিষ্ট কাজ সামনে আসে তা সফলভাবে করতে পারলে জীবন হয় সুখের এবং পরবর্তী স্তরের কাছে সফলভাবে সম্পন্ন করা যায়। অপর দিকে এ কাজের ব্যর্থতা জীবনে আনে অশান্তি এবং পরবর্তী স্তরের সফলতায় বাধা সৃষ্টি করে। বিকাশের বিভিন্ন স্তরে সামাজিক প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজকেই বিকাশমূলক কার্যক্রম বলা হয়। অর্থাৎ বিকাশমূলক কার্যক্রম হলো—

- জীবনের নির্দিষ্ট স্তরে করণীয় কিছু কাজ যা সমাজ প্রত্যাশা করে।
- এ কাজের সফলতা পরবর্তী স্তরে সফল উত্তরণে সহায়তা করে, জীবনকে করে সুখী।
- এ কাজের ব্যর্থতা পরবর্তী স্তরের উত্তরণে আনে বাধা, জীবনে আনে অশান্তি।

বিকাশমূলক কাজগুলো হলো—

- বিকাশমূলক কাজের মধ্যে থাকে শারীরিক পরিগৃহতা অনুযায়ী কাজ যেমন— ইটতে শেখা, কথা বলতে শেখা, খেলাখুলায় দক্ষতা ইত্যাদি।



বিকাশমূলক কাজ

- সমাজ সহকৃতি অনুযায়ী কাজ যেমন— সেখাপড়া করা, সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে গঢ়ে তোলা, নিয়ম মেনে চলা ইত্যাদি।
- নিজের আঁচহ, মূল্যবোধ অনুযায়ী কাজ যেমন— শেলা নির্বাচনে নিজস্ব প্রত্যাশা, নিজের আঁচহ, মূল্যবোধ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের একটি অংশ।

বিকাশমূলক সম্পর্কে আগামের ধারণা থাকলে যে সুবিধাগুলো হয় তা হলো—

- বিকাশমূলক কার্যক্রম জ্ঞানলে বয়স অনুযায়ী সঠিক আচরণ করা সহজ হয়।
- বাবা-মা বা শিশুর পরিচালনাকারী ব্যবসানুযায়ী শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ জ্ঞানতে পারেন এবং সেভাবে শিশুর সামাজিক দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করতে পারেন।
- বিকাশমূলক কার্যক্রম সামাজিক প্রত্যাশা অনুযায়ী আচরণ করতে পূর্বপ্রস্তুতি ও প্রেরণা দেয়। এতে বিকাশের প্রতি স্তরে খাপ খাওয়ানো সহজ হয়।

অতি শৈশব ও প্রারম্ভিক শৈশবের কয়েকটি বিকাশমূলক কাজ-

- হাঁটতে শেখা-১২ থেকে ১৫ মাসের মধ্যে শিশু হাঁটতে পারার শারীরিক যোগ্যতা অর্জন করে।
- শক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে শেখা- দুই বছর বয়সের মধ্যে শিশু শক্ত খাদ্য চোষা ও চিবানোর ক্ষমতা অর্জন করে।
- কথা বলতে শেখা- শিশু ৬ মাসের মধ্যে অর্থহীন শব্দ করে। ৩ বছরে দুই বা তিন শব্দের বাক্য বলে। ৫ বছরের মধ্যে বহু শব্দের ব্যবহারে পূর্ণ বাক্য বলে।
- মলমৃত্র ত্যাগের নিয়ন্ত্রণ শেখা- দুই বছরের মধ্যে মল-মৃত্র ত্যাগের স্থান ও সময় নির্দিষ্ট হয়। এর নিয়ন্ত্রণে প্রশিক্ষণেরও প্রয়োজন হয়।
- শরীরবৃত্তীয় দক্ষতা অর্জন- পাঁচ বছরের মধ্যে দেহের তাপ, বিপাক ক্ষিয়ায় ভারসাম্য এবং শারীরিক গঠনে দৃঢ়তা আসে যার কারণে অল্পতেই অসুস্থ হওয়ার আশঙ্কা কমে যায়।
- সঠিক ও ভুলের পার্থক্য করতে শেখা- শৈশবের প্রথম দিকে বাবা-মা যে কাজকে পূরস্কৃত করেন বা ভালো বলেন- সেটাই ভালো কাজ এবং যে কাজ করতে নিষেধ করেন সেটা খারাপ কাজ, এভাবে ভালো মন্দের ধারণা তৈরি হয়।

মধ্য শৈশবের কয়েকটি বিকাশমূলক কাজ-

- সমবয়সীদের সাথে সঠিক আচরণ করতে শেখা- এই বয়সকে দলীয় বয়স বলা হয়। সমবয়সী দলে মিশে তারা সামাজিক আদান-প্রদান, ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করা ইত্যাদি শেখে।
- সাধারণ খেলাধূলার প্রয়োজনীয় শারীরিক দক্ষতা শেখা- সঠিকভাবে কোনো কিছু ছোড়া, ধরতে পারা, বল সঠিকভাবে লাথি মারা ইত্যাদি কৌশলগুলো শেখার শারীরিক যোগ্যতা অর্জন করে।
- ছেলে ও মেয়ে অনুযায়ী সামাজিক ভূমিকা শেখা- ছেলে বাবার ভূমিকা এবং মেয়ে মায়ের ভূমিকা অনুকরণ থেকেই লিঙ্গ অনুযায়ী ভূমিকা শেখে।
- পড়ালেখা ও গণনার মূল কৌশল আয়ত্ত করা- ৬ বছরের পরে স্নায়ু, আঙ্গুলের পেশি, বাহু লেখার উপযোগী হয়। দৈহিক যোগ্যতা অর্জনের পর বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে শিশুর পড়া ও লেখার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় বস্তু সম্পর্কে ধারণার বিকাশ- স্কুলে যাওয়ার পর থেকে শিশু বহু বিষয় সম্পর্কে ধারণা পায়। যেমন- সময় (ঘণ্টা, মিনিটি, সেকেন্ড -এর ধারণা), দূরত্ব (বাড়ি থেকে স্কুল, ঢাকা থেকে চিটাগং এর দুরত্ব), ওজন (তুলা হালকা, লোহা ভারী) ইত্যাদি বিষয়গুলো বুবতে পারে। এই ধারণাগুলো থেকেই তাদের চিন্তা করার সূত্রপাত ঘটে।

বয়ঃসন্ধি বা কৈশোরের বিকাশমূলক কাজ-

- উভয় লিঙ্গের সমবয়সীদের সাথে পরিণত আচরণ করতে পারা।
- বাবা-মা ও অন্যের উপর থেকে আবেগীয় নির্ভরশীলতা কমানো- শৈশবের নির্ভরশীলতা বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই কমতে থাকে। তারা আত্মনির্ভরশীল হয়। অনেক সময় বাবা-মায়ের স্নেহ -ভালোবাসাকে তারা বাড়াবাড়ি মনে করে। তাদের মধ্যে স্থাধীনতার চাহিদা থাকে।
- বৃক্ষ নির্বাচন ও পেশার জন্য প্রস্তুতি- শৈশবে পেশা সম্পর্কিত পরিকল্পনা থাকে অস্পষ্ট অবস্থা। কৈশোরে নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতার আলোকে পেশার প্রতি আগ্রহ তৈরি হয় বলে তা হয় বাস্তবধর্মী।

- সামাজিকভাবে দায়িত্বপূর্ণ আচরণ গ্রহণের আগ্রহ— নিজ আচরণের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের আগ্রহ এ সময়ের অন্যতম প্রধান বিকাশমূলক কাজ। তারা সমাজের ভালোর জন্য সংযবন্ধ হয়ে কাজ করতে উৎসাহী হয়।
- নেতৃত্ব আর্জন— এ সময়ের মধ্যে ছেলেমেয়েদের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের নিজস্ব ধারণা তৈরি হয়। এর আগে তাদের মধ্যে মা-বাবার শাস্তি ও পুরস্কারের উপর ভিত্তি করে ভুল ও সঠিক বিষয়টি নির্ভর করত।

কাজ – মধ্য শৈশব ও কৈশোরের বিকাশমূলক কাজ কোন গুলো— পৃথকভাবে তালিকা কর।

পাঠ ৪ ও ৫ – শিশুর বিকাশে বৎসরগতি ও পরিবেশ

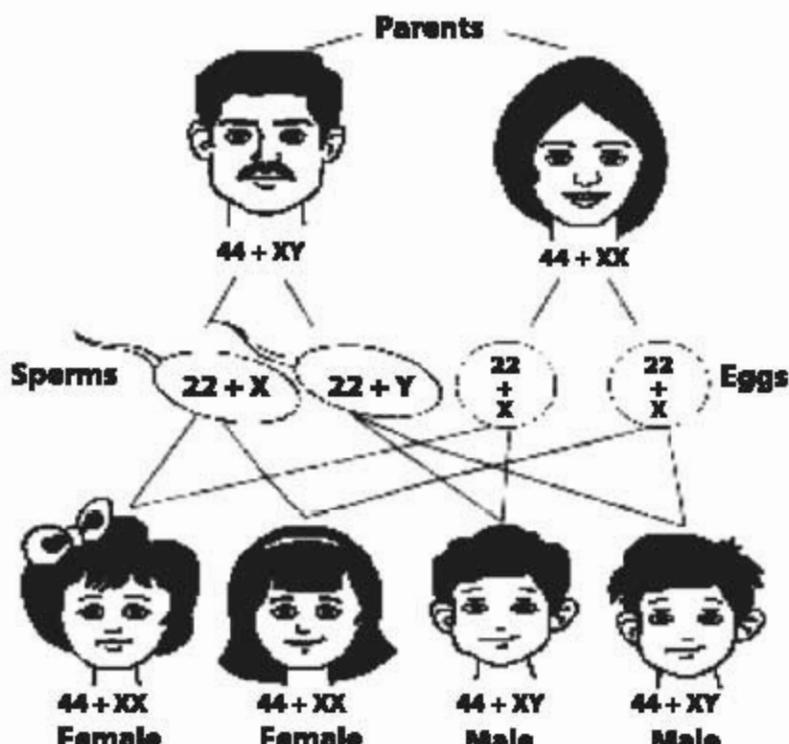
আমাদের চারপাশে যে মানুষগুলোকে আমরা দেখি তারা সবাই এক রকম নয় কেন? জন্ম অবস্থায় শিশুর মধ্যে কি এমন প্রবণতা থাকে যার কারণে তার দেহের আকৃতি, গঠন, চেহারাসহ আচরণ, গুণাবলি অন্যদের থেকে আলাদা হয়? নাকি সে যে পরিবেশে জীবনযাপন করে তার প্রভাবেই তার সারা জীবনের বিকাশ নিয়ন্ত্রিত হয়! এসব প্রশ্ন নিয়ে মনোবিদ, শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক যুগ যুগ ধরে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। গবেষণার মাধ্যমে তারা শিশুর বিকাশে বৎসরগতি কীভাবে কাজ করে, বিকাশে পরিবেশের ভূমিকা কী – এসব বিষয়ে ধারণা লাভ করেন। আমরা এখন এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানব।

বৎসরগতি—

মেয়েটির গায়ের রং একেবারে তার দাদির মতো। ছেলেটি বাবার মতো সাহসী কিংবা মেয়েটি মায়ের মতোই গানের গলা পেয়েছে। এরকম উক্তি আমরা সব সময়ই শুনে থাকি। শিশু জন্মসূত্রে তার বাবা-মা কিংবা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে যে বৈশিষ্ট্য পেয়ে থাকে সেটাই বৎসরগতি। বৎসরগতি দিয়ে শিশু তার জীবন শুরু করে। বৎসরগতির কারণে মানুষের সন্তান মানুষের মতো দেখতে হয়, অন্য কোনো প্রাণীর মতো হয় না। আবার উচ্চতা, দেহের গঠন, চুল, চোখ, চামড়ার রং ইত্যাদি দৈহিক গুণাবলি এবং বিভিন্ন মানসিক গুণাবলি বৎসরগতির কারণে একেক জনের একেক রকম হয়। বৎসরগতির প্রভাব জীবনের সূচনা থেকে শুরু করে সারা জীবনযাপনী চলতে থাকে।

বৎসরগতির সূচনা হয় মাতৃগর্ত থেকে। বাবার শুক্রাণু ও মায়ের ডিম্বাণু নিয়িন্ত্রিত হয়ে ভুগ বা জীবকোষ (Zygote) তৈরি হয়। জীবকোষের প্রধান তিনটি অংশ হচ্ছে—কোষ প্রাচীর, প্রোটোপ্লাজম এবং নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াস হলো জীবকোষের প্রাণকেন্দ্র। প্রতিটি মানব জীবকোষের নিউক্লিয়াসে ২৩ জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোজোম থাকে। প্রতিটি জোড়ার একটি আসে মাতৃকোষ থেকে অন্যটি পিতৃকোষ থেকে। মা ও বাবার কাছ থেকে পাওয়া ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের ২২টি জোড়াই ছেলে ও মেয়ের ক্ষেত্রে একই রকম থাকে। এই ক্রোমোজোমগুলো উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য শিশুর মধ্যে বহন করে। বাকি একজোড়া ক্রোমোজোম ছেলে ও মেয়ে শিশুর ক্ষেত্রে থাকে ভিন্ন রকমের যা নির্ধারণ করে সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে। এই ২৩ তম জোড়াটিই লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম।

মায়ের ডিম্বকোষ থেকে ভুগে যে লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম আসে তা সবসময়ই X টাইপ ক্রোমোজোম হয়। বাবার শুক্রাণু থেকে যে লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম আসে তা কখনো X, কখনো Y টাইপ হয়ে থাকে। যদি মায়ের X ক্রোমোজোমের সাথে বাবার X ক্রোমোজোমের মিলন ঘটে তাহলে মেয়ে শিশু জন্ম নেয়। আর যদি মায়ের X ক্রোমোজোমের সাথে বাবার Y ক্রোমোজোমের জোড় বাঁধে তবে ছেলে শিশু জন্ম নেয়। আমরা দেখি দুটি শিশু কখনোই এক রকম হয় না। আমাদের আপন ভাইবোনের মধ্যেও পার্থক্য থাকে। কেন এমন হয়?



শিখ নির্বাচন প্রক্রিয়া

ক্লোমোজোমের এক প্রকার জোড়া জিন মানুষের এক একটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। যার ফলে কেউ বেশি বৃদ্ধিমান, কেউ বা কম, কেউ বেইচে, কেউ বা সম্মা ইত্যাদি হয়ে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, মাঝের ক্লোমোজোম থেকে আসা কোন জিনটি বাবার ক্লোমোজোম থেকে আসা কোন জিনটির সাথে জোড়া বাধবে, তার কোনো বীধায়তা নিরম নেই। এ কারণে একই পিতামাতার সম্ভানের মধ্যেও পার্শ্বক্য দেখা যায়। তোমাদের ঘনে নিচ্ছাই অপ্র হচ্ছে—তাহলে অনেক সময় ব্যবহ সম্ভানের চেহারা ও আচরণ একই রকম হয় কীভাবে? একমাত্র সমক্ষের্ষী ব্যবহ শিশুর ক্ষেত্রে এ রকম হতে পারে।

ব্যবহ শিশু সুই ঘনের হয়। সমক্ষের্ষী ব্যবহ (Identical Twin) ও ডিন্বকের্ষী ব্যবহ (Fraternal Twin)। যখন একটি জীবকোষ বা আইগেট তৈলে দুটি ঝুশে পরিপন্থ হয়, তখন তারা একই শিখের হয় এবং একই রকম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। এরাই সমক্ষের্ষী ব্যবহ।

ডিন্বকের্ষী ব্যবহদের ক্ষেত্রে একাধিক ডিস্যাপু একাধিক শূক্রাণু থাকা মিহিত হয়। অনেক সময়ে দেখা যায় মাঝের একাধিক ডিস্যাপু পরিপন্থ থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে একাধিক শূক্রাণু একাধিক ডিস্যাপুর সাথে যোগিত হয়ে আইগেট পঠল করে। এ ধরনের ব্যবহ দুজনেই হলে বা দুজনেই যেতে বা একটি হলে, একটি যেতে হতে পারে। সুই এর বেশি আইগেট তৈরি হলে সম্ভান সংখ্যাও দুই—এর অধিক হয়। ডিন্বকের্ষী ব্যবহদের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যের মিল থাকে না। এদের বৈশিষ্ট্য সাধারণ ভাইবোনদের মতো হয়ে থাকে। সুধু পার্শ্বক্য ঘটুকুই থাকে যে সাধারণ ভাইবোনেরা এক কক্ষ বা কারণ বেশি সময়ের ব্যবধানে জন্ম নেয়। ডিন্বকের্ষী ব্যবহ একই মিলে জন্ম হারণ করে।

শিশুর বিকাশে পরিবেশ-

শিশুর বিকাশে জন্মপূর্ব পরিবেশ ও জন্ম পরবর্তী পরিবেশ দুটোই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাতৃগর্ভে শিশু যে ৪০ সপ্তাহকাল অবস্থান করে সেটিই জন্মপূর্ব পরিবেশ। ভূগ অবস্থায় মায়ের শারীরিক ও মানসিক সুস্থিতার উপর শিশুর স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক গঠন ও বিকাশ নির্ভর করে। যেমন—গর্ভবতী মায়ের পুষ্টিহীনতায় ভুগশিশুর মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ও বিকাশ ব্যাহত হয়। আবার মায়ের বয়স ১৮ বছরের নিচে হলে সন্তান ধারণে মা ও শিশু উভয়ের জীবনে ঝুঁকি থাকে।

জন্ম পরবর্তী পরিবেশ শিশু জন্মের পর হতে শুরু হয়। জন্ম পরবর্তী পরিবেশ দুই ধরনের হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ। ভূ-প্রকৃতি, আবহাওয়া, জলবায়ু, আলো-বাতাস, গাছ-পালা, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, পশু-পাখি ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিবেশ। সমতল ভূমির একটি ছেলের চেয়ে পাহাড়ি এলাকার একটি ছেলের পার্থক্য লক্ষ করা যায়। সমতলের তুলনায় পাহাড়ি অঞ্চলে জীবন ধারণ করা অনেক কষ্টসাধ্য বলে ওই অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা হয় কর্মসূচি ও পরিশ্রমী।

সামাজিক পরিবেশের মধ্যে আছে পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, খেলার সাথি, প্রতিবেশী, আতীয়-স্বজন, দেশীয় কৃষি, সমস্কৃতি, অর্থনৈতিক অবস্থা, কাজের পরিবেশ ইত্যাদি। শিশুর জীবনে মা-বাবা, ভাই-বোন, পরিবারের সদস্যদের স্নেহ-মমতা, সঠিক পরিচালনা পদ্ধতি তার সুস্থু বিকাশে সহায়তা করে। অপর দিকে মা-বাবার অনাদর, অবহেলা, অতিরিক্ত শাসন ইত্যাদি শিশুর বিকাশে অঙ্গীয় হয়। ছেলে-মেয়েরা জীবনের দীর্ঘসময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্যয় করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, নিয়ম-শৃঙ্খলা, শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিক্ষাপদ্ধতি ইত্যাদি তথা শিক্ষার সার্বিক পরিবেশ শিশু বিকাশে প্রভাব ফেলে। এ ছাড়াও সহপাঠী, খেলার সাথি, প্রতিবেশী, আতীয়-স্বজন স্বার সহায়তায় শিশুর বিকাশের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি হতে পারে।

শিশুর বিকাশে বৃংশগতি এবং পরিবেশ কোনটির প্রভাব বেশি? এ বিতর্ক দীর্ঘ দিনের। কারও মতে, শিশুর বিকাশ সম্পূর্ণরূপে বৃংশগতির উপর নির্ভরশীল। আবার কারও মতে— শিশুর বিকাশে পরিবেশের ভূমিকাই মূখ্য। বৃংশগতিকে যাঁরা গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, তাঁদের মতে শিশু যে পরিবেশেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন একমাত্র উন্নতাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যাবলি তার বিকাশকে প্রভাবিত করে। যেমন— বুদ্ধিমান মা-বাবার সন্তানেরা বেশির ভাগ বুদ্ধিমান হয়। জন্মের পর ভিন্ন পরিবেশে লালিত-পালিত দুই জন সমকোষী যমজের উপর গবেষণায় দেখা গেছে, ১৪ বছর ভিন্ন পরিবেশে লালিত-পালিত হলেও দুই যমজ বোনের বুচি, পছন্দ, আচরণ ও স্বভাবে কোনো পার্থক্য নেই (গবেষক—গেসেল ও থমসন)।

অপরদিকে পরিবেশবাদীরা মনে করেন— ব্যক্তির বিকাশে বৃংশগতি যাই হোক না কেন, তাকে যদি উপযুক্ত পরিবেশে রেখে যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়, তবে ব্যক্তির কাঙ্ক্ষিত বিকাশ সম্ভব। গ্ল্যাডিস এবং হেলেন নামে দুইজন সমকোষী যমজকে ভিন্ন পরিবেশে পাঠানো হয়; তখন তাদের বয়স মাত্র ১৮ মাস। হেলেন পড়াশোনা করার সুযোগ পেল। কিন্তু গ্ল্যাডিস পড়ার কোনো সুযোগই পায়নি। তাদের ৩৫ বছর বয়সে তুলনা করে দেখা গেছে যে, তাদের মুখের গঠন, চেহারা, আচরণ, মানসিক শক্তি, বুদ্ধিমত্তায় হেলেন গ্ল্যাডিস চেয়ে অনেক উন্নত। সমকোষী যমজ বোন হিসেবে উভয়ের বৈশিষ্ট্য একইরূপ হওয়ার কথা। কিন্তু তা হয় নি। এতে প্রমাণিত হয় পরিবেশের কারণে বিকাশ পার্থক্যপূর্ণ হয়।

পরিবেশ ও বৃংশগতি উভয়কেই যাঁরা সমর্থন করেন তাঁদের মতে— বিকাশ বৃংশগতি ও পরিবেশ এই দুই উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়ার দ্বারা নির্ধারিত হয়। উন্নত জাতের বীজ থেকে উন্নত মানের ফলন পাওয়া যায়। কিন্তু বীজ থেকে গাছ হওয়ার জন্য চাই উর্বর মাটি, পর্যাপ্ত পানি, আলো-বাতাস ইত্যাদি। পরিবেশের এই ফর্মা-৮, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান-৯ম শ্রেণি

উপাদানগুলোর অভাবে কখনই উন্নতমানের বীজ হতে উন্নতমানের ফলন সম্ভব হয় না। আবার উর্বর মাটি, পর্যাপ্ত পানি, আলো-বাতাস ইত্যাদি তালো পরিবেশ বিদ্যমান থাকলেও উন্নত বীজের অভাবে উন্নত মানের ফলন আশা করা যায় না। অর্থাৎ শিশুর সুরু বিকাশে বংশগতি এবং পরিবেশ উভয়েরই গুরুত্ব অপরিসীম।

জন্ম থেকে ক্ষীণ বৃদ্ধিসম্পন্ন একটি শিশুকে উন্নত পরিবেশে প্রতিপালন করলেও তার মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা থেকে যায়। একই ভাবে অধিক বৃদ্ধিমত্তা নিয়ে যে শিশু জন্ম গ্রহণ করে তাকে যদি তার বৃদ্ধি বিকাশের সহায়ক পরিবেশ ও শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া না হয়, তবে তার বৃদ্ধিমত্তার পূর্ণাঙ্গ পরিস্ফুটন হয় না। উপর্যুক্ত পরিবেশ শিশুর জন্মসূত্রে পাওয়া বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটায়। তাই বলা যায়— বংশগতি এবং পরিবেশ উভয়েরই পারস্পরিক ঝিয়ার ফলে শিশুর বিকাশ নির্ধারিত হয়।

কাজ – শিশুর বিকাশে বংশগতি ও পরিবেশ কোনটির গুরুত্ব বেশি? তোমার উভয়ের স্বপক্ষে উদাহরণসহ যুক্তি উপস্থাপন কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোন সময়কে শিশুর নবজাতক কাল বলা হয়?

- ক) জন্ম থেকে ১ সপ্তাহ
- খ) জন্ম থেকে ২ সপ্তাহ
- গ) জন্ম থেকে ৩ সপ্তাহ
- ঘ) জন্ম থেকে ৪ সপ্তাহ

২। গ্রামের ছেলে মেয়েরা বেশি কর্মঠ হওয়ার কারণ—

- i. ভৌগোলিক অবস্থা
- ii. আবহাওয়া
- iii. পরিচর্যা

নিচের অনুচ্ছেদটি গড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উভয় দাও :

চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র তাহমীদের কৌতুহলের সীমা নেই। স্কুল থেকে ফিরেই তার চারপাশের বিভিন্ন বিষয় জ্ঞানের জন্য সে মাকে নানা প্রশ্ন করে। ইদানীং সে দাবা খেলা শিখেছে। এতে ভীষণ আনন্দিত।

৩। তাহমীদ বিকাশের কোন স্তরে আছে?

- ক) নবজাতক কাল
- খ) মধ্য শৈশব কাল
- গ) কৈশোর কাল
- ঘ) বয়ঃপ্রাপ্তিকাল

৪। ওই স্তরে তাহমীদ—

- i. চিন্তাশক্তির বিশ্লেষণ করতে পারে।
- ii. নিজ অবয়বের প্রতি আকৃষ্ট হয়।
- iii. ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করতে পারে।

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) ii ও iii |
| গ) i ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

- ১। দুষ্ট শ্রেণি পড়ুয়া রাফি বড় হয়ে বৈমানিক হতে চায়। সে জেনেছে বৈমানিক হতে হলে বিজ্ঞান বিষয় তালোভাবে জানতে হয়। তাই সে দারুণ উৎসাহ নিয়ে বিজ্ঞান বিষয়টি পড়ে। মা রাফিকে তার পছন্দমতো পড়ান। মায়ের বেঁধে দেওয়া সময় অনুযায়ী তাকে খেলতে যেতে হয়। রাফি তা পছন্দ করে না।
- ক. কতো বছর বয়স পর্যন্ত মানবদেহে বর্ধন চলে?
- খ. বার্ধক্যে একজন ব্যক্তির কাজ করার ক্ষমতা কমে যায় কেন?
- গ. রাফি বিকাশের কোন স্তরে আছে তা ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. তুমি কী মনে কর রাফি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠবে? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।
- ২। জাওয়াদ ও জারিফ দুই ভাই। তারা দেখতে অনেকটা তাদের দাদার মতো হয়েছে। তাদের বড় চাচারও দুইটি পুত্রসন্তান আছে। কিছুদিন আগে জাওয়াদের ছেট চাচার প্রথম পুত্রসন্তানের জন্ম হয়েছে। এ সৎবাদ শুনে তাদের দাদি মর্মাহত হন। জাওয়াদের দাদা এ নিয়ে তার দাদিকে মন খারাপ করতে নিষেধ করলেন এবং আরও বললেন “সন্তান জন্মের ব্যাপারে মানুষের করণীয় কিছু নেই।”
- ক. মানব জীবকোষের নিউক্লিয়াসে কয়টি ক্রমোজোম থাকে?
- খ. শিশুর বিকাশ বলতে কী বোঝায়?
- গ. জাওয়াদ ও জারিফ একরকম দেখতে হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. দাদার মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

সপ্তম অধ্যায়

শিশুর বিকাশ ও পারিবারিক পরিবেশ

পাঠ ১ – মা- বাবার সাথে শিশুর বন্ধন

একটি চারাগাছের কথা ধরা যাক, বীজ থেকে যখন চারাগাছটি জন্মায় তখন তা বেশ দুর্বল থাকে। এ সময়ে উপর্যুক্ত যত্ন ও পরিচর্যার উপর গাছটির বেঁচে থাকা নির্ভর করে। একবার যদি গাছটির গোড়া মাটিতে শক্ত হয়ে যায় তবে পরবর্তীতে বিশেষ যত্ন ছাড়াই গাছটি বেড়ে উঠতে পারে। ঠিক তেমনি মানব শিশুর জীবনের প্রথম কয়েক বছরের যত্ন ও পরিচর্যা পরবর্তী জীবনের ভিত্তি তৈরি করে।

জন্ম থেকে শুরু করে জীবনের প্রথম পাঁচ বছর একটি শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে মূলভিত্তি রচনা করে। এ সময়ে দ্রুতগতিতে শারীরিক বৃদ্ধির পাশাপাশি তার আচরণগত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এ সময়ের জন্য প্রয়োজন হয় শারীরিক যত্ন এবং পরিবারের বা তার চারপাশের ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, উষ্ণ সাড়া যা তাকে নতুন নতুন দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। যে শিশু জীবনের প্রথম বছরগুলোতে তার বিকাশের জন্য সহায়ক পরিবেশ পায় সে শিশুটি অন্যদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান, সামাজিক ও সুস্থান্ত্রের অধিকারী হয়। তার সামাজিক দক্ষতা, ভাষার দক্ষতা, সূজনশীলতা, আত্মবিশ্বাস প্রভৃতির বিকাশ ঘটে যা পরবর্তী জীবনে তাকে সুখী ও সুস্মর থাকতে সহায়তা করে।

সকল পরিবারই তাদের শিশুদের ভালোবাসে। কিন্তু আমাদের অনেকের মধ্যে শিশু প্রতিপালন বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা আছে বা কীভাবে তাকে সহায়ক পরিবেশ দিতে হবে – এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা থাকে না। আমরা অনেকেই জানি না যে, শিশুর সাথে খেলা ও ভাব বিনিময় শিশুর জীবনের প্রথম বছরগুলোতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিশুর সাথে বন্ধন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মা-ই হচ্ছেন প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। বুকের দুধ খাওয়ানো এবং বিভিন্ন মাতৃ পরিচর্যা হলো শিশুর শরীর, মন ও আবেগ বিকাশের ক্ষেত্রে মায়ের শ্রেষ্ঠ অবদান। সাম্প্রতিক বিভিন্ন গবেষণায় স্পষ্ট হয়েছে যে, মা ও নবজাতকের মধ্যে জন্মের এক ঘণ্টা ও প্রথম কয়েক দিনের সান্নিধ্য উভয়ের মাঝে গভীর বন্ধন গড়ে তোলে, যা বিকশিত হতে থাকে এবং স্থায়ী হয় বছরের পর বছর। শিশুর সাথে বন্ধন তৈরির কয়েকটি পদক্ষেপ হলো–

- শিশুকে জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যেই মায়ের দুধ দেওয়া।
- শিশুর কান্নায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাড়া দেওয়া।
- শিশুকে কাছে নিয়ে ঘুমানো।
- শিশুকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া।

শিশুকে জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যেই মায়ের বুকের দুধ দেওয়া–

- বহু সংস্কৃতিতেই সোনাকে মূল্যবান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সোনার তুলনায় ব্রোঞ্জ মূল্যহীন। মায়ের দুধের পরিবর্তে কৃত্রিম দুধ শিশুর জন্য সোনার পরিবর্তে ব্রোঞ্জের মতোই মূল্যহীন। জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো শিশুর জীবনে শ্রেষ্ঠ সূচনা। জন্মের পরপরই সুস্থ নবজাতককে উষ্ণ রাখার জন্য মায়ের পেট এবং বুকে রাখা হয়। শিশু মায়ের দুধ খেতে শুরু করে। এতে শিশুর প্রতি মায়ের ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।

- মায়ের দুধ শিশুর সুস্থিতা ও বৈচে থাকার জন্য পূরুষপূর্ণ। দুধ খাওয়ানোর সময় মাঝের ঝুকের সৰ্বো শিশু উক থাকে। এই অবস্থা আড়াই কেজির কম উজনের শিশুর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
- শিশুর প্রথম খাবার হিসেবে শালদুধ (মায়ের ঝুকের প্রথম দুধকে শালদুধ বা কলোন্টাইম বলা হয়) শিশুর প্রথম চিকিৎসা হিসেবে কাজ করে। শালদুধ নানা রকম প্রতিরোধমূলক (ইমিটনোলোজিক্যাল) সক্রিয় কোষ, এন্টিবাটিং ও অন্যান্য প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিন সমৃদ্ধ হওয়ার শিশুর বহু ক্লোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করে।
- শিশু জনের প্রথম ৫ দিন শালদুধ অসমান্তরাল আসে। তবে এই পরিমাণই নবজন্মকের শারীরিক সুরক্ষার জন্য যথেষ্ট। শালদুধ শিশুর পরিপাচক অঙ্গসমূহকে উন্মুক্ত করে। যার ফলে অঙ্গ থেকে মুক্ত মিকেনিলাম (শিশুর প্রথম মল) পরিষ্কার হয়। এই অবস্থা জড়িস সূচিকর্তী জীবাণু শরীর থেকে বের হোৱ যেতে সাহায্য করে।
- শিশুর মায়ের স্তন ঘূর্ণ নেওয়া ও চোষার ফলে মায়ের শরীরে অগ্নিটোসিল নামক হরমোন নির্ণত হয়। এতে মা শাঙ্গ, অবসাদমূলক বোধ করেন এবং শিশুর সাথে মায়ের ভালোবাসার কথখন দৃঢ় হয়।
- মাঝেরা তাদের সন্তানদের সাথে এই প্রথম বোগাযোগে অঙ্গিশয় আনন্দবোধ করেন। এভাবে মা ও শিশুর ঘৰ্য্যে বৰ্খনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এভাবে শিশু জীবনের প্রথম ছয় মাস শুধু মাঝের দুধ এবং ছয় মাস পর থেকে ২ বছর পর্যন্ত বাড়তি খাবারের সাথে মায়ের দুধ দেওয়া চলতে থাকে।



জনের এক ঘটনার ঘৰ্য্যে শিশুকে মাঝের দুধ
খাওয়ানো শিশুর জীবনে প্রেষ্ঠ সূচনা

শিশুকে ঝুকের দুধ খাওয়াতে মায়ের জন্য সহায়ক পরিবেশের দরকার হয়। এই পরিবেশ তৈরিতে পরিবারের বাবার কৃতিকা থাকে সবচেয়ে বেশি। তিনি বিভিন্নভাবে স্তন্যদানকারী মাকে সাহায্য করেন।

- মায়ের পৃষ্ঠির জন্য প্রয়োজনীয় খাবাতের ব্যবস্থা করেন।
- মা ও শিশুকে বেশি সময় একত্রে রাখার সুযোগ সৃষ্টি করেন।
- গৃহস্থানীয় প্রয়োজনীয় কাজে মাকে সহায়তা করেন।
- পরিবারে বড় শিশুটির যত্ন নিতে মাকে সাহায্য করেন।
- স্তন্যদানকারী মায়ের প্রতি সহানুভূতিশীল হন।

এ কাজগুলোর মধ্য দিয়ে বাবা প্রোক্তভাবে সন্তানের সাথে কথখন তৈরিতে কৃতিকা রাখেন।



শিশুর কান্নায় বস্ত তাড়াতাড়ি সঞ্চয় সাঢ়ো দেওয়া—

মায়ের সাথে বাবার সহযোগিতা শিশুর জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি করে

- তাসা বিকাশের আগে সাধারণত শিশুরা কান্না দিয়েই তাদের চাহিদা ও অসুবিধাগুলো প্রকাশ করে। অতি শেষবের শিশু সাধারণত দুইটি কারণে কান্দে। কৃত্ত্বার কারণে এবং বে কোনো ধরনের শারীরিক অসুবিধার

কারণে। ক্ষুধায় শিশুকে খাবার দেওয়া এবং শারীরিক অসুবিধা দূর করার জন্য ব্যবস্থা করা যেমন— শিশুকে ডেজা বিছানায় না রাখা, মলমুত্তি ঠিকমতো পরিষ্কার করা, পেট ব্যাথায় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি কাজগুলো শিশুকে আরাম দেয়। শিশু যদি আরামে সুমাতে পারে, কান্নায় যত তাড়াতাড়ি মা-বাবার সাড়া পায়, তাকে কোলে তুলে নেওয়া হয়, তাহলে মা-বাবার প্রতি শিশুর বিশ্বাস ও আস্থার সম্পর্ক গড়ে উঠে। বিপরীতে যখন শিশুর অসুবিধাগুলো সময়মতো দূর করা হয় না অথবা শিশু কোনো কারণে আরাম পায় না তখন তার মধ্যে অবিশ্বাস ও অনাস্থার অনুভূতি জন্মাতে থাকে। বাবা-মায়ের আদর, যত্ন, স্নেহ ভালোবাসার অভাবে একটি শিশুর মা-বাবার প্রতি অনাস্থার পাশাপাশি পরিবেশ সম্পর্কেও শিশুটির মধ্যে অনাস্থা ও নিরাপত্তাহীনতা এবং হতাশার জন্ম নেয়। সেক্ষেত্রে শিশু বেশি কানুকাটি করে।

শিশুকে কাছে নিয়ে সুমানো—

দিনের বেলার মতো রাতেও শিশুর বিভিন্ন ধরনের চাহিদা পূরণ করতে হয়। রাতে মা-বাবা শিশুকে শুয়ু পারিয়ে দেওয়া এই চাহিদাগুলোর মধ্যে অন্যতম। জীবনের প্রথম কয়েকটি বছর শিশুকে কাছে নিয়ে সুমানো জরুরি। এতে মা রাতে শিশুর চাহিদা ভালোভাবে বুঝতে পারেন এবং মায়ের দুধ খাওয়ানো সহজ হয়। এ ছাড়া রাতে শিশুর আশপাশে মা-বাবার উপস্থিতি শিশুর জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করে। বিছানায় খাওয়ার আগে প্রত্যেক শিশু মা-বাবাকে কাছে পেতে চায়। স্কুলে যাওয়ার পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত এটা ধূবই সাধারণ ঘটনা। কখনো বড় শিশুরাও তাদের সারা দিনের কর্মকাণ্ড সুমানোর আগে মা-বাবাকে বলতে পছন্দ করে।



শিশুর সাথে মা-বাবার বস্থন তৈরির অন্যতম উপায়— শিশুকে পর্যাপ্ত সময় ও সজ্ঞা দেওয়া

শিশুকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া —

শিশুরা সাধারণত খাদ্য ও নানা ধরনের শরীর বৃষ্টিয় কাজে মায়ের উপর নির্ভরশীল থাকে। এসব কাজে বাবারও সহায়ক ভূমিকা থাকলে শিশুর মায়ের উপর নির্ভরশীলতা কমে এবং বাবার সাথে তার আসন্তি তৈরি হয়।

শিশুকে পর্যাপ্ত সময় দিতে করণীয়-

- শিশুর সাথে খেলা করা, গান, ছড়া, গল্প বলা- যা শিশুর সামাজিক ও বৃদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশ ঘটায়
- শিশুকে বাইরে নিয়ে যাওয়া- এ থেকে শিশু বাইরের অভিজ্ঞতা অর্জন করে।
- পারিবারিক কাজে শিশুকে সাথে নেওয়া (যেমন- বাগানে পানি দেওয়া, ঘর পরিষ্কারের কাজ ইত্যাদি)- এতে শিশুর নিজের দক্ষতা সম্পর্কে আস্থা আসে।

এ ছাড়া জীবনের প্রথম বছরগুলোতে শিশুকে বেশি কাছে রাখা, শারীরিক সংস্কর্ষ, শিশুকে আদর, স্নেহ করা, বিষয়গুলো শিশুর সাথে মা-বাবার বন্ধনকে মজবুত করে। শৈশবে মা-বাবা শিশুকে যত বেশি সময় দেবে এবং স্নেহ করবে তাদের বন্ধন ততই দৃঢ় হবে এবং এ বন্ধন তাদের পরবর্তী বয়সে মা-বাবার সাথে সন্তানের সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

কাজ - “ শিশুকে মায়ের দুধ দেওয়া- শিশুর সাথে মায়ের বন্ধন তৈরির শ্রেষ্ঠ সূচনা” - বিষয়টির উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

পাঠ ২ ও ৩ - শিশুর বিকাশে পারিবারিক সম্পর্কের গুরুত্ব

শিশুকে সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা পরিবারের অন্যতম একটি কাজ। জন্ম গ্রহণের পর শিশুর সাথে পরিবারের একটি সম্পর্ক গড়ে উঠে। ৭/৮ মাস বয়সের মধ্যে শিশুরা মা-বাবা কিংবা যারা তাদের যত্ন নেয় তাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে। এ বয়সের কোনো শিশুকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, তারা তাদের মা-বাবার মনোযোগ পাওয়ার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে। যখন মা শিশুর ঘরে প্রবেশ করে তখন শিশু খুশি হয়ে উঠে। মা তাকে কোলে তুলে নিলে সে তার মুখে হাত দেয়, চুল নাড়াচাড়া করে। শিশু তায় পেলে মায়ের কোলে আশ্রয় নেয়। জন্মগ্রহণের পরপরই শিশুর সাথে মায়ের সম্পর্ক তৈরি হতে থাকে। মায়ের কোমল স্পর্শ, স্নেহ, হাসি, ভালোবাসা সবই শিশুর সাথে তার গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলে।

গবেষকরা দেখেছেন বাবার সাথে শিশুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক শিশুর ইতিবাচক বিকাশে ভূমিকা রাখে। শিশুর লালন-পালনে বাবার অংশগ্রহণ মায়ের তুলনায় কোনো অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং কখনো কখনো শিশুর বৃদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশে মায়ের চেয়েও বেশি শক্তিশালী ভূমিকা রাখে। যে পরিবারে বাবা শিশুকে পর্যাপ্ত সময় দেন, শিশু লালন-পালনে স্নেহপূর্ণ অংশ নেন সে পরিবারের শিশুর মধ্যে বিভিন্ন আচরণগত সমস্যা কম দেখা যায়। এমনকি বাবার অংশগ্রহণ, শিশুর কৈশোরের মাদকাস্তি বা অপরাধমূলক কাজ প্রতিরোধে সহায়তা করে।

শুধুমাত্র সন্তানের সাথে মা-বাবার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করলেই হবে না, মা-বাবার নিজেদের মধ্যেও স্বামী-স্ত্রী হিসাবে সম্পর্ক সুখের হতে হবে। কারণ সুখী মা-বাবার সন্তানেরাও সুখী থাকে। মা-বাবার সান্নিধ্যে শিশুরা অনেক বেশি নিরাপদ বোধ করে এবং আনন্দ পায়। তাই মা-বাবার মধ্যে যখন সুসম্পর্কের অভাব থাকে তখন শিশু প্রতিপালনে তাদের মনোযোগ থাকে না। ফলে শিশুটির বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটি শিশুকে পর্যাপ্ত খাদ্য দেওয়া হলেও যদি তার যথাযথ পরিচর্যা না করা হয়, তবে পর্যাপ্ত ভালোবাসা, মনোযোগ, ও উদ্দীপনা পাওয়া অপর একটি শিশুর তুলনায় তার মস্তিষ্কের বিকাশ কম হয়।

ভাই-বোনের সাথে পারস্পরিক শিথিল সম্পর্ক একটি শিশুর আত্মাধারণাকে বিস্তৃত করে। ভাই-বোন শিশুটিকে যেভাবে মূল্যায়ন করে অর্থাৎ ভালো বা মন্দ বলে, নিজের প্রতি শিশুটির সে ধারণাই প্রতিষ্ঠিত হয়। বড় ভাই

বোনকে অনুসরণ করে শিশু ভালো বা খারাপ আচরণ শেখে। তাই-বোনের সান্নিধ্যে শিশু নিরাপত্তা পায়। আবার ভবিষ্যৎ জীবনে দলগতভাবে মেলামেশার অভিজ্ঞতা অর্জন করে। মা-বাবার পাশাপাশি পরিবারে তাই-বোনের মধ্যে ভালো সম্পর্ক শিশুর সুস্থি বিকাশের জন্য প্রয়োজন। পরিবারে তাই-বোনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকলে উভয়েরই সাহচর্যে তাদের সময় আনন্দময় হয়ে উঠে।

শিশুর ভাই বা বোন হিসেবে যে সব আচরণ শিশুর সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরি এবং শিশুর বিকাশে সহায়তা করে	যে আচরণ পরিবারিক সম্পর্ক উন্নয়নে ক্ষতিকর হয় এবং শিশুর বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে
<ul style="list-style-type: none"> - ছেট ভাই বা বোনের যত্নে সহযোগিতা করা - কোনো জিনিস ভাঙ্গাভাঙ্গি করা - পরস্পরকে সাহায্য করা - ভাদের সঙ্গে দেওয়া, খেলাখুলা করা - সবাই মিলেমিলে থাকা - তাদের সাথে দ্রোহের সম্পর্ক তৈরি করা 	<ul style="list-style-type: none"> - ছেট ভাই বা বোনকে সঙ্গ বা সময় না দেওয়া - নিজের স্বার্থ বড় করে দেখা - ইর্ষা করা - তাই-বোনের সাহচর্য এড়িয়ে চলা - ঘগড়া করা, মারামারি করা - অবহেলা করা, নিজেকে বড় মনে করা

আমাদের দেশে যৌথ পরিবার প্রথায় একটি পরিবারে আরও অনেক সদস্য থাকেন, যারা শিশুর লালন-পালনে বাবা-মাকে সহযোগিতা করে থাকেন। বিশেষ করে কর্মজীবী মাঝের ক্ষেত্রে শিশুর যত্নে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ভূমিকা ধাকে অনেক বেশি। শিশুর প্রতি আত্মায়নজনের মনোভাব একেব্রে শক্তীয় বিষয়। যখন কেউ মনে করে যে শিশুটিকে শুধুমাত্র পাহারা দিয়ে রাখতে হবে। শিশুর কথা শোনা, তার সাথে খেলা করার প্রয়োজন নেই, সে ক্ষেত্রে শিশুর সাথে সেই সদস্যের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠে না।



পরিবারে তাই-বোনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকলে উভয়েরই সাহচর্যে তাদের সময় আনন্দময় হয়ে উঠে।

পরিবারে দাদা-দাদি, নানা-নানি শিশুর সাথে গল করেন, শিশুদের তাদের নিজের জীবনের অনেক ঘটনা শোনান। তাঁরা শিশুর অসুবিধার কথা শোনেন, তা সমাধানের চেষ্টা করেন। শিশুকে আদর-ভালোবাসা দেন। এভাবে শিশুর সাথে পরিবারের সকলের ভাব বিনিময় শিশুর প্রথম বছরগুলোর জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর চারপাশের মানুষের সঙ্গে ভাববিনিময় ও পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই শিশুর মতিজ্ঞকর বিকাশ ঘটে। শৈশবে যদি পরিবারের সদস্যদের সাথে সুসম্পর্কের ভিত্তি তৈরি হয় ভবিষ্যতেও শিশু তার মা-বাবা, তাই-বোন, পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে বস্তু হিসেবে ভাবতে শেখে।

কাজ ১ - পরিবারের তাই-বোনের সম্পর্ক উন্নয়নের কয়েকটি উপায় দেখ।

কাজ ২ - পরিবারের আর্থিক সংকটে তোমার করণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ কর।

পারিবারিক বিপর্যয়-

প্রতিটি শিশুর জন্যই প্রয়োজন হয় পরিবারের যেখানে সে আদর, ভালোবাসা, নিরাপত্তা ও বিশ্বাস পায়, সুরক্ষিত থাকে এবং তার মৌলিক চাহিদাকে পূরণ করা হয়। পরিবার এমন একটি সংগঠন যেখানে স্বামী-স্ত্রী একসাথে অবস্থান করেন। শিশুকে লালন পালন এবং শিক্ষিত করে গড়ে তোলার দায়িত্ব থাকে পরিবারের উপর।

শিশু পরিবারে জন্ম নেয় এবং বড় হয়ে উপর্যুক্ত করতে শেখে। এই দীর্ঘ সময়ে পরিবার অনেক ক্ষেত্রে নানা ধরনের বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। পারিবারিক এই বিপর্যয়ের মধ্যে আছে— মা কিংবা বাবার অসুস্থতা, মৃত্যুজনিত শুন্যতা, মা-বাবার পৃথক অবস্থান কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদ। এ ছাড়াও আছে বাবা-মায়ের সার্বক্ষণিক ঝগড়া, মতের অভিল, পরস্পরের সমবোতার অভাব, পরিবারে বাবার অনুপস্থিতি বা চাকরি চলে যাওয়া, ব্যবসায় ক্ষতি, মায়ের উপর দৈহিক নির্যাতন ইত্যাদি। পারিবারিক বিপর্যয় যে ধরনেরই হোক না কেন, তা পরিবারের সদস্যদের কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতার জন্ম দেয়। এতে শিশু জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ বিঘ্নিত হয়।

বাবা/মায়ের মৃত্যু— পরিবারে বাবা কিংবা মায়ের মৃত্যুতে পরিবারে শিশুর জন্য বড় ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। সাধারণত পরিবারে বাবা উপর্যুক্ত করেন। এ কারণে বাবার মৃত্যুতে পরিবারে আর্থিক সংকট প্রকট হয়। পরিবারে বিভিন্ন বয়সের শিশু থাকলে তাদের ভরন-পোষণ, লেখাপড়ার খরচ বহন করা কঠিন হয়ে পড়ে। মায়ের মৃত্যুতে সন্তানেরা দিশেহারা হয়। তাদের দেখাশোনা, যত্ন পরিচর্যায় অবহেলা হয়। বাবা কিংবা মা যে কোনো একজনের মৃত্যুতেই সন্তান স্নেহবন্ধিত হয়।

বাবা/মায়ের গুরুতর অসুস্থতা— পরিবারে মা বা বাবার হঠাতে কোনো গুরুতর অসুস্থতা ধরা পড়লে পরিবারের উপর বিপর্যয় নেমে আসে। মা কিংবা বাবার দীর্ঘ দিনের অসুস্থতা পরিবারে সংকট সৃষ্টি করে। হঠাতে কোনো গুরুতর অসুস্থতায় বা দীর্ঘদিনের অসুস্থতায় পরিবারে আর্থিক সংকট দেখা দেয়। এ ছাড়া মা-বাবার সুস্থ সঙ্গ থেকে শিশুরা বন্ধিত হয়। মা-বাবার অসুস্থতায় তারা মা-বাবাকে হারানোর ভয়ে ভীত, হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মা-বাবা ছাড়াও পরিবারের যে কোনো সদস্যের গুরুতর অসুস্থতা পারিবারিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

পরিবারে ভাঙ্গন— স্বামী- স্ত্রীর মতের অভিল, পরস্পরের সমবোতার অভাব, দ্বিতীয় বিয়ে ইত্যাদি পারিবারিক ভাঙ্গনের অন্যতম কারণ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সন্তানেরা ছোট অবস্থায় পারিবারে ভাঙ্গনের আশঙ্কা বেশি থাকে। মা-বাবার বিবাহ বিচ্ছেদ বা পৃথকভাবে অবস্থান ছেলে-মেয়েদের মনে হতাশা, দুন্দ, পড়াশোনায় মনোযোগের অভাব প্রভৃতি মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। পরিবারে ছোট শিশু থাকলে তাকে যদি বাবার কাছে থাকতে হয় তবে মায়ের স্নেহ বন্ধিত হয়ে তার বিকাশে মারাত্মক প্রভাব পড়ে। একটু বড় শিশুদের ক্ষেত্রে পরিবারের ভাঙ্গনে তারা হীনমন্যতায় ভোগে। স্কুলগামী শিশুরা বন্ধুবান্ধবদের বিরূপ মন্তব্যে মানসিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। অনেক সময়ে বিভিন্ন উদ্ভৃত পরিস্থিতিতে যাতে পড়তে না হয় সেজন্য সন্তানেরা কোথাও বের হতে চায় না, সামাজিক মেলামেশা ক্ষম করে দেয়, তারা অস্তর্মুখী হয়। তাদের মনের কষ্ট অনেক সময় শারীরিক কষ্টে রূপ নিতে পারে। যেমন— মাথাব্যথা, খাবারে অনীহা, ঘুমের ব্যথাত ইত্যাদি।

পারিবারিক বিপর্যয়ে পরিবারের সদস্যরা একত্র হয়ে সংকট মোকাবিলা করলে সমস্যা অনেক কমে যায়। পারিবারিক বিপর্যয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হয় আর্থিক সংকট। পরিবারের আর্থিক সমস্যা

দূর করতে এবং ছোট শিশুদের বিকাশজনিত চাহিদা পূরণে পরিবারের কিশোর বয়সের সন্তানেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। তারা যা যা করতে পারে-

- আর্থিক আয় বাড়ানোর চেষ্টা করা।
- অপ্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় কমানো।
- পরিবারিক বিভিন্ন কাজে অংশ নিয়ে ব্যয় কমানো যেমন— গৃহকর্মীর কাজ নিজে করা।
- ছোট ভাই-বোনের বিভিন্ন যত্ন ও পরিচর্যার দায়িত্ব নেওয়া।
- তাদেরকে পর্যাপ্ত আদর স্নেহ করা যেন তারা নিজেকে স্নেহবঞ্চিত মনে না করে।
- ছোট ভাইবোনের সাথে অধিক সময় কাটানো।
- অসুবিধা, কষ্ট, দুঃখ পরস্পরের সাথে ভাগাভাগি করা।
- ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা।
- সমস্যা সমাধানের জন্য দিগুণ পরিশ্রম করা।
- মানসিক চাপ মুক্ত থাকার চেষ্টা করা।
- পরিস্থিতির ইতিবাচক দিক খুঁজে নেওয়া।
- ভবিষ্যতে পেশার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে আরও মনোযোগী হওয়া।

কাজ- তোমার জানা কোনো পরিবারের যে কোনো বিপর্যয়ে তারা যে ধরনের সমস্যার সন্মুখীন হয়েছে— তা লেখ। ওই পরিবারটির সহায়তায় তোমার করণীয় কী তা উল্লেখ কর।

পাঠ ৪ – শিশু পরিচালনার নীতি

অনেক শিশুবিজ্ঞানী জন্মের মুহূর্তে শিশুকে সাদা কাগজের সাথে তুলনা করেছেন। সাদা কাগজে যেভাবে একটি ছবি আঁকা হয় ছবিটি সেভাবেই বুপ লাভ করে। ঠিক তেমনি নবজাত শিশুর জীবনে কোনো অভিজ্ঞতা থাকে না। সে তার চারপাশের পরিবেশ থেকে যে ধরনের অভিজ্ঞতা পায় সেভাবেই আচরণ করতে শেখে। সুষ্ঠু পরিচালনার মাধ্যমে যেমন একটি শিশুকে উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা যায় ঠিক তেমনি সঠিক তত্ত্বাবধানের অভাবে শিশুর মধ্যে অনেক ধরনের আচরণগত সমস্যা তৈরি হতে পারে যা তার বর্তমান বিকাশকে এবং পরবর্তী বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। শিশুরা কাদা মাটির মতো। সঠিক পরিচালনার মাধ্যমে শিশুটিকে মনমতো ছাঁচে গড়ে তোলা যায়, শিশুর সামর্থ্য বাড়ানো যায়। সেজন্যে শিশু পরিচালনার নীতি আমাদের জানা জরুরি।

শিশু পরিচালনার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নীতি -

- শিশুর সামনে আদর্শ আচরণ উপস্থাপন— শিশুরা অনুকরণ করে। যারা তাদের কাছাকাছি থাকে তাদের আচরণ অনুকরণ করে। শিশুদের যা যা করতে বলা হয় বা যা করতে নিষেধ করা হয় তার চেয়ে পরিবারের বড় সদস্যরা যা যা করেন, সেগুলোই তারা অনুকরণ করে। এ আচরণে শিশুর সামনে ভালো আচরণ উপস্থাপন করা দরকার। কোনো আচরণ শেখাতে হলে বড়দের সেই আচরণে অভ্যস্ত হতে হয়। যেমন— বড়দের শৃঙ্খা করা, একে অন্যকে সাহায্য করা ইত্যাদি। আবার কোনো আচরণ করতে নিষেধ করা হলে বড়দেরও সেই আচরণ থেকে বিরত থাকতে হবে। যেমন— মিথ্যা কথা না বলা, ঝগড়া না করা ইত্যাদি।

- শিশুকে প্রশংসা করা- প্রশংসা শিশুদের ক্ষমতাকে বাড়ায়, সাফল্যের অভিজ্ঞতা দেয়। কীভাবে অন্যদের প্রশংসা করতে হয় তা শেখায়। শিশুর কাজের ভালো দিকগুলো যদি তুলে ধরা হয় তবে তার আত্মবিশ্বাস বাড়ে। নিজ সম্পর্কে তার ভালো ধারণা হয়। সে বুবাতে পারে যে, সে অনেক কিছু করার ক্ষমতা রাখে। শিশুর মধ্যে ভালো গুণবলী খুঁজে তার জন্য তাকে প্রশংসা করতে হবে। এই প্রশংসা তার কাজের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই কোনো না কোনো ভালো গুণ বা আচরণ পাওয়া যায়। এই ভালো গুণ বা আচরণকে প্রশংসা করা হলে শিশু ভালো কাজগুলো বারবার করে। সে বুবাতে পারে যে কী কী পারে এবং তার মধ্যে কী কী গুণ আছে।
- শিশুকে শাস্তি না দেওয়া- শিশুর কাজের জন্য শাস্তি দিলে তা শিশুর উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। শাস্তি দুই ধরনের হয়- শারীরিক শাস্তি ও মানসিক শাস্তি। শারীরিকভাবে আঘাত করা, মারা, খেতে না দেওয়া ইত্যাদি শারীরিক শাস্তি। মানসিক শাস্তি হলো- শিশুকে নিয়ে খারাপ মন্তব্য করা, বকাবকি করা, দোষারোপ করা, মনোযোগ না দেওয়া, লজ্জা দেওয়া, ঘরে বৃদ্ধি করে রাখা ইত্যাদি। শিশুকে যে কোনো ধরনের শাস্তি দেওয়া হোক না কেন তা শিশুর আত্মবিশ্বাস কমায়, শিশু ভীত এবং লজ্জুক হয়ে বেড়ে উঠে। অনেক সময় বোঝাই যায় না যে, শিশুর প্রতি যে আচরণটি করা হচ্ছে, সেটা তার জন্য মানসিক শাস্তিস্বরূপ কি না। মানসিক শাস্তিতে শিশুর পরবর্তী জীবনেও খারাপ প্রভাব পড়ে। শিশুর কোনো আচরণ সংশোধনের প্রয়োজন হলে ওই নির্দিষ্ট আচরণ সম্পর্কে তাকে সতর্ক করতে হবে। আচরণটি কেন খারাপ, ওই আচরণের খারাপ ফলাফল তাকে বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।
- শিশুর জন্য হ্যাঁ বলা- অনেকে মনে করেন শিশুকে হ্যাঁ বলা অর্থ সে যে সকল কাজ করতে চায় বা যা কিছু চায় সব কিছু করার অনুমতি দেওয়া বা তাকে সব কিছু দেওয়া। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। শিশুকে হ্যাঁ বলা অর্থ শিশুকে ইতিবাচকভাবে পরিচালনা করা। শিশুদের প্রতি যে কোনো আদেশ অথবা নির্দেশ সব সময় ইতিবাচকভাবে বলা। নেতৃত্বাচক নির্দেশ না দেওয়া। আমরা সব সময়ই শিশু সম্পর্কে নেতৃত্বাচক মন্তব্য করি বা নির্দেশ দিয়ে থাকি। যেমন- এটা করো না, ওটা ধরো না, তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না ইত্যাদি। এই নির্দেশগুলোকে হ্যাঁ বোধকভাবে প্রকাশ করতে হবে। নিচে ইতিবাচকভাবে কথা বলার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো-
 ১. ‘টেবিলে কাঠের টুকরা রেখ না’ না বলে বলতে হবে ‘কাঠের টুকরাগুলো মাটিতে রাখ’।
 ২. এখন খেলার সময় নয়- না বলে বলতে হবে ‘এখন খেয়ে নাও পরে খেলবে’।
 ৩. মুখ ধূতে এত বেশি সময় নষ্ট করো না- না বলে বলতে হবে ‘তাড়াতাড়ি মুখ ধূয়ে নাও’।
 ৪. তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না- না বলে বলতে হবে ‘চেষ্টা করলেই তুমি পারবে’।

ইতিবাচক নির্দেশ নেতৃত্বাচক নির্দেশ অপেক্ষা কম প্রতিবাদ আনে, এতে কাজ ভালো হয়। বড়দের ইতিবাচক উক্তি, মন্তব্য শিশুকে নিজের প্রতি আস্থাশীল করে তোলে। সে সফল হওয়ার চেষ্টা চালায়। তাকে কাজ করতে উৎসাহিত করে।

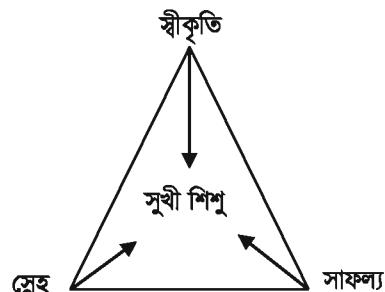
- শিশুর সাথে ভাব বিনিয়য়- শিশুর সাথে কথা বলার সময় গলার স্বর আস্তে ও নরম এবং ভাষা সহজ হতে হয়। জোড়ে ও কর্কশ স্বরে কথা বললে শিশু ভয় পায়, তাকে এড়িয়ে চলে। শিশুর সাথে কথা বলার সময় শিশুর মনের ভাব বুবাতে চোখে চোখ রেখে বন্ধুর মতো কথা বলতে হয়। তাহলে শিশুকে বোঝা সহজ হয়। শিশুর সাথে কথা বলতে একজন ভালো শ্রোতা হতে হয়। যেমন- মনোযোগ দিয়ে তার কথা শোনা, কথার মাঝে বাধা না দেওয়া, ভালোভাবে বোঝার জন্য প্রশ্ন করা ইত্যাদি।

- শিশুর জন্য আর্দশ পরিবেশ তৈরি - শিশু পরিচালনার অন্যতম একটি দিক হলো শিশুকে উপযুক্ত পরিবেশ দেওয়া। উপযুক্ত পরিবেশ পেলে শিশু কম বিরক্ত করে এবং সে তার সময় আনন্দে কাটায়। স্কুলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খেলাধুলাই শিশুর প্রধান কাজ। গৃহে শিশুর জন্য নিরাপদ খেলার স্থান ও খেলার সরঞ্জামের ব্যবস্থা থাকতে হয়। এ জন্য দামি খেলনা বা ব্যবহৃত উপকরণের প্রয়োজন হয় না। স্বল্প ব্যয়ে বা বিনা মূল্যে শিশুর খেলার উপকরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যেমন- গাছের পাতা, প্লাস্টিক সামগ্ৰী, কাগজের বাজ্জি ইত্যাদি। এ ছাড়া শিশুদের গান, ছড়া, গং শোনানো, তাদের সাথে খেলা করা, তাদের নতুন কিছু দেখতে, শুনতে, ধরতে, করতে, স্বাদ গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য বয়সোপযোগী সঠিক সরঞ্জাম সরবরাহ ও সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।
- শিশুর মনোস্তান্ত্বিক চাহিদা পূরণ করা- শিশু পরিচালনায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিশুর মনোস্তান্ত্বিক চাহিদা পূরণ করা ও শিশুকে সুখী করা। প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই মনস্তান্ত্বিক চাহিদা থাকে যেগুলোকে ইংরেজি three A's for happiness দিয়ে এবং বাংলায় সুন্ধের তৃতী 'স' দিয়ে বোঝানো হয়।

স- স্বীকৃতি A- Acceptance

স- স্নেহ A- Affection

স- সাফল্য A- Achievement



স্বীকৃতি- সকল শিশুর চেহারা বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি একরকম হয় না। কেউ যদি দেখতে সুন্দর হয় তবে সকলে তাকে সাদরে গ্রহণ করে। এখানে স্বীকৃতি অর্থ শিশু যেভাবে আছে সেভাবেই তাকে গ্রহণ করা বোঝায়। শিশুটি দেখতে ভালো বা খারাপ, পঙ্ক্তি বা স্বাভাবিক, বুদ্ধি কম বা বেশি, ছেলে বা মেয়ে যে অবস্থায় থাকুক তাকে সাদরে গ্রহণ করতে হবে। শিশুটি যেমন ঠিক তেমনভাবে তাকে গ্রহণ করা, তার গুণাবলিকে স্বীকৃতি দেওয়া ও সেতাবে উৎসাহ দিলে শিশু সুখী থাকে।

স্নেহ- প্রত্যেক শিশুর মধ্যে স্নেহ, মমতা, ভালোবাসার চাহিদা থাকে। শিশুর যত্ন, পরিচর্যা, তাকে সময় দেওয়া, কিছু শেখানো ইত্যাদি সবকিছুই যদি আদরের সাথে হয়, তাহলে শিশুর মধ্যে আস্থা ও নিরাপত্তার অনুভূতি আসে। তখন সে তার পরিবেশকে ভয় পায় না।

সাফল্য- প্রত্যেক শিশু সফলতা চায়। সে কোনো কাজ পারলে খুশি হয়। এ জন্য শিশুর ভালো কাজ বা কাজের ভালো দিকগুলো তুলে ধরা হলে সে নিজের শক্তিশালী বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারে বা বুঝতে পারে যে সে কি পারে। এই উৎসাহ তাকে সফলতার অভিজ্ঞতা দেয় এবং শিশুটি পরিতৃপ্ত ও সুখী থাকে।

কাজ ১- শিশুর বিকাশে প্রশংসনা ও শাস্তির ফলাফলের তালিকা কর।

কাজ ২- কয়েকটি নেতৃত্বাচক বাক্য ইতিবাচক ভাবে বুপান্তর কর। ক্লাসে তা পড়ে শোনাও।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। অঙ্গিটোসিন কী ?

- | | |
|---------------|-------------------|
| ক) কোষ | খ) হরমোন |
| গ) এন্টিবাড়ি | ঘ) শিশুর প্রথম মল |

২। বাবার দীর্ঘদিনের অসুস্থতায় ছেলেমেয়েরা—

- i. স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হতে পারে না।
- ii. ভীত ও হতাশাপ্রস্ত হয়ে পড়ে।
- iii স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

নিচের উচ্চীগুরুত্ব পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উভয় দাও :

চায়না যৌথ পরিবারের পৃষ্ঠিটি। সংসারের বেশির ভাগ কাজ তাকেই সামলাতে হয়। কাজ শেষে তিনি প্রায়ই দেখতে পান তার সাত মাস বয়সী শিশুটি ভেজা বিছানায় ঘুমিয়ে আছে।

৩। চায়নার সন্তানের মাঝে কিরূপ অনুভূতির সূচিটি হবে?

- | | |
|--------------|-----------------|
| ক) সন্তুষ্টি | খ) অনাস্থা |
| গ) সহানুভূতি | ঘ) নিরাপত্তাবোধ |

৪। পরবর্তী সময়ে চায়নার শিশুটি—

- i. প্রচল্ল আত্মবিশ্বাসের অধিকারী হবে।
- ii. হতাশাপ্রস্তভাবে বেড়ে উঠবে।
- iii আচরণগত সমস্যায় ভুগবে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

- ১। আট বছর বয়সী সেজান বরাবরই নিজ আগ্রহে পড়তে বসে। পড়া শেষে সে নিজ থেকেই বইগুলো ব্যাগে গুছিয়ে রাখে। বাবা বিষয়টি খেয়াল করে তাকে ধন্যবাদ দেয়। এক দিন সেজানের মা সেজানকে স্কুলে তার বন্ধুর সাথে ঝাগড়া করতে দেখেন। বাসায় ফিরে তিনি সেজানের কাছ থেকে ঝাগড়ার কারণ জেনে নেন এবং তাকে বন্ধুর সাথে মিলেমিশে চলতে বলেন। তিনি কখনো সেজানের সামনে কারও সাথে উচ্চ স্বরে কথা বলেন না এবং কারও প্রতি অশুন্দাপূর্ণ আচরণ করেন না।
- ক. কোন বয়সী শিশুর জীবনে কোনো অভিজ্ঞতা থাকে না ?
 খ. শিশুকে ইঁয়া বলার অর্থ বুঝিয়ে দেখ।
 গ. বাবার আচরণ সেজানের মাঝে কীরূপ প্রভাব ফেলবে ?
 ঘ. ভূমি কি মনে কর সেজানের বাবা-মা তাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করছেন ? উভয়ের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।
- ২। আজাদ রহমান ও সায়া হোসেনের মাঝে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে প্রায়ই কথা কাটাকাটি হয়। এমনি এক মুহূর্তে তাদের চার বছরের সন্তান ইনান মায়ের সাথে খেলা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। মায়ের কাছে সাড়া না পেয়ে সে বাবার কাছে বাইরে বেড়াতে যাওয়ার বায়না ধরে। বাবা তাকে ধর্ম দিয়ে চূপ করে বসে থাকতে বলেন। বিষয়টি খেয়াল করে দাদি তাকে গল্প শোনানোর কথা বলে কাছে ডেকে নেন। এমন ঘটনা ইনানের পরিবারে প্রায়ই ঘটে। এতে করে দাদির সাথে ইনানের বেশ ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠে।
- ক. শিশুর সুস্থিতা ও বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কী ?
 খ. শালদুধের উপকারিতা বুঝিয়ে দেখ।
 গ. ইনানের বিকাশের ক্ষেত্রে ওই পরিবারে দাদির ভূমিকা কীরূপ হয়েছে ব্যাখ্যা কর।
 ঘ. ইনানের পারিবারিক পরিবেশ তার যথাযথ বিকাশের অন্তরায়- বিশ্লেষণ কর।

অষ্টম অধ্যায়

কৈশোরের মনোসামাজিক সমস্যা-প্রতিকার ও প্রতিরোধ

পাঠ ১ ও ২ - কৈশোরকালীন মনোসামাজিক সমস্যা

১৮ বছরের মেয়ে রিদিতা। মা-বাবার একমাত্র সন্তান রিদিতা, মেধাবী ও প্রতিভাবান। মা-বাবা থেকে শুরু করে আত্মায়সজন সবাই রিদিতার বড় ধরনের সফলতা আশা করে। বাবা-মা তাদের একমাত্র সন্তানের সকল চাহিদা পূরণ করেন, শ্রেষ্ঠ হওয়ার সব রকম সুযোগ তৈরি করে দেন তারা। রিদিতা এখন প্রচণ্ড দুর্চিন্তাগ্রস্ত। মা-বাবার স্বপ্ন সে কি পূরণ করতে পারবে? সে কি পারবে সামনের ভর্তি পরীক্ষায় সফলতা আনতে? কিছুই তালো লাগে না তার। অল্পতেই রেগে যায়, অল্পতেই তার ঝুঁতি আসে। ইদানীং রাতের বেলায়ও ঘুম আসতে চায় না। প্রচণ্ড মাথা ব্যথায় সে ছটফট করে।

উপরের ঘটনাটিতে একটি কিশোরী মেয়ের শারীরিক ও মানসিক সমস্যার কথা বলা হয়েছে। এ ধরনের সমস্যাগুলোর মধ্য দিয়ে কৈশোরের মনোসামাজিক সমস্যার চিত্র ফুটে উঠেছে। তোমরা কি জানো মনোসামাজিক সমস্যা অর্থ কী? এসো আমরা বিস্তারিতভাবে এ সমস্যা সম্পর্কে জেনে নেই।

বেশির ভাগ কিশোর-কিশোরীরা বড় ধরনের সমস্যা ছাড়াই বয়ঃসন্ধিক্ষণ বয়স পার করে দেয়। কিন্তু কেউ কেউ আছে যারা সাংঘাতিকভাবে তাদের জীবনকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না, বরং তাদের সমস্যা তাদের পরিবারের সদস্য, প্রতিবেশী, সহপাঠী সবার জন্যই সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এগুলো পরোক্ষভাবে সমাজের সবাকেই প্রভাবিত করে। এ সমস্যাগুলোই মনোসামাজিক সমস্যা। কৈশোরের মনোসামাজিক সমস্যার মধ্যে পড়ে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ প্রবণতা, মাদকাস্তি, বিষণ্ণতা, স্কুল পলায়ন ইত্যাদি। যে ছাত্রাটি স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার আগেই স্কুল ত্যাগ করে, সে শুধু নিজের ভবিষ্যতই নষ্ট করে না, সমাজের জন্যও সে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

কৈশোরের মনোসামাজিক সমস্যা দুই ধরনের হয়। একটি অন্তর্মুখী ও অপরটি বহিমুখী। অন্তর্মুখী সমস্যায় সমস্যাগ্রস্ত ছেলেমেয়েরা নানা ধরনের মানসিক ও আবেগীয় জটিলতায় ভোগে। যেমন- হতাশা, উদ্বেগ ইত্যাদি। বাইরে থেকে এ ধরনের সমস্যার প্রকাশ কম থাকে অর্থাৎ তাদের দেখে হয়তো মনে হবে, সে খুবই স্বাভাবিক অবস্থায় আছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে খুব যন্ত্রণায় ভুগছে। আবেগীয় এসব সমস্যা পরবর্তীতে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার উৎপন্ন ঘটায়। যেমন- হতাশা ও বিষণ্ণতা থেকে খাদ্যে অনীহা, ঘুমের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

বহিমুখী সমস্যার ক্ষেত্রে সমস্যাগ্রস্ত ছেলেমেয়েদের সমস্যা তার আচরণে প্রকাশ পায়। বহিমুখী মনোসামাজিক সমস্যা হলো মাদকাস্তি, বিভিন্ন ধরনের অপরাধ প্রবণতা ইত্যাদি। সাধারণত পরিবারিক ব্রহ্মনের অভাব বা পরিবারের অতিরিক্ত প্রশ্রয় বহিমুখী সমস্যার উৎপন্ন ঘটায়। অপর দিকে মা-বাবার অতিরক্ষণশীলতা অন্তর্মুখী সমস্যার প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত। সব কিছুতেই শাসন, সন্তানকে সব সময় চোখে চোখে রাখা অতিরক্ষণশীল মা-বাবার বৈশিষ্ট্য। বহিমুখী ও অন্তর্মুখী উভয় ধরনের সমস্যা একটির সাথে অন্যটি সম্পর্কিত। যেমন- অনেকে অপরাধপ্রবণ বিষণ্ণতায় ভোগে, আবার হতাশাগ্রস্থ কিশোর মাদকাস্তি হয়ে পড়ে।

কিশোর অপরাধ-

মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হলো কৈশোরকাল। এ সময়ে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন খুব দ্রুত হয়। কৈশোরের একটি ছেলে বা মেয়েকে এই পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে হয়। কৈশোরকাল প্রাপ্ত বয়সে যাওয়ার সময়কাল। সাধারণত ১১ থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত কৈশোরকাল।

কৈশোরকালে কোনো ছেলে বা মেয়ে আইনবিরোধী কাজে লিপ্ত হলে তাদেরকে কিশোর অপরাধী বলা হয়। বাংলাদেশ শিশু আইন ২০১৩ অনুসারে কিশোর অপরাধীর ক্ষেত্রে অনুর্ধ্ব ১৮ (আঠার) বৎসর বয়সের মধ্যে কেউ সমাজবিরোধী কাজ করলে তাকে সংশোধনের জন্য বিশেষ বিচারের সামনে হাজির হতে হয়। কিশোর অপরাধ হলো অপরিণত বয়সে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা, আইনকানুবিরোধী আচরণ। প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য যে ধরনের কাজ শাস্তিযোগ্য অপরাধ, সে ধরনের কাজ কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত হলেই তা কিশোর অপরাধ। কিশোর অপরাধ প্রমাণিত হলে শাস্তির ব্যবস্থা থাকে না। তাদের আচরণ সংশোধনের জন্য সংশোধনী কেন্দ্রে রাখা হয়।

বয়স্কদের অপরাধ যেমন পরিকল্পিত থাকে কিশোরদের অপরাধ থাকে অপরিকল্পিত এবং সংখ্যায় অনেক বেশি। কিশোর অপরাধের যে ধরনগুলো আমাদের দেশে বেশি দেখা যায় তা হলো— স্কুল পলায়ন, মেয়েদের প্রতি অশোভন আচরণ, চুরি, ছিনতাই, খুন, ডাকাতি, মারামারি, মাদকদ্রব্য সেবন ইত্যাদি।

মনোস্তান্ত্বিকেরা কিছুটা ভিন্নভাবে কিশোর অপরাধীদের চিহ্নিত করেন। যেকোনো অগ্রহণযোগ্য কাজ তা আইনের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ না হলেও তা কিশোর অপরাধের মধ্যে পড়ে। যেমন— কারও জিনিস অন্যায়ভাবে নিজের দখলে রাখা, অন্যের সম্পত্তির ক্ষতি করা, অন্যের জীবনের জন্য বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা ইত্যাদি। এটা হতে পারে কোনো গাড়িকে টিল মেরে পালিয়ে যাওয়া, বিনা কারণে আগুন ধরিয়ে দেওয়া, শুধু মজা করার জন্য কোনো ক্ষতি করা, যে কোনো ধরনের অন্যায় আচরণ করাই কিশোর অপরাধের মধ্যে পড়ে।

অনেকে বয়ঃসন্ধি বয়সের আগে থেকেই অপরাধমূলক কাজ করে থাকে। তারা সাধারণত ৭/৮ বছর বয়স থেকে ধারাবাহিকভাবে অপরাধ করে। যেমন— মারামারি করা, অন্যের জিনিস নষ্ট করা, চুরি করা ইত্যাদি। এ ধরনের অপরাধের কারণ হিসেবে মানসিক সমস্যা বা বিপর্যয়কে দায়ী করা হয়। কিশোর অপরাধের উপর দীর্ঘদিনের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, যারা ছোট বেলা থেকে অপরাধমূলক কাজে অভ্যস্ত থাকে তারা বড় হয়েও অপরাধমূলক কাজ করে থাকে। তাদের সম্পর্কে গবেষকদের আরও অভিমত –

- এই ধরনের অপরাধীদের মধ্যে মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের সংখ্যা বেশি থাকে।
- এদের মধ্যে বেশির ভাগ পরিবার দরিদ্র কিংবা তগু পরিবার অর্থাৎ পরিবারে মা-বাবার বিবাহ বিচ্ছেদ বা পৃথক বসবাস করা।
- এইসব কিশোর অপরাধীর মা-বাবার শিশু প্রতিপালন পদ্ধতি সঠিক না। তাদের পরিবারের শৃঙ্খলার অভাব, সন্তানদের প্রতি মা-বাবার অবহেলা থাকে।
- এ ধরনের অপরাধের জন্য বংশগত কারণকেও দায়ী করা হয়; অর্থাৎ পরিবারের বাবা বা অন্য সদস্যরাও অপরাধী হয়ে থাকে।
- অনেক সময় অপরাধীরা অপরাধ জগৎ থেকে বের হতে পারে না। সে জন্য তা স্থায়ী হয়ে যায়।

যারা কৈশোরের আগে থেকে অপরাধমূলক কাজের সাথে জড়িত তাদের ছোটবেলা থেকেই কিছু লক্ষণ থাকে। তারা সমবয়সীদের তুলনায় স্কুলে অমনোযোগী থাকে, তাদের বুদ্ধাংক বা আই কিউ কম থাকে, তাদের সমবয়সীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকে না। এসব লক্ষণ একটি ছোট শিশুর কিশোর অপরাধী হওয়ার আশঙ্কা বাড়ায়।

আঁত্রেক ধরনের অপরাধী আছে যারা কিশোর বয়সে এসে অপরাধ অঙ্গতে থাবেন করে। তারা সমবর্সী দলের চাপে গড়ে অপরাধী হয়। এদের অপরাধ প্রবণতা ততটা গুরুতর হয় না। এরা সমবর্সীদের সাথে দলে অপরাধমূলক কাজ করে।

এদের সম্পর্কে পৰেষণার ফলাফল হলো—

- এ ধরনের কিশোরদের মা-বাবা তাদের সম্মানদের পরিচালনায় ততটা সচেতন না।
- দলে থেকে তারা অপরাধ ঘটিয়।
- মধ্য কৈশোরে অপরাধের মাঝা খুব বেশি থাকে।
- কৈশোরের পেছের দিকে তা চলে যাব।

প্রতিকার-প্রতিরোধ

যে কোনো সমস্যা প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উচ্চত। কোনো সমস্যা তৈরি হওয়ার পর সমাধান করা হলো প্রতিকার করা। সমস্যাটির বেল উচ্চ না হয় তাম জন্য ব্যবস্থা গুরুতর হলো প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

আমাদের দেশে কিশোর অপরাধ প্রতিকারে অপরাধী কিশোরীদের জন্য সহশোধনী প্রতিষ্ঠান আছে। এসব প্রতিষ্ঠানে অপরাধের মাঝা অনুবাদী— সমবর্সীয়া নির্ধারণ করা হয়। অপরাধীকে খই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সহশোধনী প্রতিষ্ঠানে রাখা হয়। সহশোধনী প্রতিষ্ঠানে সাধারণ পিছার পাশাপাশি বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকে। যেমন— সেলাই এর কাজ, কাঠের কাজ, অটো মোবাইলের কাজ ইত্যাদি। এসব প্রশিক্ষণের উচ্চেশ্য থাকে কিশোর হেলে যেনেরা তাদের সহশোধকালীন শেষ হওয়ার পর বাড়িতে কিয়ে যেন আত্মনির্ভরশীল হতে পারে, তারা জীবিকার জন্য উপর্যুক্ত করতে পারে। প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালীন তাদের নিরাম যেনে চলতে হয়। প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানক অপরাধী হেলেয়েরদের পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করেন এবং প্রতিষ্ঠান থেকে ছুটি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।



প্রতিরোধ কার্যক্রম

কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে কিছু করণীয় হলো—

- প্রতিটি পরিবারে সম্মানের সাথে মা-বাবার ব্যবহৃত দৃঢ় করতে হবে।
- পরিবারের প্রত্যেক সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক তৈরি করতে হবে। তাদের মধ্যে সম্পর্কের দূরত্ব ধাকবে না।
- পরিবারের ভাঙ্গন গ্রাহ করতে হবে। মা-বাবার মধ্যে সমর্থোভাব সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।
- সম্মান প্রতিপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বিদ্যালয়ে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হলে তা সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে। পরিবার ও স্কুল কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে ছাত্র-ছাত্রীর যেকোনো সমস্যা সমাধান সহজ হবে।

কিশোর অপরাধ থেকে মুক্ত থাকার জন্য কিশোরদের নিজেদেরও কিছু করণীয় থাকে। প্রথমত কৈশোরের হেসে-মেরেকে তার বন্ধুদের অপরাধমূলক কাজকে উৎসাহ দেওয়া থেকে বিজ্ঞত থাকতে হবে। ফিল্মত, যেজায়েশের জন্য তালো বন্ধুদের নির্বাচন করতে হবে। আইন বা নিয়ম তাজকারীকে খারাপ বন্ধু হিসেবে চিনে নিতে হবে।

মা-বাবাকে সন্তানের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে যেন সন্তান অপরাধমূলক কোনো কাজে জড়িয়ে পড়ার সুযোগ না পায়। সব সময় অপরাধ অভিযন্তের খারাপ দিকলুঙ্গে সন্তানের সামনে ভুল ধরতে হবে। তারা যেন এর ভয়াবহতা উপরিক করতে পারে এবং তবিষ্যতে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকে। মা-বাবা ও সন্তানের সমর্ক বন্ধুর মতো হলে কৈশোরের সমস্যা অনেক কম হয়।

কার ১ – আয়াদের দেশে বিদ্যমান কিশোর অপরাধের কাইলঙ্গুলো কী কী?

কার ২ – কিশোর অপরাধ প্রতিক্রিয়া করণীয় বিদ্যমানের ভালিকা কর।

পাঠ ৩ – হতাশা ও বিপ্লবীতা

তোর রাতে শুধু কেজেছে স্বপ্নোর। কিছু এখন পর্যন্ত কিছুনাম শুনে আছে সে। আজের ভাকে বিজ্ঞত হয়, যেজোর করে। নবম শ্রেণির ছাত্রী স্থানে কিছুদিন হলো স্কুলে থাকে না। সরা দিন নিজের ঘরে থাকে। বাল্যবীণের বৌজ দের সা। কেনো কাজেই আসন্দ পায় না। টেলিভিশনের সিরিয়াল দেখার আগ্রহেও তার মধ্যে দেই। স্বপ্নের বৈশিষ্ট্য এমন হিল না। হাসি-খুশি স্বপ্ন বদলে গেছে।



কৈশোরে বিপ্লবীতা

আয়াদের দৈনন্দিন জীবনে নানা ঘটনার মন খারাপ হওয়া, কাজ করতে ইচ্ছা না করা খুবই স্থান্তরিক। কিছু যথেন এ গ্রন্থ মনের অকর্ষা কয়েক সন্তাহ থেরে চলতে থাকে এবং তা শয়ীয়কেও প্রভাবিত করে তখন সেটা দুশ্মিতার বিষয় হয়ে দাঢ়ার। বিপ্লবীতা এক ধরনের যানসিক অকর্ষা বেখানে মনের অসুবৰ্ণ ও একদেরেমির অনুভূতি থাকে। এর ফলে দৈনন্দিন স্থান্তরিক কাজের আরাহ থাকে না এবং সে হতাপ্য হওয়াতে থাকে। খোঁজে অনীহা, চুমের ব্যাধাত ইত্যাদি ধরনের শায়ীরিক উপসর্গ দেখা দিতে পারে। উপ্পিত্বিত ঘটনার স্বপ্নের মধ্যে হতাশা ও বিপ্লবীতার লক্ষণ স্পষ্ট থাকা গড়ে।

বিষন্নতা গুরুতর হলে নিচের লক্ষণ দেখা দেয়—

- দিনের বেশির ভাগ সময় মন খারাপ থাকা বা বিরক্তির অনুভূতি থাকা
- আনন্দময় কোনো কাজে আগ্রহ করতে থাকা
- উজ্জন করে যাওয়া বা দৈহিক শক্তি করে যাওয়া
- ঘুমের ব্যাধাত হওয়া। ঘুমের স্থায়িত্ব বজায় থাকে না, বারবার ঘুম ভেঙে যায়, ঘুম আসতে চায় না বা তোর রাতে ঘুম ভেঙে যায় ইত্যাদি
- শ্বেত করে যাওয়া, খাবারের আগ্রহ করে যাওয়া
- মনোযোগের অভাব, উদ্বেগ বেশি হলে কোনো কিছু মনে রাখতে না পারা
- নিজের ক্ষতির চিন্তা করা, আত্মহত্যার পরিকল্পনা করা।

ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের মধ্যে বিষন্নতা বেশি দেখা যায়। গবেষণায় দেখা গেছে কৈশোরের বিষন্নতার সাথে শিশুকালের মানসিক অবস্থার বিশেষ সম্পর্ক আছে। যে ধরনের পরিবারে শৈশবে সন্তান ও মা-বাবাৰ দৃঢ় বন্ধন থাকে না, শিশু প্রতিপালনে স্নেহ আদরের বক্ষনা থাকে এবং পরিবারের মা বা বাবা যে কোনো একজনের মৃত্যুতে নেতৃত্বাচক মানসিক কাঠামো তৈরি হয়। এসব পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে হতাশা ও বিষন্নতার সন্তুলনা থাকে।

হতাশা ও বিষণ্ণতার কারণ

- শিশু প্রতিপালনে অতিরিক্ত কঠোরতা বিষন্নতা আনতে পারে। সেখানে স্বাধীন ব্যক্তিসন্তা গড়ে উঠে না। তারা নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, আত্মবিশ্বাস হারায়। এ ধরনের পরিবারের ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন কারণে হতাশাগ্রস্ত থাকে, নিজেকে অপরাধী মনে করে।
- পরিবারের বাবা-মায়ের দার্শনিক কলহ, বিবাহ বিচ্ছেদ সন্তানদের মধ্যে বিষন্নতা সৃষ্টি করে। পরিবারের আর্থিক সংকট কৈশোরে ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিষণ্ণতা আনে।
- সমবয়সীদের সাথে সম্পর্কের অবনতি, ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে মনোমালিন্য, বন্ধু কর্তৃক প্রত্যাখ্যান, বন্ধুত্বের ভাঙ্গন বিষন্নতার সৃষ্টি করে।
- পড়াশোনায় ব্যর্থতা ও অতিরিক্ত মানসিক চাপে বিষণ্ণতা দেখা দিতে পারে।

প্রতিকার-প্রতিরোধ

বিষন্নতায় ছেলেমেয়েরা নিজেকে খুব একা, অসহায় মনে করে। সামান্য কারণেই তারা ফেঁদে ফেলে, তারা কর্ম দক্ষতা হারায় এবং গুরুতর হলে আত্মহননের চিন্তা করে থাকে। এভাবে বিষন্নতায় অত্যন্ত ভয়াবহ পরিণতির সৃষ্টি হতে পারে। বিষণ্ণতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে করণীয় বিষয়গুলো হলো—

- যে কোনো পরিস্থিতিকে ইতিবাচকভাবে মূল্যায়ন করতে শেখা।
- যে কোনো ঘটনার ভালো দিকগুলো খুঁজে পেতে শেখা।
- জটিল অবস্থা মেনে নেওয়ার ধৈর্য তৈরি করা। নিজের চিন্তা, অনুভূতি বাবা-মা বা নির্ভরযোগ্য কারণে কাছে প্রকাশ করা।
- শখ, বিনোদন, সৃজনশৰ্মী কাজ, খেলাধুলায় নিজেকে ব্যস্ত রাখা।

- অন্য কারণ বিষণ্ণতায় তাকে সঙ্গ দেওয়া, তার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া। সে যেন তার ব্যক্তিগত অনুভূতি অন্যের কাছে প্রকাশ করতে পারে তার সুযোগ সৃষ্টি করা।

কাজ - বিষণ্ণতার কারণগুলো উল্লেখ কর। এর পাশাপাশি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ কর।

পাঠ ৪ – মানসিক চাপ

দৈনন্দিন জীবনে নানা কারণে আমাদের মন খারাপ হয়। কখনো অন্য কারণ কাটু কথা বা অগ্রিভিকর আচরণে আমরা মনে কষ্ট পাই। নিজের ইচ্ছা বা চাহিদা পূরণ না হলে আমাদের মন খারাপ হয়। আবার কোনো দুঃস্থিতাদ বা ঘটনা আমাদের মন কষ্টের কারণ হয়। এই মনের কষ্ট থেকেই সৃষ্টি হয় মানসিক চাপ। মানসিক চাপ এক ধরনের বেদনাদায়ক ও অস্বস্থিকর আবেগীয় অবস্থা, যা আমাদের মনে দুর্দশ ও হতাশার সৃষ্টি করে। ফলে আমরা অস্থির ও উল্লেজিত হই এবং শরীরের অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য নষ্ট হওয়ায় আমরা মানসিক চাপ অনুভব করি। এই চাপ কখনো তীব্র আবার কখনো মৃদু হয়। মানসিক চাপ ইতিবাচক বা নেতিবাচক হতে পারে।

ইতিবাচক চাপ- দৈনন্দিন জীবনে আমাদের অনেক মানসিক চাপ মোকাবিলা করতে হয়। একে যদি আয়স্তাধীন রাখা যায় বা নিয়ন্ত্রণ করা যায় তবে এই চাপ অনেক সময় আমাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে ও সাফল্য বৃঞ্চিত আনে। যেমন— পরীক্ষার সময় যে মানসিক চাপ সৃষ্টি হয় তা পড়াশোনায় মনোযোগ বৃদ্ধি করে।

আবার চাকরির ইষ্টারিভিট বা নতুন চাকরি, বিভিন্ন কাজ বা অনুষ্ঠান আয়োজনের দায়িত্ব আমাদের ইতিবাচক মানসিকচাপ সৃষ্টি করে।

নেতিবাচক চাপ- মানুষের মনের মধ্যে এমন কিছু চাপ মাঝে মধ্যে দেখা দেয় যা স্থায়ীক চাপ সৃষ্টি করে। ফলে মনের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এটাই নেতিবাচক চাপ। এই চাপ আমরা সহজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। আমাদের সূস্থ স্বাভাবিক জীবনে প্রতিক্রিয়কতার সৃষ্টি করে বা হস্পতন ঘটায়।

নেতিবাচক চাপ আমাদের নানা শারীরিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। যেমন—

- বৃক ধড়ফড় করা, হাত-পা কাঁপা, জিহ্বা শুকিয়ে আসা, অস্থিরভাব, উল্লেজনা বোধ, আচরণে বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।
- দীর্ঘমেয়াদি ও তীব্র মানসিক চাপ শরীরে বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। যেমন— হৃদরোগ, উচ্চরক্তচাপ, অৃতিশক্তি হ্রাস, ক্ষুধামন্দা, নিদ্রাহীনতা ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি করে।

মানসিক চাপ আমাদের জীবনে প্রায়ই দেখা যায়। নিচের

দুইটি ঘটনা থেকে তা সহজেই বোঝা যায়।

শিক্ষক শক্ষ করলেন ক্লাসে মিলা মন খারাপ করে বসে আছে। শিক্ষক কারণ জানতে চাইলে মিলা কেবলে ফেলে। সে জানায় তার ছেট ভাই খুব অসুস্থ। ডাঙ্কার দেখানো হয়েছে কিন্তু জ্বর তালো হচ্ছে না। সে তার ভাইকে নিয়ে খুব দুঃখিতায় আছে। ফলে সে পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারছে না।



মিলা দুঃখিতায় আছে

রফিক নবম শ্রেণির ছাত্র। তার বাবা নেই। সৎসারে অনেক অভাব। তাই সে পড়াশোনার পাশাপাশি একটি বইয়ের দোকানে কাজ করে। তার পড়াশোনা করার খুব ইচ্ছা। আর্থিক অনটনের কারণে সে সব সময় চিন্তা করে কীভাবে তার পড়াশোনা চালিয়ে যাবে।

মানসিক চাপ সহ্য করার ক্ষমতা সবার এক রকম নয়। আবার চাপের প্রতি প্রতিক্রিয়াও সবার এক রকম নয়। চাপের সময় অনেকে ধীরস্থির ও শান্ত থাকে। অনেকে চাপের মুখে অস্থির ও উত্তেজিত হয়ে পড়ে। মানসিক চাপের সাথে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, বয়স, মানসিক গঠন, সম্মানবোধ ইত্যাদি বিষয়গুলো ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।

মানসিক চাপের কারণ— নানা কারণে মানসিক চাপ সৃষ্টি হতে পারে।

- কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা দুঃসংবাদ।
- পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, দরিদ্রতা, বঞ্চনা, দুঃখ-বেদনা, নিরাপত্তার অভাব।
- সামাজিক উৎপীড়ন, সামাজিক বৈষম্য, নৈতিকতার অবক্ষয়।
- নিজের ইচ্ছা বা বাসনা পূরণ না হওয়া।
- ক্রমাগত কাজের চাপ।
- পরীক্ষার সময় পর্যাপ্ত প্রস্তুতি না থাকা।
- সব সময় আতঙ্কগ্রস্থ থাকা।

মানসিক চাপ থেকে নিজেকে রক্ষার উপায় —

- যে কোনো বেদনাদায়ক অবস্থায় বা দুর্ঘটনায় মনোবল বজায় রাখতে হবে।
- ধৈর্যধারণ করতে হবে। ধৈর্যধারণ করা মানুষের একটি বড় গুণ।
- পারিবারিক কোনো বিষয় মানসিক চাপের কারণ হলে, পরিবারের সবাই আলোচনা করে তা মোকাবিলা করতে হবে।
- কারণ কোনো বৈষম্যমূলক আচরণে মন খারাপ হলে, তার সাথে কথা বলে নিজের মনের অবস্থা বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে।
- পরীক্ষায় খারাপ করে যাতে হতাশায় পড়তে না হয় সেজন্য সময়মতো ভালোভাবে পড়াশোনা করতে হবে।
- সময় পরিকল্পনা বা কর্মপরিকল্পনা করে চললে সময়মতো সব কাজ শেষ হবে ফলে মানসিক চাপ সৃষ্টি হবে না এবং জীবনে সাফল্য আসবে।
- মনে যদি কোনো আতঙ্ক, ভয় বা দুর্ভাবনার সৃষ্টি হয় তা থেকে মুক্তির জন্য বিষয়টি নিয়ে বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য বক্ষু-বান্ধব, আনন্দীয়-স্বজন, শিক্ষকের সাথে আলাপ করতে হবে।
- বক্ষু নির্বাচনে সতর্ক হতে হবে। ভালো ও সৎ মানুষের সাথে বক্ষুত্ব করতে হবে।
- কেউ বিরক্ত করলে বা অযৌক্তিক কোনো কথা বললে দৃঢ়তার সাথে তা মোকাবিলা করতে হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কৈশোরকালের বয়সসীমা কতো বছর ?

- | | |
|------------|------------|
| ক) ৮ - ১৬ | খ) ৮ - ১৮ |
| গ) ১১ - ১৮ | ঘ) ১৬ - ১৮ |

২। কৈশোরে মনোসামাজিক সমস্যার মধ্যে পড়ে কোনটি ?

- | | |
|-------------------|-------------|
| ক) খাদ্যে অনীহা | খ) বিষণ্ণতা |
| গ) ঘুমের ব্যায়াত | ঘ) ক্লান্তি |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

৯ম শ্রেণির ছাত্র সুমন। সে ক্লাসে অমনোযোগী। মা-বাবার চাইতে বন্ধুদের কথার গুরুত্ব দেয় বেশি। মা কিছু বললে সে ঘরের জিনিসপত্র ভাঙ্চুর করে।

৩। সুমনের মধ্যে কোন সমস্যার লক্ষণ দেখা দিয়েছে ?

- | | |
|----------------|----------|
| ক) বিষণ্ণতা | খ) ক্রোধ |
| গ) কিশোর অপরাধ | ঘ) উৎসব |

৪। কীভাবে এই পর্যায় থেকে সুমনকে বের করে আনা সম্ভব—

- i. ভালো বন্ধু নির্বাচনের মাধ্যমে
- ii. অপরাধমূলক কাজে উৎসাহ না দেয়া
- iii. সন্তানের সাথে মা-বাবার দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১। ইমনের বয়স ১৩ বছর। সে মাঝে মাঝে স্কুল পালায়, ক্লাসে সে অমনোযোগী। তার স্কুলের শিক্ষক তাদের বাড়িতে এসে জানতে পারেন ইমনের বাবা-মা আলাদা বসবাস করেন।

- ক. প্রতিরোধ ব্যবস্থা কী ?
- খ. কৈশোরে খাবারে অনাসক্তির কারণ ব্যাখ্যা কর।
- গ. ইমনের বয়সী ছেলেমেয়েদের অপরাধী হয়ে উঠার কারণ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ইমনকে এই অবস্থা থেকে বের করে আনা সম্ভব কি না—উত্তরের স্পষ্টে যুক্তি দাও।

ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ

ପ୍ରତିବନ୍ଧୀ ଶିଶୁ



ପାଠ ୧— ପ୍ରତିବନ୍ଧୀ ଶିଶୁ

ଏକଟି ସୁଖ ଶିଶୁ ସବାରଇ କାମ୍ୟ । ପରିବାରେ ଏମନ କିଛୁ ଶିଶୁ ଦେଖା ଯାଉ ଯାଦେର ଶାରୀରିକ ଗର୍ଭନ ସ୍ଵାଭାବିକ ନୟ, ହାତ ବା ପା ନେଇ, କାନେ ଖୋଲେ ନା, ଫଳେ କଥା ବଲାତେ ପାରେ ନା । ଅନେକେ ଚୋଥେ ଦେଖେ ନା ବା କମ ଦେଖେ । ବୁନ୍ଦିମନ୍ତା କମ, ଫଳେ ଏରା ସାମାଜିକ ଆଚରଣ ଓ ଭାବ ବିନିମୟ ଟିକମତୋ କରାତେ ପାରେ ନା । ଏରାଇ ପ୍ରତିବନ୍ଧୀ ଶିଶୁ । ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧୀ ଶିଶୁରୁ ଆମାଦେର ସମାଜରେ ଏକଙ୍ଗ, ତାଇ ଏଦେର ସଂଶ୍କରେ ଆମାଦେର ଜୀବା ଦରକାର । ପ୍ରତିବନ୍ଧୀ ଶିଶୁ ସଂଶ୍କରେ ଧାରଣା ଥାକଲେ ତାଦେର ପ୍ରତି ସବାର ଇତିବାଚକ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହବେ, ପ୍ରତିବନ୍ଧୀ ଶିଶୁଟିଓ ନିଜେକେ ସବାର ଥେକେ ଆଲାଦା ବା ଅସହାୟ ମନେ କରାବେ ନା ।

ପ୍ରତିବନ୍ଧିତାର କାରଣ : ବିଭିନ୍ନ କାରଣେ ଏକଟି ଶିଶୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧୀ ହତେ ପାରେ । ସେମନ – ୧ । ଜନ୍ମେର ପୂର୍ବକାଲୀନ କାରଣ ୨ । ଶିଶୁ ଜନ୍ମେର ସମୟେର କାରଣ, ୩ । ଶିଶୁ ଜନ୍ମେର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାରଣ

୧ । ଜନ୍ମେର ପୂର୍ବକାଲୀନ କାରଣ –

ଶିଶୁ ସଥିନ ମାଝେର ଗର୍ଭ ଧାକେ ତଥନ ମାଝେର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଓ ଗର୍ଭର ପରିବେଶ ଶିଶୁର ବିକାଶକେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ଗର୍ଭବିଷ୍ଯାଯୀ ନାନା କାରଣେ ଶିଶୁର ସ୍ଵାଭାବିକ ବିକାଶ ବ୍ୟାହତ ହତେ ପାରେ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧୀ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ହତେ ପାରେ । କାରଣଗୁଲୋ ହଜ୍ଜେ –

- ମାଝେର ଔଗସମୂହ – ଗର୍ଭବିଷ୍ଯାଯ ପ୍ରଥମ ତିନ ମାସେ ମା ଯଦି ଜାର୍ମାନହାମ, ଚିକିତ୍ସାକୁ, ମାୟପୁର, ସଞ୍ଚାର, ମ୍ୟାଲେରିଆ, ବୁବେଳା ଭାଇରାସ, ଏଇଡ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟାହାର ଆହୁମ୍ବତ ହନ ତବେ ଗର୍ଭବିଷ୍ଯାଯ ଶିଶୁର ଉପର ତାର ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକର ହୁଏ ।

এর ফলে শিশু শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ ও মানসিক প্রতিবন্ধী হতে পারে। এ ছাড়া মায়ের ডায়াবেটিস, উচ্চরক্ত চাপ, কিডনির সমস্যা, থাইরয়েড গ্রন্থির সমস্যা প্রভৃতি শারীরিক অবস্থায় গর্ভস্থ শিশু প্রতিবন্ধী হতে পারে।

- মায়ের অপুষ্টি – গর্ভবতী মা যদি দীর্ঘদিন যাবৎ রক্তাঙ্গতায় ভোগেন, পর্যাপ্ত পুষ্টির খাবার না খান তবে ভুগের গঠনগত বিকলাঙ্গতা দেখা দেয়, মিতিষ্কের বিকাশ ব্যাহত হয়, ফলে শিশু প্রতিবন্ধী হয়।
- উষ্ণ গ্রহণ – গর্ভবস্থায় মা যদি চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া উষ্ণ খান, তা শিশুর জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হতে পারে। অনেক উষ্ণ ভুগের অঙ্গ স্ফুরিতে বাঁধার স্ফুর করে। ফলে শিশু যে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধিতা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করতে পারে।
- মায়ের বয়স – গর্ভধারণের সময় মায়ের বয়স কম বা বেশি দুটিই শিশুর জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। অপরিণত বয়সে প্রজনন অঙ্গের বিকাশ সম্পূর্ণ হয় না। তাই অপরিণত বয়সে মা হলে ত্রুটিপূর্ণ শিশু জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার বেশি বয়সে অন্তঃক্ষেত্র গ্রন্থির স্বাভাবিক কার্যবলি হ্রাস পায়। তাই ৩৫ বৎসরের পর যে সব মহিলা প্রথম সন্তান জন্ম দেন, সে সব শিশু প্রতিবন্ধী হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে।
- ঘন ঘন খিচুনি – গর্ভবস্থায় মা যদি ঘন ঘন খিচুনি রোগে আক্রান্ত হন তবে গর্ভস্থ শিশুর শরীরে অঙ্গিজেনের অভাব ঘটে ও তার মিতিষ্কের ক্ষতি করে। ফলে শিশু মানসিক প্রতিবন্ধী হতে পারে।
- নিকট আআইয়ের মধ্যে বিবাহ – আপন মামাতো, খালাতো, ফুফাতো, চাচাতো ভাইবোন যাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক আছে তাদের মধ্যে বিবাহ হলে শিশু প্রতিবন্ধী হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
- তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রবেশ – গর্ভবস্থায় বিশেষত প্রথম তিন মাস এক্স-রে বা অন্য কোনো ভাবে মায়ের দেহে যদি তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রবেশ করে তবে গর্ভস্থ ভুগের ন্যার্ভাতত্ত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে শিশু মানসিক প্রতিবন্ধী হয়।
- মা-বাবার রক্তের Rh উপাদান – মা যদি Rh পজেটিভ আর বাবা যদি Rh নেগেটিভ হয় তা হলে গর্ভস্থ সন্তানের Rh পজেটিভ বা নেগেটিভ হতে পারে। মা ও সন্তানের Rh উপাদানের মধ্যে যদি মিল না থাকে তবে তাকে Rh অসংগতা বা Rh incompatibility বলা হয়। এতে মৃত সন্তান হয়। আর যদি শিশু বেঁচে যায় তাহলে পক্ষাঘাতগ্রস্ত বা মিতিষ্কের ত্রুটি নিয়ে জন্মায়।

২। শিশু জন্মের সময়ের কারণসমূহ –

- শিশুর জন্ম সময়কাল দীর্ঘ হলে, শিশুর গলায় নাড়ি পেঁচানের কারণে বা শিশু জন্মের পর পরই শ্বাস নিতে অক্ষম হলে অঙ্গিজেনের স্বল্পতার জন্য মিতিষ্কের কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে শিশু বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হয়।
- জন্মের সময় মিতিষ্কে কোনো আঘাত, যেমন – পড়ে যাওয়া বা মাথায় চাপ লাগা ইত্যাদি প্রতিবন্ধিতার কারণ হতে পারে।

৩। শিশু জন্মের পরবর্তী কারণসমূহ –

- নবজাতক যদি জন্মস্থে আক্রান্ত হয় এবং রক্তে যদি বিলিয়ুবিনের মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায় তবে মিতিষ্কে কোষের ক্ষতি হয় এবং শিশু মানসিক প্রতিবন্ধী হয়।
- শৈশবে শিশু যদি হঠাত করে পরে যায়, মিতিষ্কে আঘাত পায় বা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয় তবে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

- পরিবেশের বিষাক্ত পদার্থ, যেমন— পোকামাকড় ধরনে করার রাসায়নিক পদার্থ, ফ্লোরাইড, আর্সেনিক মিশ্রিত পানি ইত্যাদি শিশুর শরীরে প্রবেশ করলে বিবর্কিয়ার সূচি হয় এবং শিশু প্রতিবন্ধী হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
- শিশুর শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য বিভিন্ন প্রকার পুষ্টিকর উপাদানের প্রয়োজন হয়। পুষ্টিকর উপাদানের অভাবে শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ ব্যাহত হয় এবং শিশু মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী হতে পারে।

কাজ – শিশুর জন্য পরবর্তী প্রতিবন্ধিতা ক্রান্তে ভূমি কীভাবে তোমার এলাকার জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করবে?

পাঠ ২ – প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ

শিশু জন্য গ্রহণের পর পরই যদি প্রতিবন্ধিতা শনাক্ত করা যায় তবে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতা ছাড় করা সম্ভব অথবা মারাত্মক প্রতিবন্ধিতা থেকে শিশুকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। অতি শৈলৈবে শিশুর ইটা, চলা, বসা, কথাবলা ইত্যাদি বিষয়গুলো যদি যথাযথভাবে না হয় তবে বুঝতে হবে শিশুর মধ্যে প্রতিবন্ধিতার আশঙ্কা আছে। আবার শিশু যদি কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা বোধ করে, অমনোযোগী হয়, অবাধিত আচরণ করে তাহলেও প্রতিবন্ধিতার আশঙ্কা থাকতে পারে। বিষয়টি সম্পর্কে নিচিত হওয়ার জন্য অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

শারীরিক প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ – বেশির ভাগ শারীরিক প্রতিবন্ধিতা শিশু জন্মের পর চোখে দেখেই বোঝা যায়। আবার কিছু শারীরিক প্রতিবন্ধিতা শিশুর বেড়ে উঠার সাথে সাথে প্রকাশ পায়।

ঠোট কাটা – উপরের ঠোট ঠিকমতো গঠিত হয় না। ঠোটে ফাঁকা থাকে। ফলে শিশুর খাদ্য গ্রহণে ও কথা বলতে সমস্যা হয়।



ঠোট কাটা

মুগুর পা

কাটা তালু – মুখের ডিতরের উপরের দিকে তালুর হাড় ও মাস্পেশি ঠিকমতো গঠিত হয় না। ফলে খাদ্য গ্রহণ, কথা বলা এবং শোনার ক্ষেত্রেও সমস্যা হয়।

মুগুর পা – একটি বা উভয় পা ডিতর বা পিছন দিকে বাঁকানো থাকে।

স্টাইনা বিফিটা – মেরুদণ্ডের হাড় (কশেরুকা) ঠিকমতো জোড়া লাগে না। ফলে মেরুরজ্জু পিঠের দিকে থলির মতো ফ্লে উঠে। ইঁটাচলায় সমস্যা হয়।

সেরেব্রাল পঙ্গসি – জন্মের সময় শিশুকে অনেক সময় শিথিল বা নেতানো মনে হয়। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে অন্য শিশুদের মতো হাত-পা নাড়াচাড়া করতে পারে না। মাথা তোলা, বসা ইত্যাদি খুব ধীরগতিতে হয়। দুধ চুষতে ও গিলতে অসুবিধা হয়।

শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের অনুপস্থিতি বা গঠন বিকৃতি – শিশু শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের অনুপস্থিতি বা অসম্পূর্ণতা নিয়ে জনগ্রহণ করে। অর্থাৎ হাত-পা, আঙ্গুল থাকে না বা গঠন অসম্পূর্ণ থাকে। দেহের গঠনও বিকৃত হতে পারে।

বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ – বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা হচ্ছে এক ধরনের অক্ষমতা এবং এই অক্ষমতাটি শ্যামী প্রকৃতির। বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতার কোনো চিকিৎসা নেই। তবে যত্ন ও শিক্ষণের মাধ্যমে অনেক শিশুর আচরণের উন্নয়ন ঘটানো যায়। তাই আমাদের উচিত দুত শনাক্ত করে শিশুর যথাযথ যত্ন ও শিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং শিশুর প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ করা। তবে সব বুদ্ধি প্রতিবন্ধীরা একই ধরনের নয়।

নিম্নলিখিত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখে সাধারণভাবে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশু শনাক্ত করা যায়।

- ইঁটা, চলা, বসা, কথা বলা ইত্যাদি বিকাশগুলো বয়সের তুলনায় কম হয়।
- কোনো বিষয়ে শিশু মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না।
- কোনো নির্দেশনা সহজে বুঝতে পারে না। একই নির্দেশনা বার বার দিতে হয়।
- শিশু কোনো শিক্ষণ সহজে গ্রহণ করতে পারে না। এমনকি মল-মূত্র ত্যাগের শিখনও সহজে গ্রহণ করতে পারে না।
- সূক্ষ্ম কোনো কাজ করতে পারে না। অবাঞ্ছিত আচরণ করে।
- সমবয়সীদের সাথে মিশতে পারে না। সামাজিক আচরণ ঠিকমতো প্রদর্শন করতে পারে না।
- ঘন ঘন অঙ্গান হয়ে যায় বা থিচুনি হয়।

বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত কিছু রোগ যা দেখে বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা সহজে শনাক্ত করা যায়।

মাইক্রোসেফালি – মাথার আকৃতি অস্বাভাবিক ছোট হয়। এরা গুরুতর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হয়।

হাইড্রোসেফালি – মাথার তেতরে তরল পদার্থ জমে থাকে ফলে মাথার আকৃতি অস্বাভাবিক বড় হয়। এরাও গুরুতর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হয়।

ডাউন সিঙ্গোর্ম – গোলাকার মুখোমণ্ডল, তৈর্যক চোখ, চোখের পাতা পুরু হয়। জন্মের সময় শিশু দুর্বল ও শিথিল থাকে। হাত, পা ও ঘাড় খাটো হয়। উপুড় হতে, বসতে ও ইঁটাতে দেরি হয় এবং এরা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হয়।

ক্রিটিনিজ্ম – শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বিলম্ব হয়। শিশুর দেহে থাইরয়েড হরমোন উৎপাদন কম হয়। ফলে যে লক্ষণগুলো প্রকাশ পায় – শিশু খুব ধীরে বেড়ে উঠে। কপাল ছোট, মুখমণ্ডল ও হাত-পা ফোলা এবং বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা থাকে।

কাজ : প্রতিবন্ধিতা দ্রুত শনাক্তকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লেখ।

পাঠ ৩ – দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা ও শ্ববণ প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ এবং প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ চোখের ও কানের নিম্নলিখিত অবস্থা দেখা দিলে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে। প্রতিবন্ধিতার ধরন শনাক্ত এবং পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ–

- চোখের পাতা লাল হওয়া, ফুলে যাওয়া। চোখের পাতার কিনারে শুষ্ক আস্তরণ।
- চোখ থেকে তরল পদার্থ বের হওয়া।
- ঘন ঘন চোখ রংগরানো ও চোখ কুঁচকানো।
- বর্ষ চিনতে ভুল করা। বর্ষ উল্টা দেখা।
- লেখার সময় অসম ফাঁক দেওয়া, সারি সোজা রাখতে না পারা।
- কাছের বা দূরের জিনিস দেখতে সমস্যা হওয়া বা দেখতে না পারা।

শ্ববণ প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ –

- কানের গঠনগত ত্রুটি বা বিকৃতি থাকলে কান-পাকা রোগ ইত্যাদি সমস্যা থাকা।
- উচ্চারণের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা বা ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণের অসুবিধা বা কথা কম বলা।
- কিছু শোনার সময় কানে হাত দিয়ে শোনার চেষ্টা করা। রেডিও, টিভি শোনার সময় শব্দ বাড়িয়ে দেওয়া বা কাছে গিয়ে শোনা।
- কোনো প্রশ্ন বার বার করা বা এক প্রশ্নের অন্য উত্তর দেওয়া।
- কথা না বলে হাত ও মুখ ভঙ্গিমার মাধ্যমে বা ইশারায় ভাব বিনিময় করা।

প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ : প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিবন্ধী শিশু যাতে জন্মগ্রহণ না করে এবং শিশু জন্মগ্রহণের পর যাতে প্রতিবন্ধিতার শিকার না হয় সে দিকে সবার সচেতনতা প্রয়োজন। এই জন্য যা করণীয় তা হচ্ছে–

গর্ভকালীন সময় পর্যাপ্ত পুষ্টি কর খাবার গ্রহণ – গর্ভকালীন মাকে পর্যাপ্ত পুষ্টি কর খাবার থেকে দেওয়া। পুষ্টি কর খাবার না খেলে অনেক ক্ষেত্রে শিশু পূর্ণাঙ্গ সময়ের আগেই জন্মগ্রহণ করে অথবা শিশু কম ওজনের হয়। এসব শিশু শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী হতে পারে। প্রতিবন্ধিতা রোধে গর্ভকালীন প্রথম মাসগুলোর পুষ্টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। গর্ভকালীন আয়োডিনযুক্ত খবণ গ্রহণ শিশুর মানসিক শ্ববণ প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ করে।

উষ্ণ গ্রহণে সতর্কতা – গর্ভাবস্থায় ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে উষ্ণ গ্রহণ ও মাদক, সিগারেট থেকে বিরত থাকলে কিছু কিছু জন্মত্রুটি এবং মানসিক বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ করা সম্ভব।

প্রতিষেধক টিকা গ্রহণ – বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা রোধ করতে হলে গর্ভধারণের আগে বুবেলা ভাইরাস বা জার্মান হাম প্রতিরোধক টিকা নিতে হবে। ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সের সকল মহিলাকে ধনুষ্টেকার থেকে রক্ষার জন্য টিটি টিকা দিতে হবে।

শিশু কিশোরকে পর্যাপ্ত পুষ্টি কর খাবার দেওয়া – ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধ খাবারের অভাবে শিশুদের মধ্যে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা দেখা দেয়। শিশুদের গাঢ় সবুজ রঙের শাকসবজি, হলুদ ফলমূল খাওয়ালে এই প্রতিবন্ধিতা

প্রতিরোধ করা যায়। জনগ্রহণের পর পরই মায়ের প্রথম দুধ শিশুকে দিতে হবে। এই দুধে কলেস্ট্রাম নামক হলুদ বর্ণের পদার্থ থাকে, যা শিশুর রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষা – ঘন বসতি ও অস্বাস্থ্যকর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা গুরুতর প্রতিবন্ধিতা স্ফটির অন্যতম কারণ। তাই স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষার চেষ্টা করতে হবে।

বেশি বয়সে সম্ভান ধারণ রোধ – বেশি বয়সে সম্ভান গ্রহণ বৃদ্ধি প্রতিবন্ধিতার অন্যতম কারণ। তাই বেশি বয়সে সম্ভান ধারণ নিরূৎসাহিত করতে হবে।

রক্তের সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ রোধ – ঘনিষ্ঠ রক্তের সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ বন্ধ করতে পারলে সব ধরনের প্রতিবন্ধিতা অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব।

আঘাত ও রোগ সংক্রমণে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ – শিশুর কানে, চোখে, মাথায় আঘাত বা রোগ সংক্রমণ হওয়ার সাথে সাথে প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারে সাবধানতা অবশ্যন্দন – পোকামাকড় ধ্বংস করার জন্য যেসব রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় তা স্বাস্থ্য সমস্যার অন্যতম কারণ। সমাজের অনেক লোকই বিভিন্ন ঝুঁকি ও পূর্বসতর্কতামূলক ধারণা না নিয়েই সরাসরি জমিতে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে পোকামাকড় নিধন করে। এর ফলে অনেকে দৃষ্টিহীন, পক্ষাঘাতগ্রস্ততার শিকার হয়।

বিপজ্জনক কর্ম পরিবেশ – আমাদের দেশের অনেক শিশু বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ করে। যদিও দেশের শ্রম আইনে তা নিষিদ্ধ। কিন্তু দরিদ্রতার কারণে শিশুরা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হয়, ফলে আগুনে পুড়ে যাওয়া, অঙ্গহানি, দৃষ্টিহনি হয়। মেরুদণ্ডে আঘাত বা মাথায় আঘাত পেয়ে প্রতিবন্ধিতার শিকার হয়। আমাদের দেশে অনেক শিশু ধান মাড়িইয়ের সময় ধান ছিটে চোখে আঘাতপ্রাপ্ত হয় ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার শিকার হয়।

কাজ : প্রতিবন্ধিতা রোধে সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধিতে তোমাদের করণীয় সম্পর্কে ক্লাশে আলোচনা কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ১। কতো বছর বয়সের পর কোনো মহিলার প্রথম সম্ভান জন্ম নিলে শিশু প্রতিবন্ধী হওয়ার আশংকা থাকে?

ক) ২৫ বছর	খ) ৩০ বছর
গ) ৩৫ বছর	ঘ) ৪০ বছর
- ২। মায়ের গর্ভধারণকালে কোন রোগটি শিশুকে ক্ষতিগ্রস্ত করে?

ক) ইনফ্লুয়েঞ্জা	খ) সাধারণ জ্বর
গ) চিকেন পক্কা	ঘ) বাত জ্বর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ও ৩ ও ৪ নং পথের উভয় দাও :

রিমির সত্তান জন্মগ্রহণের পর পরই শ্বাস নিতে পারে না। নার্স ছোটাছুটি করতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ পর শিশুটির শ্বাসকার্য চালু করা হয়। এতে শিশুটি প্রাণে রক্ষা পায়। পরবর্তী সময়ে শিশুটি বুন্ধি প্রতিবন্ধী হয়।

৩। শিশুটির জন্মের পরপরই নার্সদের কী করণীয় ছিল ?

- | | |
|--------------------|------------------|
| ক) পানি খাওয়ানো | খ) মধু খাওয়ানো |
| গ) অক্সিজেন দেওয়া | ঘ) তেল মালিশ করা |

৪। রিমির শিশুটি প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণ কোনটি ?

- i) শিশুটির জন্মকালে সময় বেশি লেগেছিল।
- ii) শিশুটির মস্তিষ্কের কোষের ক্ষতি হয়েছিল।
- iii) শিশুটির মাথায় চাপ লেগেছিল।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। কণার বয়স ৩৫। গর্ভকালীন সে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। সে খাওয়াদাওয়াও ঠিকভাবে করে না। নিজের প্রতি খেয়াল করে না। শিশুটির জন্মের পর পরই শিশুটির রক্তের বিলিরুবিনের মাত্রা বেড়ে যায়। শিশুটি বড় হতে থাকলে সে কোনো বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে না, ইঁটাচলা ইত্যাদির বিকাশ কর হয়।

- ক. মা ও সত্তানের Rh উপাদানের মধ্যে মিল না থাকাকে কী বলে ?
- খ. কোন শিশুকে প্রতিবন্ধী শিশু বলা হয় ?
- গ. কণার শিশুকে কোন ধরনের শিশু হিসেবে শনাক্ত করা যায় ? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. কণার অসচেতনতা কণার শিশুর এই পরিণতি নিয়ে আসে—এ বিষয়ে তোমার মতামত দাও।

গ - বিভাগ

খাদ্য ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা



এ বিভাগ অধ্যয়ন করে আসুন—

- খাদ্যের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের গঠন, উৎস, কার্যকালিতা ও প্রেমিকাল করতে পারব;
- খাদ্য উপাদানের অভ্যবহনিত ঝোঁট চিহ্নিত করতে পারব;
- খাদ্য পরিপাক— প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা সাড় করতে পারব;
- বিশেষ ক্ষেত্রে খাদ্যের চাহিদা ও পৃষ্ঠির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানব;
- নিরমত্ত্বিক জীবন্যাশন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- ডায়াবেটিস, হৃদয়োগ্রাহ ও টেকনজচার্জ জোল সম্পর্কে হেমে এ ঝোঁটে জানাত প্রক্রিয়া জীবন্যাশন প্রথাগু বর্ণনা করতে পারব;
- খাদ্য প্রস্তুতে প্রেসিপি ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব;
- খাদ্য পরিবেশনের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারব।

দশম অধ্যায়

খাদ্যের কাজ ও উপাদান

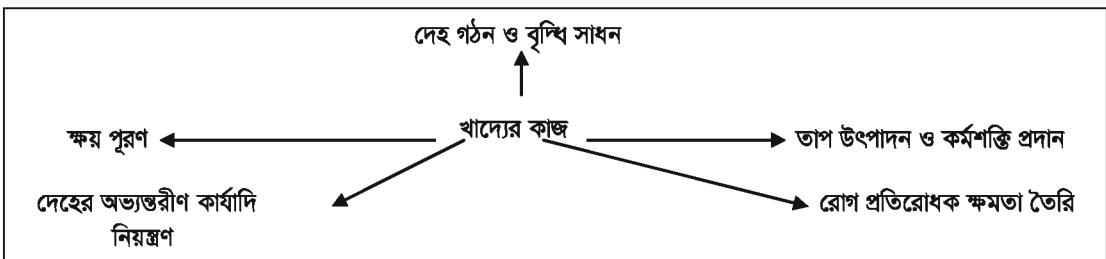
পাঠ-১ : খাদ্যের কাজ

জীবনধারণের জন্য খাদ্য অপরিহার্য। খাদ্য থেকে প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদানগুলোই আমাদের দেহে বিভিন্ন কাজ করে থাকে। আমাদের শরীরে খাদ্য গ্রহণের ফলে যে কাজগুলো সম্পন্ন হয় তা হলো—

- ১। দেহ গঠন ও বৃদ্ধি সাধন
- ২। ক্ষয় পূরণ
- ৩। তাপ উৎপাদন ও কর্মশক্তি প্রদান
- ৪। দেহের অভ্যন্তরীণ কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ
- ৫। রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা তৈরি

১। **দেহ গঠন ও বৃদ্ধি সাধন** – খাদ্যের মধ্যে অবস্থিত প্রোটিন দেহ গঠনের কাজ করে থাকে। শিশুর শরীর গঠনের জন্য পুষ্টি উপাদান গুরুত্বপূর্ণ। একটি মাত্র কোষ থেকে মায়ের পেটে শিশুর বৃদ্ধি ঘটে। কোষ পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ২টি কোষে বিভক্ত হয়। এভাবে আবার নতুন কোষ সৃষ্টি করে এবং পরবর্তীতে লক্ষ লক্ষ কোষ এবং আরও পরে কোটি কোটি কোষের সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ মানব শিশুর জন্ম হয়। গর্ভাবস্থায় শিশুর বৃদ্ধির জন্য পুষ্টির প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ খাদ্যের কাজ হলো শরীর গঠনের মাধ্যমে বৃদ্ধি সাধন করা। খাদ্যের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান এই কাজগুলো সম্পন্ন করে থাকে।

২। **ক্ষয় পূরণ** – প্রতিনিয়তই আমাদের শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, আর এই ক্ষয়প্রাপ্ত দেহ পূর্ণগঠন করার কাজও খাদ্যের। প্রতিনিয়তই পুরনো কোষের মৃত্যু ঘটে যার ফলে কিছু পুষ্টি উপাদান শরীর থেকে বের হয়ে যায় আর কিছু পুষ্টি উপাদান শরীরে থেকে যায় যা নতুন কোষ গঠনে অংশ নেয়। খাদ্য থেকে প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদানের সাথে ওইগুলো যুক্ত হয়ে নতুন কোষ গঠনে সহায়তা করে। আমরা যদি একজোড়া জুতা ক্রমাগত পরতে থাকি, তাহলে তার তলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। একসময় তা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যায়। কিন্তু জুতা ছাড়া যদি ইঁটা হয় তাহলে কিন্তু পায়ের তলা জুতার মতো ক্ষয় হয়ে যায় না। কারণ প্রতিনিয়তই মৃত কোষ বা ক্ষয়প্রাপ্ত কোষগুলোর জায়গায় নতুন কোষ তৈরি হচ্ছে এবং ক্ষয়পূরণের কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। এভাবে অসুস্থ থাকার পর বা আঘাতপ্রাপ্ত হলে নতুন কোষ তৈরির মাধ্যমে ক্ষতস্থানের ক্ষয়পূরণ ঘটে। তাই প্রত্যেক মানুষের শরীরেই খাদ্য হতে প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদানগুলো এই ক্ষয়পূরণের কাজ করে শরীরকে ক্ষয় থেকে রক্ষা করে।



- ৩। তাপ উৎপাদন ও কর্মশক্তি প্রদান – একটি গাড়ির ইঞ্জিন চালানোর জন্য জ্বালানি হিসেবে পেট্রল বা গ্যাসের প্রয়োজন হয়। এই জ্বালানি পুড়ে শক্তি তৈরি হয়, যার ফলে গাড়ি চলতে পারে। আমাদের শরীরকেও এই গাড়ির ইঞ্জিনের সাথে তুলনা করতে পারি। আমাদের শরীরে খাদ্যের মাধ্যমে প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদানগুলো শরীরের কোষে জ্বালানির মতো পুড়ে শক্তি তৈরি করে। ফলে আমরা সচল আছি এবং বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে পারছি। খাদ্য থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান আমাদের শরীরে যে তাপশক্তি উৎপন্ন করে, তার ফলে আমরা কাজ করার ক্ষমতা অর্জন করি। বেঁচে থাকার জন্য রক্ত সঞ্চালন, শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ, খাদ্যের পরিপাক এবং মল-মৃত্ত্ব ত্যাগ ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় কাজ, যা সম্পাদন করতে শক্তির প্রয়োজন। যখন আমরা ঘুমিয়ে থাকি তখনও শক্তি খরচ হয়। শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা রক্ষার জন্য, চিসু গঠনের জন্য, শরীরের বিভিন্ন তরল তৈরি, মায়ের দুধ তৈরি, সব ধরনের অভ্যন্তরীণ কাজের জন্য শক্তি প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া চলাফেরা, খেলাধুলা, কথা বলা এবং সব রকমের বাহ্যিক কাজের জন্যও শক্তির প্রয়োজন।
- ৪। দেহের অভ্যন্তরীণ কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে – আমাদের শরীরে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে থাকে, যার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয়। খাদ্য গ্রহণের পর যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে থাকে তা হলো— শক্তি উৎপাদনের জন্য পুষ্টি উপাদান পুড়ে, পেশির সঞ্চালনের জন্য শক্তি ব্যবহৃত হয়, নতুন কোষ গঠন করে, বিভিন্ন ধরনের দেহ তরল উৎপাদন ও নিঃসরণ হয় ইত্যাদি। এই প্রক্রিয়াগুলোকে সম্পাদন করতে কিছু কিছু পুষ্টি উপাদান গুরুত্বপূর্ণ, যেমন— খাদ্যের ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স, খনিজ লবণ, প্রোটিন ও পানি এগুলো বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া সংগঠিত করার কাজে সহায়তা করে। এ ছাড়া শরীরের বিভিন্ন এনজাইম ও হরমোন উৎপাদনে বিভিন্ন প্রোটিন ও ধাতব লবণের ভূমিকা রয়েছে। এই এনজাইম ও হরমোনগুলো শরীরের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন বিক্রিয়া বা প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অর্থাৎ দেহের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে ও বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খাদ্যের ভূমিকা অন্যথাকার্য।
- ৫। রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা তৈরি – প্রতিদিনই আমাদের শরীর বিভিন্ন ধরনের অণুজীব দিয়ে বা সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। এই আক্রমণের হাত থেকে শরীরকে রক্ষা করার জন্য চাই শরীরের নিজস্ব স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা। আর বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের ফলে এই রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা অর্জনে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে শরীর সহজেই সুস্থ থাকে অর্থাৎ শরীরের সঠিক সুস্থিতা রক্ষা হয়। অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে অপর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে পুষ্টির অভাব দেখা দেয়। পুষ্টির অভাবে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কমে যায় এবং বিভিন্ন ধরনের রোগের লক্ষণ দেখা যায় এবং সহজেই অসুস্থ হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হলে কিছু কোষের মৃত্যু ঘটে এবং কখনো কখনো চিসুগুলো ধ্বংস হতে পারে। শরীরে নতুন কোষ গঠনের মাধ্যমে চিসুর ক্ষয়পূরণ করে থাকে, এক্ষেত্রে শক্তি, প্রোটিন এবং অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজন হয়।

উপরের আলোচনা থেকে একথা বলতে পারি যে, খাদ্য শুধু ক্ষুধাই নিবৃত্ত করে না, শরীরে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পাদন করে থাকে। তাই শরীর সুস্থ রাখতে হলে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ করা উচিত।

কাজ – বিভিন্ন ধরনের খাদ্য আমাদের শরীরে কী কী কাজ করে থাকে তা ক্রমানুসারে সাজিয়ে দেখ।

পাঠ ২ – খাদ্যের উপাদান– প্রোটিন

খাদ্যকে ভাঙলে বিভিন্ন ধরনের জৈব রাসায়নিক বস্তু পাওয়া যায়। খাদ্যের মধ্যে যেগুলো আমাদের শরীরে বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদন করে শরীরকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখে তাদের পুষ্টি উপাদান বা খাদ্য উপাদান বলে। এই পুষ্টি উপাদানগুলো আমাদের দেহে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। খাদ্যের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানগুলো প্রধানত ছয় প্রকার। যথা—

(১) প্রোটিন	(২) কার্বোহাইড্রেট	(৩) ফ্যাট	(৪) ডিটামিন	(৫) ধাতব লবণ	(৬) পানি
-------------	--------------------	-----------	-------------	--------------	----------

এগুলো আমাদের শরীরের গঠন, রক্ষণাবেক্ষণ ও তাপশক্তি উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। খাদ্য থেকে প্রাপ্ত ছয়টি পুষ্টি উপাদানের প্রতিটিই আমাদের দেহে একাধিক কাজ করে থাকে। আমরা এই ছয়টি পুষ্টি উপাদান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

প্রোটিন

‘প্রোটিন’ শব্দটা গ্রিক শব্দ প্রোটিওজ থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো সর্বপ্রথম অবস্থান। যেখানেই প্রাণের অস্তিত্ব স্থানেই থাকে প্রোটিন। তাই প্রোটিন ছাড়া কোনো প্রাণির অস্তিত্ব কর্তনা করা সম্ভব না। প্রাণি এবং উদ্ভিজ্জ জগতে প্রোটিন একটা প্রধান অংশ। এজন্য প্রোটিনকে মূখ্য উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়।

প্রোটিনের গঠন – সব প্রোটিনই কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন নিয়ে গঠিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সালফার, ফসফরাস, লৌহ ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ যুক্ত থাকে। প্রোটিনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাঙলে প্রথমে অ্যামাইনো এসিড এবং পরে কার্বন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়।

অ্যামাইনো এসিড – বড় আকারের এক একটা প্রোটিনকে আর্দ্র বিশ্লেষিত করলে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এসিড অণু পাওয়া যায়। এদের প্রত্যেকটা অণুতে কমপক্ষে একটা অ্যামাইনো দল ($-NH_2$) ও একটা কার্বক্সিল দল ($-COOH$) বিদ্যমান থাকে। এদের অ্যামাইনো এসিড বলে। অ্যামাইনো এসিডগুলোর প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে এদের দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা— অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড ও অনাবশ্যক অ্যামাইনো এসিড।



- ক) অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড – কতোগুলো অ্যামাইনো এসিড আমাদের শরীরে তৈরি হয় না ফলে এই অ্যামাইনো এসিডগুলোর প্রয়োজন মিটানোর জন্য খাদ্যের মাধ্যমে সরবরাহ করতে হয়। এই সমস্ত অ্যামাইনো এসিডকে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড বলে।
- খ) অনাবশ্যক অ্যামাইনো এসিড – কতোগুলো অ্যামাইনো এসিড আমাদের শরীরে তৈরি হয় ফলে এই অ্যামাইনো এসিডগুলোর প্রয়োজন মেটানোর জন্য খাদ্যের মাধ্যমে গ্রহণ না করলেও কোনো সমস্যা হয় না। ওই সমস্ত অ্যামাইনো এসিডকে অনাবশ্যক অ্যামাইনো এসিড বলে।

প্রোটিনের প্রেণি বিভাগ

(ক) উৎস অনুযায়ী প্রোটিনের প্রেণি বিভাগ -

উৎস অনুযায়ী প্রোটিনকে ২ ভাগে ভাগ করা যায় -

(১) প্রাণিজ প্রোটিন - যে প্রোটিনগুলো প্রাণিজগত থেকে পাওয়া যায় তাকে প্রাণিজ প্রোটিন বলে। যেমন- মাছ, মাস, ডিম, দুধ ইত্যাদি প্রাণিজ প্রোটিন।

(২) উষ্ণিজ প্রোটিন - উষ্ণিজ অগৎ থেকে প্রাপ্ত প্রোটিনকে উষ্ণিজ প্রোটিন বলে। যেমন- ডাল, বাদাম, সয়াবিন, সিমের বিচি ইত্যাদি খাদ্যের উষ্ণিজ প্রোটিন।

(খ) অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে প্রেণিবিন্যাস -

অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে ৩ প্রেণিতে ভাগ করা হয়।

(১) সম্পূর্ণ বা প্রথম প্রেণির প্রোটিন - যে সব প্রোটিনে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডগুলো দেহের প্রোটিন গঠনের উপযোগী অনুপাতে বর্তমান থাকে সেই প্রোটিনকে সম্পূর্ণ প্রেণির প্রোটিন বলে। মাছ, মাস, ইত্যাদি প্রাণিজ প্রোটিনে অত্যাবশ্যক অ্যামাইনো এসিডগুলো দেহের প্রোটিন গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে বর্তমান থাকে। এই জন্য এই প্রাণিজ প্রোটিনগুলো সম্পূর্ণ বা প্রথম প্রেণির প্রোটিন।

(২) আধিক পূর্ণ বা দ্বিতীয় প্রেণির প্রোটিন - কোনো কোনো প্রোটিনে একটা বা দুইটা অত্যাবশ্যক অ্যামাইনো এসিড দেহ গঠনের জন্য উপযোগী অনুপাতে থাকে না কলে দেহের বৃদ্ধি ব্যৱহৃত হয়। এই সব প্রোটিনকে কম উপযোগী বা আধিক পূর্ণ বা দ্বিতীয় প্রেণির প্রোটিন বলে। যেমন-চাল, ডাল, আটা, বাদাম, আলু ইত্যাদি বিভিন্ন উষ্ণিদজ্জাত প্রোটিনে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডগুলো কম পরিমাণে থাকে। যেমন- ডালে মেঁড়িওনিন, চালে শাইসিনের পরিমাণ কম থাকে।

(৩) অসম্পূর্ণ বা ভৃত্তীয় প্রেণির প্রোটিন - যে প্রোটিনে দেহের চাইদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় সকল অ্যামাইনো এসিডগুলো পরিমিত পরিমাণে বিদ্যমান থাকে না সেগুলোকে অসম্পূর্ণ প্রোটিন বলে। যেমন- ভৃত্তার প্রোটিন জেইন (Zein)।

প্রোটিনের উৎস-

প্রাণিজ প্রোটিন - মাছ, মাস, ডিম, দুধ, পনির, ছানা ইত্যাদি।

উষ্ণিজ প্রোটিন - বিভিন্ন ধরনের ডাল, সয়াবিন, বাদাম, চাল, গম ইত্যাদিতে প্রোটিন পাওয়া যায়।



প্রোটিন জাতীয় খাদ্য

প্রোটিনের কাজ -

- ১। দেহ গঠন ও বৃদ্ধি সাধন - প্রোটিনের প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে দেহ কোষের গঠন ও বৃদ্ধি সাধন করা। আমাদের দেহের অস্থি, পেশি, বিভিন্ন দেহস্তোষ, রক্ত কণিকা ইত্যাদি শুরু করে দাঁত, চুল, নখ পর্যন্ত প্রোটিন দিয়ে তৈরি।

- ২। ক্ষয় পূরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে – আমাদের কোষগুলি প্রতিনিয়ন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই ক্ষয়প্রাপ্ত স্থানে নতুন কোষ গঠন করে ক্ষয়পূরণের কাজ করে প্রোটিন। কোনো ক্ষতস্থান সারাতেও প্রোটিনের ভূমিকা রয়েছে।
- ৩। ভাগশক্তি উৎপাদন – ১ গ্রাম প্রোটিন থেকে ৪ কিলোক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়। যখন দেহে ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেটের ঘাটতি থাকে তখন প্রোটিন তাপ উৎপাদনের কাজ করে থাকে।
- ৪। দেহের রোগ প্রতিরোধক শক্তি অর্জন – বাইরের বিভিন্ন রোগজীবাণু নানা-ভাবে আমাদের দেহে প্রবেশ করে নানা রকমের রোগব্যাধি জনাতে পারে। এইসব রোগ-জীবাণুকে প্রতিরোধ করার জন্য দেহে তাদের বিরোধী পদার্থ বা এন্টিবাড়ি তৈরি করা প্রোটিনের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ।
- ৫। মানব শক্তির বিকাশ – মানসিক বিকাশেও প্রোটিন অপরিহার্য। মানসিক বিকাশ বা মস্তিষ্কের বিকাশের সময় প্রোটিনের অভাব হলে বৃদ্ধির বিকাশ ব্যাহত হয়।
- ৬। দেহাভ্যন্তরের কাজ নিয়ন্ত্রণ – প্রোটিন দিয়ে তৈরি এনজাইম, হরমোন, ইত্যাদি দেহাভ্যন্তরের বিভিন্ন কাজকর্ম সুপরিচিত করে থাকে।
- ৭। শ্রয়োজনীয় উৎপাদন পরিবর্তন করে – রক্তের প্রোটিন হিমোগ্লোবিন বাতাস থেকে প্রাপ্ত অক্সিজেন প্রাপ্ত করে শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করে।
- ৮। দেহে গানির সমতা রক্ত করে – প্রাঙ্গমা বা রক্তের প্রোটিন দেহে গানির সমতা বজায় রাখে।

অভাবজনিত লক্ষণ-

শিশুর খাদ্যে প্রোটিনের অভাব হলে—

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। • ওজন কমে যায়। • চামড়া খসখসে হয়। • ছলের রং ফ্যাকাশে হয়। • মেজাজ ঝিটঝিটে হয়। | <ul style="list-style-type: none"> • মানসিক বিকাশ পিছিয়ে পড়ে। • প্রোটিনের ঘাটতিতে এনজাইমের সংশ্লেষণ কমে যায়। • খাদ্য ঠিকমতো পরিপাক হয় না, বদহজ্জম হয়। • রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কমে যায়। |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

প্রাথমিক পর্যায়ে এই লক্ষণগুলো দেখা দেয়, যাকে প্রাক- কোয়াশিয়ারকর অবস্থা বলে।



ম্যারাসমাসে আক্রান্ত শিশু



কোয়াশিয়ারকর আক্রান্ত শিশু

যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে শিশুর উপরের লক্ষণগুলোর পাশাপাশি হাত-পা ফুলে যায়, মুখে পানি আসে এই অবস্থাকে কোয়াশিয়ারকর বলা হয়। সাধারণত ১-৪ বছরের শিশুরাই এর শিকার হয়।

এ ছাড়া প্রোটিন ও ক্যালরি উভয়েই অভাব হলে ম্যারাসমাস দেখা যায়। এই ক্ষেত্রে শিশুর শরীর খুবই শুকিয়ে যায়। বৃন্দদের মতো চেহারা হয় ও বর্ধন ব্যাহত হয়।

প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রোটিনের অভাব –

- শোথ (হাতে পায়ে পানি আসে) হতে পারে।
- রক্তসংরক্ষণ দেখা দিতে পারে।
- রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কমে যায়।

কাজ – আমাদের দেহে প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

পাঠ-৩ : কার্বোহাইড্রেট

আমাদের দৈনিক খাদ্যের বিভিন্ন পৃষ্ঠি উপাদানগুলোর মধ্যে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। এই উপাদান অন্যান্য উপাদানের চেয়ে দামেও সস্তা। শরীরে তাপ ও শক্তি সরবরাহের জন্য গুরুত্ব বেশি।

কার্বোহাইড্রেটের গঠন –

সকল কার্বোহাইড্রেটই কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এই তিনটি মৌলিক পদার্থের সম্মিলনে গঠিত। এদের মধ্যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরিমাণ সাধারণত ২৪১ অনুপাত অর্থাৎ এইগুলো পানিতে যে অনুপাতে থাকে কার্বোহাইড্রেটেও সেই অনুপাতে থাকে। তাই কার্বোহাইড্রেটকে হাইড্রেট অব কার্বন (Hydrate of carbon) বা কার্বনের পানি বলে। অর্থাৎ বলা যায় কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনযুক্ত কোনো পদার্থে যদি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ২৪১ অনুপাতে থাকে তবে ওই পদার্থকে সাধারণত কার্বোহাইড্রেট বলা হয়।

কার্বোহাইড্রেটের প্রেগিভিডগ – কার্বোহাইড্রেটকে প্রধানত ও ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(১) মনোস্যাকারাইড	(২) ডাইস্যাকারাইড	(৩) পলিস্যাকারাইড
-------------------	-------------------	-------------------

১। **মনোস্যাকারাইড** – যে সব কার্বোহাইড্রেট একটি মাত্র সরল শর্করার অণু দিয়ে গঠিত এবং একে আর্দ্রবিশ্লেষিত করলে ক্ষুদ্রতম কোনো সরল শর্করার অণু পাওয়া যায় না তাকে মনোস্যাকারাইড বা এক-শর্করা বলে। যেমন— ফ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ, গ্যালাকটোজ।

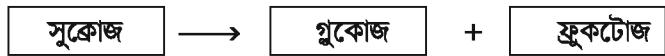
(ক) **ফ্লুকোজ (Glucose)** – এটি কার্বোহাইড্রেটের সবচেয়ে বেশি পরিচিত সরল হাইড্রোকার্বন। ফ্লুকোজ পাওয়া যায়— দানা শস্যে, কিছু পরিমাণ মূলে, আঙুরে ও বিভিন্ন ফলে।

(খ) **ফ্রুকটোজ (Fructose)** – মধু, পাকা মিষ্টি স্বাদের ফলে এবং কিছু কিছু সবজিতে ফ্রুকটোজ পাওয়া যায়।

(গ) **গ্যালাকটোজ (Galactose)** – দুধের চিনি (ল্যাকটোজ) তেওঁে গ্যালাকটোজ পাওয়া যায়। উদ্ধিদে গ্যালাকটোজ পাওয়া যায় না।

২। **ডাইস্যাকারাইড** – যেসব কার্বোহাইড্রেটকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে ২টি মনোস্যাকারাইড বা সরল শর্করা পাওয়া যায় তাকে ডাইস্যাকারাইড বলে। যেমন— সুক্রোজ, ল্যাকটোজ ও মলটোজ।

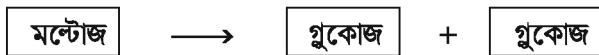
(ক) সুক্রোজ (Sucrose) - সাধারণ চিনি, আম, বিট, নানা প্রকার সবজি ও ফলের রসে সুক্রোজ পাওয়া যায়। সুক্রোজ ভাঙলে ১ অণু গ্লুকোজ ও ১ অণু ফ্রুকটোজ পাওয়া যায়।



(খ) ল্যাকটোজ (Lactose) - দুধে এই চিনি পাওয়া যায়। ল্যাকটোজকে ভাঙলে এক অণু গ্লুকোজ ও এক অণু গ্যালাকটোজ পাওয়া যায়।



(গ) মল্টোজ (Maltose) - স্টার্চ তেওঁ গ্লুকোজে পরিণত হওয়ার মধ্যবর্তী স্তরে মল্টোজের উৎপন্নি হয়ে থাকে। মল্টোজ ভাঙলে দুই অনু গ্লুকোজ পাওয়া যায়।



৩। পলিস্যাকারাইড

যে সকল কার্বোহাইড্রেটকে আর্দ্রবিশ্লেষিত করলে অনেক একক মনোস্যাকারাইড পাওয়া যায়, তাকে পলিস্যাকারাইড বা বহু শর্করা বলা হয়। যেমন- (ক) স্টার্চ (খ) গ্লাইকোজেন ও (গ) সেলুলোজ।

(ক) স্টার্চ (Starch) - প্রাণিগতের শক্তির প্রাথমিক উৎস হলো স্টার্চ বা শ্বেতসার। উক্ষিদে কার্বোহাইড্রেট স্টার্চ হিসেবে সঞ্চিত হয়। এদের ভাঙলে অনেক গ্লুকোজ অণু পাওয়া যায়। চাল, গম, আলু, কচু ক্যাসাভা ইত্যাদি খাদ্যের অধিকাংশই স্টার্চ। দেহের মধ্যে এই স্টার্চগুলি এনজাইমের সাহায্যে আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে গ্লুকোজ উৎপন্ন করে। প্রাণিগতে স্টার্চ পাওয়া যায় না।



(খ) গ্লাইকোজেন (Glycogen) - প্রাণী দেহে সঞ্চিত কার্বোহাইড্রেটের নাম গ্লাইকোজেন। অনেক গ্লুকোজ অণুর সমন্বয়ে গ্লাইকোজেন হিসেবে প্রাণীর যকৃতে ও পেশিতে সঞ্চিত থাকে। উক্ষিজ জগতে গ্লাইকোজেন পাওয়া যায় না। আমরা যখন অনেকক্ষণ না খেয়ে থাকি বা কঠিন পরিশ্রম করি তখন গ্লাইকোজেন তেওঁ গ্লুকোজ তৈরি হয় এবং আমাদের প্রয়োজন মেটায়।



(গ) সেলুলোজ (Cellulose) - সেলুলোজ অনেক গ্লুকোজ অণুর সমন্বয়ে গঠিত। এই উপাদান কেবল উক্ষিদে পাওয়া যায়, প্রাণিগতে পাওয়া যায় না। খাদ্য শস্য যেমন- ধান, গম, যব, ছোলা এবং শাকসবজি প্রভৃতির উপরের কঠিন অংশটা সেলুলোজ। মানবদেহে সেলুলোজ ভাঙ্গার মতো এনজাইম না থাকায় আমাদের দেহ সেলুলোজকে ভাঙতে পারে না। তবে মল নিষ্কাশণে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।



কার্বোহাইড্রেটের খাদ্য উৎস- নিচে খাদ্যগুলোকে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ বেশি থেকে কম অনুযায়ী সাজানো হলো-

- ১। চিনি, পুড়ি, মিছরি, ক্যাপডি, চকমেট, মিঠি।
- ২। সালু, এরাইট।
- ৩। চাল, কুঁচা, বৰ, গম।
- ৪। আলু।
- ৫। বিভিন্ন ধরনের শুকলা ফল বেমন- খেজুর, কিসমিস ইত্যাদি।
- ৬। বিভিন্ন ধরনের ডাল, সয়াবিন, বাদাম।
- ৭। টাটকা ফল, আলুবু, কলা, আপেল, আম, কাঁঠাল, আলুরস ইত্যাদি।
- ৮। সবুজ শাকসবজি, যেমন- লাঙশাক বা শুইশাক, কলামি শাক, পাতং শাক, বৌধাকপি, গটোল, কুমড়া ইত্যাদি।



কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় খাদ্য

দৈনিক প্রয়োজনীয় ক্যালরির ৫০-৬০ ভাগ কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য থেকে প্রাপ্ত করা উচিত।

কার্বোহাইড্রেটের কাজ -

- (১) দেহে তাপ বা শক্তি সরবরাহ করাই কার্বোহাইড্রেটের প্রধান কাজ। এজন্য একে জ্বালানি খাদ্য বলে। ১ খাম কার্বোহাইড্রেট থেকে ৪ কিলো ক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়।
- (২) কার্বোহাইড্রেটসমূহ স্নেহ পদার্থ দহনে সহায়তা করে আমাদের কিটোসিস নামক ঝোপ হতে রক্ষা করে।
- (৩) প্রোটিন, প্রিটাইলিন ও অ্যনিজ লবণ প্রাপ্তে সহায়তা করে।
- (৪) অরু প্রোটিনসমূহ খাদ্যের প্রোটিনকে তাপ উৎপাদনের কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে, ফলে প্রোটিনের ধরণ হয় না। কার্বোহাইড্রেটের এই কাজকে প্রোটিনের মিতব্যকী কাজ (Protein sparing action) বলা হয়।
- (৫) কার্বোহাইড্রেটের উপরিক্ষিতে এক প্রকার জীবাণু অঙ্গে প্রিটাইলিন 'কে' এবং প্রিটাইলিন 'বি' উৎপন্ন করে ওই সমস্ত প্রিটাইলিনের অভাব কিছুটা পূরণ করে থাকে।
- (৬) সেলুলোজ -জাতীয় কার্বোহাইড্রেট কোষকাঠিন্য দ্রুত করে।
- (৭) কার্বোহাইড্রেট যকৃতকে ব্যাকটেরিয়া ঘাটিত বিবরিয়া হতে রক্ষা করে।
- (৮) মস্তিষ্কের কাজ স্থল রাখার জন্য একমাত্র জ্বালানি হিসেবে ফুকোজ-জাতীয় কার্বোহাইড্রেট-এর জূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

খাদ্য কার্বোহাইড্রেটের অভাবের ফল -

- (১) কার্বোহাইড্রেটের অভাবে দেহে তাপশক্তির ঘাটতি হয়। ফলে কাজ করায় ক্ষমতা কমে যায়।
- (২) আহারের সেলুলোজ জাতীয় কার্বোহাইড্রেটের অভাবে কোষকাঠিন্য দেখা দের।

কাজ - কোন ধরনের কার্বোহাইড্রেট বেশি উৎপকারী এবং কেন?

পাঠ-৪ : শিপিড বা ফ্যাট ও ভিটামিন

খাদ্যের ছয়টি উপাদানের মধ্যে স্নেহপদার্থ বা ফ্যাটই সবচেয়ে বেশি শক্তি উৎপন্ন করে। প্রায় সব প্রাকৃতিক খাদ্যবস্তুর মধ্যে এদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। স্নেহ জাতীয় পদার্থগুলোকে ভাঙলে ফ্যাট এসিড ও প্লিসারল পাওয়া যায়।

স্নেহপদার্থের শ্রেণিবিভাগ -

- ক) স্নেহপদার্থের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ - স্নেহ পদার্থকে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দুই ভাগে ভাগ করা যায়।
- (১) কঠিনস্নেহ - যেসব স্নেহ পদার্থ স্বাভাবিকভাবে ও চাপে কঠিন আকৃতির হয় তাদেরকে কঠিনস্নেহ বলে।
যেমন- প্রাণির চর্বি, মাখন ইত্যাদি।
- (২) তরলস্নেহ - যেসব স্নেহ পদার্থ স্বাভাবিক তাপে ও চাপে তরল অবস্থায় থাকে তাকে তরল স্নেহ বলে।
যেমন- সয়াবিন তেল, সরিষার তেল ইত্যাদি।
- খ) উৎস অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ - উৎস অনুযায়ী স্নেহ পদার্থকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়-উত্তিজস্নেহ ও প্রাণিজস্নেহ
- (১) উত্তিজস্নেহ - যেসব স্নেহপদার্থ উত্তিজ জগৎ থেকে পাওয়া যায় তাদের উত্তিজস্নেহ বলে। যেমন- নারিকেল তেল, সরিষার তেল ইত্যাদি।
- (২) প্রাণিজস্নেহ - যে সকল স্নেহপদার্থ প্রাণিজগৎ থেকে পাওয়া যায় তাদের প্রাণিজস্নেহ বলে। যেমন- গরুর চর্বি, ঘি, মাখন, মাছের তেল ইত্যাদি।

খাদ্য উৎস -

- (১) প্রথম শ্রেণির স্নেহ - এখানে স্নেহের পরিমাণ ৯০%-১০০%। সয়াবিন তেল, ঘি, মাখন, সরিষার তেল, কড় মাছের তেল, শার্ক মাছের তেল ইত্যাদি।
- (২) দ্বিতীয় শ্রেণির স্নেহ - এখানে স্নেহের পরিমাণ ৪০%-৫০%। বিভিন্ন ধরনের বাদাম, যেমন- চীনা বাদাম, কাজু বাদাম, পেস্তা বাদাম, আখরোট, নারিকেল ইত্যাদি।
- (৩) তৃতীয় শ্রেণির স্নেহ - এখানে স্নেহের পরিমাণ ১৫%-২০%। দুধ, ডিম, মাছ, মাংস, যকৃৎ ইত্যাদি।
আমাদের খাদ্যে দৈনিক ক্যালরির ২০%-২৫% স্নেহপদার্থ থেকে গ্রহণ করা উচিত।

স্নেহপদার্থের কাজ -

- ১। স্নেহপদার্থের প্রধান কাজ হলো তাপ ও শক্তি সরবরাহ করা। ১ গ্রাম স্নেহপদার্থ থেকে দেহে ৯ কিলোক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়। দেহে শক্তির উৎস হিসেবে জ্বালানিরূপে সঞ্চিত থাকে।
- ২। কোষ প্রাচীরের সাধারণ উপাদান হিসেবে কোলেস্টেরল ও ফসফোলিপিড জাতীয় স্নেহ পদার্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- ৩। ভিটামিন এ, ডি, ই ও কে- কে দ্রবীভূত করে দেহের গ্রহণ উপযোগী করে তোলে।
- ৪। দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলোকে সংরক্ষণের জন্য স্নেহপদার্থের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

- ৫। দেহ থেকে তাপের অপচয় গ্রোথ করে শরীর শরম হাঁধে।
- ৬। ড্রেহগদার্থ প্রয়োজনীয় ফ্যাটি এসিড সরবরাহ করে চর্মরোগের হাত থেকে রক্ষা করে।

অভ্যবহানিত বল –

- ১। স্লেহজাতীয় খাদ্যের অভাবে চর্বিতে মূৰব্বীয় ভিটামিনের অভাব দেখা যায়।
- ২। স্বক শুকনো ও খসখসে ভাব ধারণ করে। অভ্যবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিডের অভাবে শিশুদের দেহে একজিমা দেখা দিতে পারে।

পাঠ-৫ : ভিটামিন

দীর্ঘদিন পরেবগা করে শক্ত করা গেছে যে আমাদের প্রকৃতিজ্ঞাত খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট ছাড়াও এমন কিছু রাসায়নিক উপাদান রয়েছে যার অভাবে বিভিন্ন ধরনের ঝোগ যেমন— বেরিবেরি, রাতকানা, রিকেট, এনিমিয়া ইত্যাদি ঝোগ দেখা যায় এবং নির্দিষ্ট ঝোগের জন্য নির্দিষ্ট কিছু উপাদান গ্রহণে তা ভালো হয়ে যায়। এই উপাদানগুলো হচ্ছে ভিটামিন। অর্ধাৎ ভিটামিন বা খাদ্যাণ্ড হচ্ছে খাদ্যের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকার জটিল জৈব রাসায়নিক বৌগ যা জীবদেহে খুব সামান্য পরিমাণে প্রয়োজন হয় কিন্তু এদের উপস্থিতি ছাড়া জীবদেহের পাঞ্চ উৎপাদন ক্ষিয়া ব্যাহত হয় ও সুস্থ সামাজিক বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্ভব হয় না এবং এই বৌগগুলোর অভাবে বিভিন্ন ধরনের ঝোগ দেখা যায়। দেহে এই অভ্যবশ্যকীয় উপাদানটার চাহিদা কিন্তু খুব সামান্য। কিন্তু এর কাছকে সামান্য বলা যায় না। কারণ দেহ গঠন, ক্রয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন, তাপ ও শক্তি উৎপাদন, অভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ প্রতিটি কাছই ভিটামিনের উপস্থিতি ছাড়া সুষ্ঠুভাবে সম্পর্ক হতে পারে না।

ভিটামিনের প্রেরণিভাগ – মূৰব্বীয়তার উপর ভিত্তি করে ভিটামিনগুলোকে দুই ভাগ করা যায়। যথা—



ভিটামিন সমৃদ্ধ খাব—সবজি ও ফলমূল

- ১) চর্বিতে মূৰব্বীয় ভিটামিন – যে ভিটামিনগুলো চর্বিতে বা চর্বি ম্রাবকে দ্রবীভূত হয় কিন্তু পানিতে অমূৰব্বীয় তাদের চর্বিতে দ্রবীভীয় ভিটামিন বলে। এই ভিটামিন ৪ টি, যথা— এ, ডি, ই, ও কে।
- ২) পানিতে মূৰব্বীয় ভিটামিন – যে ভিটামিনগুলো পানিতে খুব সহজেই দ্রবীভূত হয় কিন্তু চর্বিতে অমূৰব্বীয় তাকে পানিতে মূৰব্বীয় ভিটামিন বলে।

পানিতে মূৰব্বীয় ভিটামিন প্রধানত ২ টি। ভিটামিন বি-ক্যাপ্সেজ ও ভিটামিন-সি।

ভিটামিনের কাজ –

- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে শরীরকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখে।
- দেহের বৃদ্ধিসাধন করে। গর্ভাবস্থায় শিশুর গঠন ও স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন।
- প্রাণির বৎস বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
- স্নায় ও মস্তিষ্কের কর্মদক্ষতা ঠিক রাখে।
- চোখ ও ত্বকসহ বিভিন্ন অংশের সুস্থতা রক্ষা করে।
- রক্ত গঠনে সাহায্য করে।
- শরীরে বিভিন্ন পৃষ্ঠি উপাদানের যথাযথ ব্যবহার করে স্বাস্থ্য ও কর্মদক্ষতা অটুট রাখে।

কাজ – আমাদের দেহের জন্য স্নেহপদার্থ কেন প্রয়োজন বর্ণনা কর।

কাজ – মানবদেহে ভিটামিন কী কী কাজ করে লেখ।

পাঠ-৬ : ভিটামিন ‘এ’ ও ‘ডি’

ভিটামিন ‘এ’

ভিটামিন-এ চরিতে দ্রবণীয় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন। ভিটামিন এ-এর রাসায়নিক নাম রেচিনল। এটি বর্ণহীন ও তাপে কম নষ্ট হয়। তবে উচ্চ তাপে ও অতিবেগুনি রশ্মিতে নষ্ট হয়।

ভিটামিন এ’র কাজ-

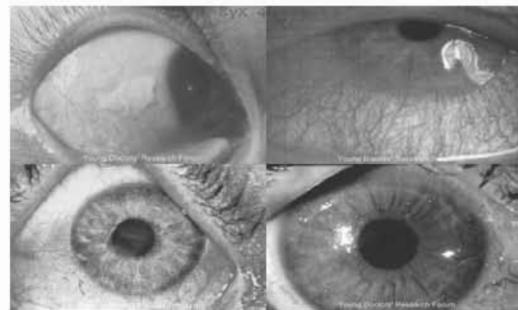
- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • চোখের স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি বজায় রাখার জন্য এই ভিটামিন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। • জীবদেহের সার্বিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে থাকে। • ত্বক ও বিশ্বার কোমলতা ও সজীবতা রক্ষা করে। | <ul style="list-style-type: none"> • বিভিন্ন গ্রন্থিকে স্বাভাবিক ও কর্মক্ষম রাখে। • বিভিন্ন সংক্রামক রোগের আক্রমণ রোধ করে। • রাতের বেশায় বা অক্ষরকারে অল্প আলোতে দেখতে ভিটামিন-এ সহায়তা করে। |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

খাদ্য উৎস – ভিটামিন এ এর উৎসকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

- (১) প্রাণিজ উৎস – ভিটামিন এ প্রাণিজ খাদ্যে এবং কোনো কোনো প্রোটিনের সাথে যুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। ডিম, কলিজা, চর্বিযুক্ত মাছ, সামুদ্রিক মাছ এর কলিজায়, হ্যালিবার্ট ও শার্ক ইত্যাদি মাছের তেল, ইলিশ মাছ, ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। দুধে বিশেষ করে কোলেস্ট্রামে যথেষ্ট ভিটামিন এ থাকে।
- (২) উষ্ণিজ্জ উৎস – উষ্ণিজ্জের বিভিন্ন অংশে হলুদ, কমলা বা হলদে-কমলা বর্ণের এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ বা রঞ্জক পদার্থ থাকে, যেগুলো খাওয়ার পর মানবদেহে ভিটামিন-এ, তে রূপান্তরিত হয়। এদের ক্যারিটিন বা প্রাক ভিটামিন-এ বলে। সবুজ বা রঙিন শাক সবজি, হলুদ ফলমূল, মিষ্টি কুমড়া, গাজর, মিষ্টি আলু, পাকা পেঁপে, পাকা আম, পাকা কাঠাল ইত্যাদিতে প্রাক ভিটামিন-এ বিদ্যমান।

অভাবজনিত শক্ষণ -

- ১) ভিটামিন- এ এর অভাবে রাতকানা রোগ দেখা দেয়। এই রোগ হলে রাতের বেশায় অর্থ আলোতে বা অল্পকারে দেখার অসুবিধা ঘটে।
- ২) এ ছাড়া ভিটামিন-এ এর অভাবে চোখের বিভিন্ন শুষ্ক হয়ে প্রদাহ দেখা দেয়, যাকে জেরোপথ্যালমিয়া বলে।
- ৩) ভিটামিন এ- এর অভাবে চোখের পর্দার অস্বচ্ছতাও হতে পারে। একে ক্রেটোম্যালেসিয়া বলে।
- ৪) এই ভিটামিনের অভাবে চামড়ার শুষ্কতা হতে পারে।
- ৫) রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাহ্রাস পায়।
- ৬) ভিটামিন-এ এর ঘাটতি হলে শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।



ভিটামিন-এ'র অভাবে সৃষ্ট চোখের বিভিন্ন রোগ

ভিটামিন-'ডি'

ভিটামিন-ডি এর রাসায়নিক নাম ক্যালসিফেরোল। এটা রিকেট রোগ প্রতিরোধ করে বলে এই ভিটামিনকে রিকেট রোগ প্রতিরোধক ভিটামিন বলে। এটা চর্বিতে দ্রবণীয় কিন্তু পানিতে দ্রবণীয় নয়। তাপে নষ্ট হয় না।

ভিটামিন-ডি এর কাজ -

- ভিটামিন-ডি অন্ন হতে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ইত্যাদি লবণ শোষণে সহায়তা করে।
- দাঁত ও হাড়ের গঠন ও পুস্টিসাধনে ভিটামিন-ডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- প্যারাথাইরয়োড হরমোনের কাজে সহায়তা করে।
- রক্তে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

উৎস -

- কড় মাছের তেল, শাক মাছের তেল, হ্যালিবার্ড মাছের তেল ভিটামিন-ডি এর প্রধান উৎস। এ ছাড়া সিভার, দূধ, দুধজাত খাদ্য, ডিমের ক্লুম ইত্যাদি এই ভিটামিনের উৎস।
- আমদের ঘুকের নিচে কোলেস্টেরল থাকে। সুর্বের অতিকেগুনি রশির সহায়তায় কোলেস্টেরল থেকে ভিটামিন-ডি উৎপন্ন হয়।

অভাবজনিত রোগ -

- ১) রিকেট - ভিটামিন-ডি এর অভাবে শিশুদের রিকেট হয়। এই রোগে নিচের স্ক্রপগুলো দেখা যায়-
 - শিশুর হাড় নরম ও অপরিণত হওয়ার ফলে শরীরের বৃদ্ধি হয় না।
 - পায়ের হাড়গুলো বেঁকে ধনুকের মতো আকৃতির হয়।
 - বুকটা সরু ও অস্বাভাবিক আকৃতি লাভ করে।
 - দাঁতের বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। দাঁতের গঠন ব্যহত হয়।
 - ছোট শিশুদের ইটতে দেরি হয়।



রিকেট আকাত শিশুর পায়ের হাড়গুলো বেঁকে ধনুকের মতো আকৃতির হয়েছে।

২) অস্টিওম্যালেসিয়া – এই রোগ গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী মা ও বয়স্কদের হয়। এর লক্ষণগুলো হলো–

- হাড় হতে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস ক্ষয় হয়ে যায় ফলে ক্রমশ হাড় নরম ও দুর্বল হয়ে পড়ে।
- এই রোগে ক্রমশ পা দুর্বল হয়ে পড়ে ও হাতের উপর ভর দিয়ে চলতে হয়। শেষ অবস্থায় পায়ের হাড় ও মেরুদণ্ড বেঁকে যেতে পারে।
- কোমরে ও পায়ে ব্যথা হতে পারে।

কাজ – ভিটামিন-এ ও ডি এর অভাবে আমাদের দেহে কী ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

পাঠ-৭ : ভিটামিন ‘ই’ ও ‘কে’

ভিটামিন ‘ই’

ভিটামিন-ই এর আর এক নাম টোকোফেরল। এটি চর্বিতে দ্রবণীয় ও পানিতে অদ্রবণীয় একটা ভিটামিন।

উৎস – ভোজ্য তেল যেমন– সয়াবিন তেল, গমের জার্ম তেল ভিটামিন-ই-এর সবচেয়ে ভালো উৎস। গমের অংকুর, অংকুরিত ছোলা, মটরগুটি ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এ ছাড়া শাকসবজি, ফল, যকৃৎ, ডিমের কুসুম, দুধ ইত্যাদিতে ভিটামিন-ই পাওয়া যায়।

ভিটামিন-ই এর কাজ-

- এই ভিটামিন কোষগুলোকে জারণজনিত বিক্রিয়ার কারণে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে।
- কোষের মেম্ব্রেনের গঠনের জন্য অত্যাবশ্যকীয়।
- দেহের কোষে অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিডগুলোকে জারণের হাত থেকে রক্ষা করে।
- লোহিত রক্ত কণিকাকে বিভিন্ন জারক পর্দাথের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।
- প্রাণির বস্ত্র্যত্ব রোধ করে।
- ভিটামিন-এ এবং ক্যারটিনের জারণ রোধ করে।
- যকৃৎকে বিভিন্ন বিষাক্ত উপাদানের প্রভাবে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করে ভিটামিন-ই।
- চোখের ছানি পড়া রোধ করে।

অভাবজনিত অবস্থা –

- স্ত্রী ও পুরুষের বস্ত্র্যত্ব দেখা দিতে পারে।
- অকাল বার্ধক্য দেখা দিতে পারে ফলে দেহ ও মন নিষ্ঠেজ হয়ে পড়ে।
- ভিটামিন-ই-এর অভাবে অসময়ের গর্ভস্থ ভুগ্ন নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

কাজ – ভিটামিন-ই আমাদের দেহে কী ধরনের কাজ করে লেখ।

ভিটামিন-কে

ভিটামিন-কে - এর রাসায়নিক নাম ফাইটাল ন্যাপথোকুইনোন। একে রক্তক্ষরণ নিরারক ভিটামিন বা অ্যানটি হেমোরেজিক ভিটামিনও বলা হয়। এটি হলুদ বর্ণের, চর্বিতে দ্রবণীয় এবং পানিতে অদ্রবণীয় একটা ভিটামিন। তাপে, বাতাসে ও অর্দ্ধতায় ভিটামিন-কে নষ্ট হয় না, তবে আলোতে নষ্ট হয়ে যায়। ভিটামিন-কে খুব কম নষ্ট হয়।

উৎস – উদ্ভিদের সবুজ পাতা ও গাঁজানো খাবারে ভিটামিন-কে পাওয়া যায়। সবুজ রংগের শাক, ডিমের কুসুম, সয়াবিন তেল এবং যকৃতে ভিটামিন-কে পাওয়া যায়। লেটুস পাতা, পালং শাক, টমেটো, শালগম পাতা, ফুলকপি ও বাঁধাকপিতে ভিটামিন কে পাওয়া যায়। প্রাণীজ উৎসের মধ্যে সামুদ্রিক মাছ, ডিমের কুসুম, মাহস, যকৃৎ, পনির, দুধ ও দুধ-জাতীয় খাদ্যে ভিটামিন-কে থাকে।

ভিটামিন-কে এর কাজ-

- ভিটামিন-কে এর প্রধান কাজ রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করা। এই ভিটামিনের প্রভাবে দ্রুত রক্ত জমাট বাঁধার জন্য প্রোথম্বিন নামক প্রোটিন তৈরি হয়।
- পিণ্ডের স্বাভাবিক প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে ভিটামিন-কে এর ভূমিকা রয়েছে।

অভাবজনিত ফল –

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • রক্তে প্রোথম্বিনের পরিমাণ কমে যায়। • পিণ্ড নিঃসরণ ব্যাহত হয়। | <ul style="list-style-type: none"> • কেটে গেলে বা ক্ষত স্থান থেকে রক্তক্ষরণ সহজে বন্ধ হয় না। |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

কাজ – ভিটামিন কে এর অভাবে আমাদের দেহে কী ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

পাঠ-৮ : ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স – বি_১ ও বি_২

ভিটামিন ‘বি’ কোনো একক ভিটামিন না। প্রায় ১৫টি বিভিন্ন ভিটামিনকে একসাথে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স বলা হয়। এর মধ্যে নিচে উল্লেখযোগ্য ৬ টি বি-ভিটামিনের নাম দেওয়া হলো।

ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • থায়ামিন বা ভিটামিন বি_১ • রিবোফ্লাইডিন বা ভিটামিন বি_২ • নায়াসিন | <ul style="list-style-type: none"> • ফলিক এসিড • ভিটামিন বি_৩ • ভিটামিন বি_৪ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ভিটামিন-বি_১

ভিটামিন-বি_১ এর রাসায়নিক নাম থায়ামিন। এই ভিটামিন পানিতে দ্রবণীয় ও বেশি তাপে নষ্ট হয়ে যায়। খাদ্যদ্রব্য বেশি ধূলে এবং অনেক বেশি তাপে বেশি সময় ধরে রাখা করলে বি_১ নষ্ট হয়ে যায়।

ডিটাইল-বি, এর কাজ	
<ul style="list-style-type: none"> আয়ামিনের গ্রাহন কাজ হলো কার্বোহাইড্রেট বিপাকে অংশগ্রহণ করে শক্তি মুক্ত করে। স্যাভাবিক ক্ষুধা বজার গ্রাহণে সাহায্য করে। 	<ul style="list-style-type: none"> স্নানত্বকে সঞ্চিত রাখে। হৃদপিণ্ডের স্যাভাবিক কাজ নিরঙ্গণ করে।

খাল্য টুকু -

উচ্চিল উৎস - টেকিহাটা চাল, আটা, হেলার চাল, বাদাম, সরাবিন, ঘটুর চাল, আলু ইত্যাদি।

প্রাপ্তিজ্ঞ উৎস - ঘূর্ণ, হৃৎপিণ্ড, বৃক, তিম, সুখ ইত্যাদি।

অভাবজনিত অবস্থা -

ক) আয়ামিনের অব ঘাটতি হলে বে শক্তগুলো প্রকাশ পায়-

<ul style="list-style-type: none"> শারীরিক ও মানসিক অবসাদ থিটথিটে ঘেজাজ অনিদ্রা 	<ul style="list-style-type: none"> ক্ষুধামদা ওজন হ্রাস ও সূর্বলতা বৃক থড়কড় দেখা দেয়
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

খ) আয়ামিনের খূব বেশি অভাব হলে আমদের দেহে বেরিবেরি নামক ঝোপের সৃষ্টি হয়। বেরিবেরি ২ খরনের হয়। কথা - তিঙা বেরিবেরি ও শুকলা বেরিবেরি।

বেরিবেরি শক্তগুলো হলো -

- হাত-গা অবশ হবে বায়।
- হৃৎপিণ্ডের সূর্বলতা দেখা যায়।
- তিঙা বেরিবেরিতে হাত পায়ে পানি জমে যায়।
- স্নানত্ব পীড়িত হয় ও দেহে প্যারালাইসিস দেখা যায়।
- এলিমিনা দেখা যায়।
- পরিষেবে ঝোপীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পাওয়া।

এই ঝোপ যে কোনো বয়নে এমনকি শিশুদেরও হতে পাওয়া।



বেরিবেরি

কাজ - ডিটাইল-বি এর অভাবে আমদের দেহে কী খরনের সমস্যা দেখা দিতে পাওয়া দলিলভাবে উপস্থাপন কর।

ভিটামিন-বি২

ভিটামিন-বি২ এর রাসায়নিক নাম রিবোফ্লাভিন। হাতকা হলুদ বর্ণের ও তাপে সহনশীল।

ভিটামিন-বি২ এর কাজ-

- এর প্রধান কাজ হলো অ্যামাইনো এসিড, ফ্যাটি এসিড ও কার্বোহাইড্রেটের বিপাকে অংশ নিয়ে শক্তি সৃষ্টি করতে এবং সেই শক্তিকে কাজে লাগাতে সাহায্য করে।
- ঘৃকের সৌন্দর্য ও সজীবতা রক্ষা করে এবং মিউকাস মেম্ব্রেনকে সুস্থ রাখে।
- স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির জন্য এই ভিটামিন প্রয়োজন।
- সুরু পরিপাক ক্রিয়ার জন্য এই ভিটামিন প্রয়োজন।

উৎস -

- ক) প্রাণিজ উৎস - দুধ এই ভিটামিনের উৎকৃষ্ট উৎস। এ ছাড়া কলিজা, পনির, ডিম, মাছ, মাংস ও বৃক্ত উৎপন্নযোগ্য।
- খ) উত্তিজ উৎস - উত্তিজ উৎসের মধ্যে শাকসবজি, ডাল, শিম ও অর্কুলিত শস্যে পাওয়া যায়।

অভাবজনিত অবস্থা -

- রিবোফ্লাভিনের অভাবে দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
- এর অভাবে ঠোটের কোনায় ঘা হয়। যাকে অ্যাংগুলার স্টমাটাইটিস বলে।
- বি২-এর অভাবে মুখে ও জিহবা মেঝেষ্টা বর্ণ ধারণ করে। এই অবস্থাকে প্রসাইটিস বলে।
- অকালে চুল উঠে যায়।
- চোখের কর্নিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়, চোখ ঝালা করে, চোখে ছানি পড়ে ও দৃষ্টি অস্পষ্ট হয়।



অ্যাংগুলার স্টমাটাইটিস



প্রসাইটিস

কাজ - ভিটামিন-বি২ এর অভাবজনিত সমস্যাগুলো বর্ণনা কর।

পাঠ-১ : ভিটামিন সি

ভিটামিন-সি এর রাসায়নিক নাম এসকর্বিক এসিড। ভিটামিন সি পানিতে স্ববণ্ণীয় এবং তাপে নষ্ট হয়ে যায়, স্কার্টি রোগ প্রতিরোধ করে বলে একে স্কার্টি প্রতিরোধী ভিটামিন বলে।

উৎস -

উত্তিজ উৎস - আমলকী, পেয়ারা, আমড়া, লেবু, টমেটো, কমলাগেবু, তাজা শাকসবজি, ধনেগাতা, বাঁধাকপি, কামরাঙ্গা ইত্যাদি ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-সি পাওয়া যায়।

প্রাণীজ উৎস – প্রাণীজ উৎসে ভিটামিন-সি কম পাওয়া যায়। মাঝের দুধে ভিটামিন-সি বিদ্যমান।

কার্ডিকারিতা –

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বজায় রাখে। • হাড়ের চিসু গঠনে ও পুষ্টি সাধনে কাজ করে। • ভিটামিন-এ, ই এবং বি কমপ্লেক্সে-এর জারণ প্রতিহত করে। • রক্তের লোহিত কণিকা গঠনে সাহায্য করে। | <ul style="list-style-type: none"> • কোলেন্টেরল বিপাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। • ক্ষত স্থান শুকাতে সাহায্য করে। • লৌহের শোষণ বৃদ্ধি করে। |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

অভাবের ফল – ভিটামিন-সি এর গুরুতর অভাবে স্কার্টি রোগ হয়। যে কোনো বয়সেই এই স্কার্টি রোগ হতে পারে। এই রোগের লক্ষণগুলো হলো–

- দাঁতের মাড়ি ফুলে উঠে।
- দাঁতের পোড়া দিয়ে রক্ত পড়ে।
- দাঁত পড়ে যায়।
- এনিমিয়া দেখা যায়।
- হাত ও পা-এর গাঁটে ব্যথা হয় ও ফুলে যায়।
- সহজে ক্ষত শুকাতে চায় না, ভাঙ্গা হাড় সহজে জোড়া আগতে চায় না।
- চামড়ার নিচে রক্তক্ষরণ হয়ে কলচে দাগ হয়।
- সহজেই সর্দি-কাশি হয় এবং বিভিন্ন ঝোগে আক্রান্ত হয়।



স্কার্টিতে দাঁতের মাড়ি ফুলে উঠে



স্কার্টিতে চামড়ার পরিবর্তন

কাজ – আমাদের দেহে ভিটামিন-সি এর ঘাটতি হলে কী ধরনের অভাবজনিত লক্ষণ দেখা দেয় তা বোর্ডে সেখ।

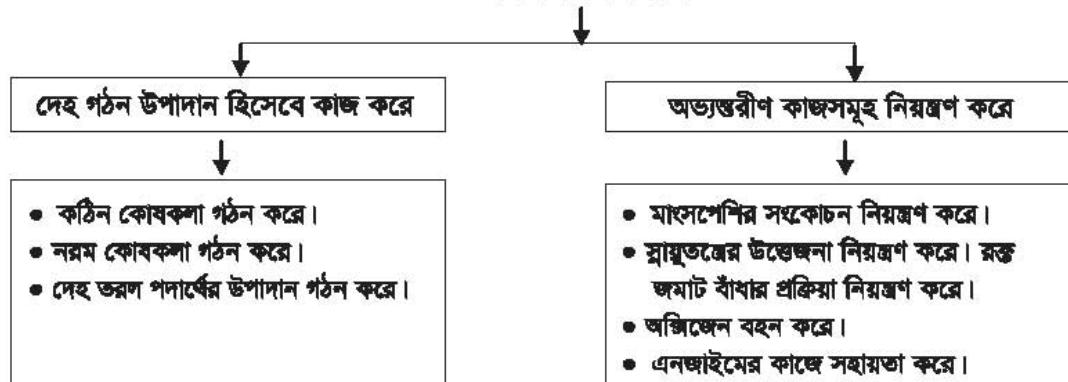
পাঠ-১০ : খনিজ লবণ-ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস

শরীর গঠনে প্রোটিনের পরেই খনিজ পদার্থ বা ধাতব লবণের স্থান। দেহের উপাদানের প্রায় শতকরা ১৬ ভাগ জৈব পদার্থ এবং ৪ ভাগ অজৈব পদার্থ বা খনিজ পদার্থ। দেহে প্রায় ২৪ প্রকার বিভিন্ন খনিজ পর্যাপ্ত রয়েছে। ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ক্লোরিন, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ, ম্যাঞ্জানিজ, তাত্ত্ব, আরোডিন, দস্তা, এলুমিনিয়ম, নিকেল ইত্যাদি খনিজ পদার্থ দেহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এগুলো খাদ্যের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হয়। কোনো খাদ্যবস্তু পোড়ালে যে সাদা ছাই অবশিষ্ট থাকে, তাকে খনিজ পদার্থ বা অজৈব লবণ বলে। পরিমাণের মাপকাঠিতে এদের ২ ভাগে ভাগ করা যায়।

০০
১) প্রধান খনিজ লবণ – অজৈব পদার্থের মধ্যে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ও গন্ধক প্রাণী দেহে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অবস্থান করে। এদের প্রধান খনিজ লবণ বলে।

(২) শেশমৌল খনিজ সবণ - লোহ, আয়োডিন, ক্রোরিন, জিংক, ম্যাঞ্চানিজ, তাত্রা, কোবাল্ট, মলিবডেনাম ইত্যাদি খুব সামান্য পরিমাণ দেহের পৃষ্ঠি কাজে অংশ নেয় বলে এসব মৌলকে শেশমৌল বলা হয়। কিন্তু এগুলো খুব সামান্য পরিমাণে প্রয়োজন হলেও এদের কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

খনিজ পদার্থের কাজ



আমরা এখন ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লোহ, আয়োডিন, জিংক, সোডিয়াম ও পটাশিয়াম নিয়ে আলোচনা করব।

ক্যালসিয়াম- খনিজ সবগের মধ্যে দেহে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। দেহের ৯৯% ক্যালসিয়াম দাতে, হাড়ে, ১% থাকে রক্তে এবং দেহের জলীয় অংশে ও কোমল তন্তুতে।

উৎস-

- প্রাণিজ উৎস - দুধ ক্যালসিয়ামের উৎকৃষ্ট উৎস। দুগ্ধজাত খাদ্য যেমন- দই, ছানা, পনির, মাওয়া, কাটাসহ ছোট মাছ ও হাড়ে ক্যালসিয়াম থাকে।
- উদ্ভিজ্জ উৎস - সবুজ শাকসবজি, সবণ, কলমি শাক, উটো শাক, পুইশাক, লালশাক, ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে। সবজির মধ্যে টেড়েল, ধূসূল, বাঁধাকপি, ফুলকপি, শিম ইত্যাদি সবজি, ছোলা, মাষকলাই, মুগ, ও সয়াবিনে ক্যালসিয়াম থাকে।

কার্যকারিতা -

- দাত ও হাড়ের গঠনে সহায়তা করা।
- রক্ত জমাট বাঁধার কাজে সাহায্য করে।
- কোনো কোনো এনজাইমকে সঞ্চয় করে।

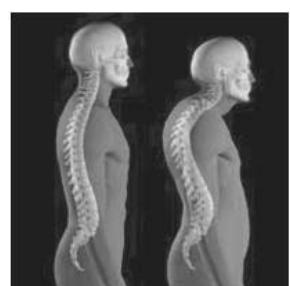
অভাবের ফল -



রিকেটস



রিকেটস এ অভাবে শিশুর
পাহের এক-এক এর চির



ক্যালসিয়ামের অভাবে
অস্টিব্যালেসিয়া অসমুক্ত

- ক্যালসিয়ামের অভাবে হাড়ের পৃষ্ঠি ব্যাহত হয়।
- দাঁত ক্ষয় হয়ে যায়।
- শারীরিক দুর্বলতা দেখা যায়।
- শিশুদের বর্ধন ব্যাহত করে।
- ক্যালসিয়ামের দীর্ঘমেয়াদি ঘাটতির ফলে শিশুদের রিকেট রোগ হতে পারে।
- বয়স্ক ব্যক্তিদের উস্টিওম্যালেসিয়া নামক রোগ দেখা দেয়।
- শরীরের কাটা স্থান থেকে রক্ত পড়া সহজে বন্ধ হয় না।

ফসফরাস – দেহের খনিজ উপাদানগুলোর মধ্যে ক্যালসিয়ামের পরেই ফসফরাসের স্থান। আমাদের দেহে জৈব ও অজৈব এই দুই ধরনের যৌগ হিসেবে ফসফরাস বিদ্যমান।

উৎস – প্রাণিজ উৎসের মধ্যে দুধ, ডিম, মাংস, যকৃৎ, মাছ এবং উত্তিজ্জ উৎসের মধ্যে শাকসবজি, ডাল, টেকি ছাঁটা সিদ্ধ চাল, মটরশুটি, ফুলকপি, গাজর ইত্যাদিতে ফসফরাস পাওয়া যায়।

কার্যকারিতা –

- দেহে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের কাজ সম্পর্কযুক্ত।
দাঁত ও হাড় গঠনে ক্যালসিয়ামের সাথে ফসফরাস
কাজ করে।
- খাদ্যদ্রব্য থেকে দেহে শক্তি মুক্ত হতে সাহায্য করে।
- দেহে প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য ফসফরাস অপরিহার্য।
- দেহের জলীয় অংশের সমতা রক্ষায় ভূমিকা রাখে।
কার্বোহাইড্রেট ও স্লেহ বিপাকে সহায়ক ভূমিকা রাখে।
- জীবকোষ সৃষ্টি ও দেহের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয়।
- দেহে কোনো কোনো অ্যানাজাইমের কাজে সহায়তা করে।
- মাঝেকামের সুস্থিতা রক্ষায় এর ভূমিকা রয়েছে।

অভাবজনিত অবস্থা – সাধারণত ফসফরাসের অভাব খুব একটা দেখা যায় না।

কাজ – ক্যালসিয়ামের অভাবে আমাদের দেহে কী ধরনের অভাবজনিত লক্ষণ দেখা দেয় তা বোর্ডে লেখ।

পাঠ-১১ : লৌহ ও আয়োডিন

লৌহ

একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দেহে ৩-৫ গ্রাম লৌহ থাকে। মানুষের দেহের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ লেশমৌল। মোট লৌহের দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৬৫% লৌহ রক্তের হিমোগ্লোবিন অণুতে বর্তমান থাকে। প্রায় ৫% পেশিতে থাকে।

উৎস –

প্রাণিজ উৎস – যকৃৎ, বৃক্ষ ও হৃৎপিণ্ডে লৌহ থাকে। দুধে সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়।

উত্তিজ্জ উৎস – সবুজ শাকসবজি, ডাল, শস্য, আপেল, গুড়, শুকনা ফলে যথেষ্ট পরিমাণে লৌহ থাকে।

কার্যকারিতা -

- রক্তের হিমোগ্লোবিন তৈরির জন্য লৌহ প্রয়োজন।
- কিছু কিছু এনজাইমের কাজে সহায়তা করে থাকে।
- জীবিত প্রাণিকোষের শ্বসণের জন্য অপরিহার্য।

অভাবজনিত লক্ষণ – খাদ্য দীর্ঘদিন লৌহের অভাব ঘটলে রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ফলে এনিমিয়া বা রক্তস্বল্পতা দেখা যায়। এর ফলে যে লক্ষণগুলো দেখা যায় তা হলো-

- শিশুদের ক্ষেত্রে ক্ষুধাহীনতা থাকে।
- শিশুদের দেহের বর্ধন ব্যাহত হয়।
- শরীর দুর্বল লাগে ও চেহারা ফ্যাকাশে দেখায়।
- কাজ করার ক্ষমতা কমে যায়।
- কখনো কখনো শ্বাসকষ্টও হতে পারে।

কাজ – লৌহের অভাবে আমাদের দেহে কী ধরনের অভাবজনিত লক্ষণ দেখা দেয় তা দলীয়ভাবে উপস্থাপন কর।

আয়োডিন

মানুষের দেহে আয়োডিনের পরিমাণ ১২-১৫ মিলিয়াম। শরীরের পুষ্টির জন্য আয়োডিন একটি অত্যাবশ্যকীয় লেশমৌল। দুই-তৃতীয়াংশ আয়োডিন থাকে থাইরয়েড গ্রন্থিতে।

উৎস – সামুদ্রিক মাছ, সমুদ্রের তীরবর্তী এলাকার শাকসবজি ও পশুর মাংসে পাওয়া যায়।

কার্যকারিতা –

আয়োডিন দেহে থাইরয়েড গ্রন্থিতে থাইরঙ্গিন হরমোন তৈরিতে সাহায্য করে। আয়োডিন যুক্ত এই হরমোন মানবদেহে বিভিন্ন কাজ করে থাকে। যেমন–

- শিশুর দেহের স্বাভাবিক বর্ধনের জন্য প্রয়োজন।
- দেহের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে।
- মস্তিক ও স্নায়ুর বিকাশে সাহায্য করে।

অভাবজনিত সমস্যা – খাদ্য আয়োডিনের ঘাটতি থাকলে যে সমস্যাগুলো হয় তা হলো–

(১) গলগত বা গয়টার – আয়োডিনের অভাব হলে গলগত হয়। এই রোগে আয়োডিনের অভাবে থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে থাইরঙ্গিন হরমোন তৈরি হতে পারে না। ফলে থাইরয়েড গ্রন্থি হরমোন তৈরির জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করে বলে গ্রন্থিটি বড় হয়ে যায়। ফলে বাইরে থেকে গলা ফুলা দেখা যায়। এ ছাড়া এই রোগে বুদ্ধি ও চলনশক্তি হ্রাস, মানসিক অক্ষমতা, তোতলামি, মাঝস্পেশির সংকোচন, স্নায়বিক দুর্বলতা এসব লক্ষণ প্রকাশ পায়।

(২) হাইপোথাইরয়েডিজিম (ধায়রয়েড গ্রন্থির কর্ম ক্ষমতা হ্রাস) – দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী থাইরঙ্গিন হরমোন তৈরি না হলে এই অবস্থাকে হাইপোথাইরয়েডিজিম বলে। এর লক্ষণ হলো– আলসেমি, শুকনা চামড়া, ঠাণ্ডা সহ্য করতে না পারা, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি। এর প্রভাবে ছোট শিশুরা মানসিক প্রতিবন্ধীতে পরিণত হয়।

(ত) কেটিনিজম (হ্যাবোগোবা ও বামলক্ষ) দেখা নিতে পাই।



আমোডিনের অভাবে গয়টার



একই ক্ষয়ের স্বাভাবিক উচ্চতার ব্যাকির
মাখানে আমোডিনের অভাবে সৃষ্টি কেটিনিজমে
(হ্যাবোগোবা ও বামলক্ষ) আজাজ ব্যাকি

কাজ – আমোডিনের অভাবজনিত শক্তি সম্পর্কে দেখ।

পাঠ ১২ – পানি

মানুষের বৈচে ধাকার জন্য পানি অত্যাবশ্যকীয়। মানুষ করেক সম্ভাহ খাবার না খেরেও বৈচে ধাকতে পারে। কিন্তু পানি না খেনে এক দিনের বেশি ধাকতে পারে না। মানুষের দেহ ৫৫-৭৫% পানি ধারা গঠিত। শরীরের সকল টিসুতেই পানি থাকে। প্রতিদিন মল, মৃত্ত, ফসফট ও চামড়ার মাঝেমে শরীর থেকে পানি বের হয়ে যায় এবং মানুষের দেহ পানি সংরক্ষ করে রাখতে পারে না। তাই প্রতিদিনই কিসুম্প পানি পান করতে হয়। কী পরিমাণ পানি পান করতে হবে তা নির্ভর করে কী ধরনের শারীরিক পরিশ্রম করা হচ্ছে, কী খাবার খাওয়া হচ্ছে ইত্যাদি বিষয়ের উপর। প্রতিদিন যে পরিমাণ পানি শরীর থেকে বেরিয়ে যাব সেই পরিমাণ পানি পান করা প্রয়োজন। খাবার থেকে থার ১ লিটার পানি পাওয়া যায় এবং বাকিটা প্রতিদিনের শৃঙ্খলকৃত তরঙ্গ ও পানীয় থেকে পেতে হবে। পচে একজন মানুষের প্রতিদিন ২.৫-৩ লিটার পানি শরীর থেকে বের হয়ে যাব। একজন স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের দিনে ৬-৮ গ্লাস পানির প্রয়োজন হয়। তবে পানির চাহিদা নিম্নলিখিত অবস্থায় বেড়ে যাব-

- শুরু বেশি পরম আবহাওয়ার করণে অনেক ঘাম হলে।
- শুরু হলে।
- ডায়ারিয়া হলে ও বমি হলে।
- অনেক বেশি পরিশ্রম করলে।
- শরীরবৃক্ষীয় খেলাখুলা করলে বা ঘাম বারিয়ে ব্যায়াম করলে।
- খাবারে আশ-জাতীয় খাদ্য বেশি থাকলে।

- স্তন্যদাত্রী মা সন্তানকে দুধ পান করালে।
- যাঁরা উড়োজাহাজে অমগ করেন তাঁদের ক্ষেত্রে প্রতি ৩-৪ ঘণ্টা উড়োজাহাজে অমগের জন্য প্রায় ১.৫ লিটার পানি বের হয়ে যায় অর্থাৎ পানির চাহিদা বাড়ে।
- বিভিন্ন ধরনের উষ্ণ সেবনের কারণেও পানির চাহিদা বাড়ে।

পানির উৎস – পানির প্রধান উৎস হচ্ছে খাবার পানি, ডাবের পানি, দুধ, ফলের রস, সুপ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পানীয়। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের রসাল ফল, যেমন- তরমুজ ইত্যাদিতেও প্রচুর পরিমাণে পানি থাকে।

পানির কাজ-

- শরীরের প্রতিটি কোষের স্বাভাবিক কাজ বজায় রাখার জন্য পানি প্রয়োজন হয়।
- খাদ্য পরিপাক ও শোষণে সহায়তা করে।
- শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থ বের করার জন্য পানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় রাখার জন্য পানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- কোষে পুষ্টি উপাদান পরিবহণে সাহায্য করে।
- কোষ্ঠকাঠিন্য রোধ করে।

অভাবজনিত অবস্থা – শরীরে পানির পরিমাণ খুব কমে গেলে সেই অবস্থাকে ডিহাইড্রেশন বা পানি শুষ্কতা বলে।

ডিহাইড্রেশনের কারণগুলো হলো-

- অতিরিক্ত গরম আবহাওয়া, আর্দ্রতা, ব্যায়াম অথবা জ্বরের কারণে ঘাম বেশি হওয়া।
- পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান না করা বা খাদ্যে তরল জাতীয় খাদ্যের ঘাটতি থাকা।
- ডায়ারিয়া হওয়া।
- অতিরিক্ত বমি হওয়া।

ডিহাইড্রেশনের লক্ষণগুলো হলো -

- মাথা ধরা
- দুর্বল লাগা
- ঠোঁট শুকিয়ে যায় বা ফেটে যায়
- মূত্রের রং গাঢ় হয়।

ডিহাইড্রেশন থেকে শরীরে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। তাই ডিহাইড্রেশন প্রতিরোধে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি গ্রহণ করা দরকার।

কাজ – আমাদের দেহে প্রতিদিন কী পরিমাণ পানির প্রয়োজন হয়? কোন কোন অবস্থায় পানির চাহিদা বৃদ্ধি পায় তা লেখ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোনটি অঙ্গিজেন পরিবহনে সহায়তা করে?

- | | |
|----------------|-------------|
| ক) এনজাইম | খ) হরমোন |
| গ) হিমোগ্লোবিন | ঘ) এন্টিবডি |

২। খাদ্যের কোন উপাদানটি আমাদের দেহকে বিভিন্ন অণুজীবের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে?

- | | |
|------------|-------------------|
| ক) প্রোটিন | খ) কার্বোহাইড্রেট |
| গ) স্লেহ | ঘ) পানি |

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ও ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

নাসিমা খাতুন সব সময়ই শাকসবজি ছোট ছোট টুকরা করে কাটেন। এরপর পানি দিয়ে ভালোভাবে ধূয়ে রান্না করেন। তা দেখে প্রতিবেশী আপা বলেন, “তোমার তৈরিকৃত খাদ্যে দরকারি একটি উপাদান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।”

৩। নাসিমা খাতুনের রান্নায় খাদ্যের কোন উপাদানটির অপচয় হচ্ছে?

- | | |
|--------------|---------------|
| ক) ভিটামিন এ | খ) ভিটামিন সি |
| গ) ভিটামিন ই | ঘ) ভিটামিন কে |

৪। শুই পরিবারের সদস্যরা –

- চোখের সমস্যায় ভুগতে পারে
- অসময়ে দাঁত হারাতে পারে।
- সহজেই সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত হতে পারে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

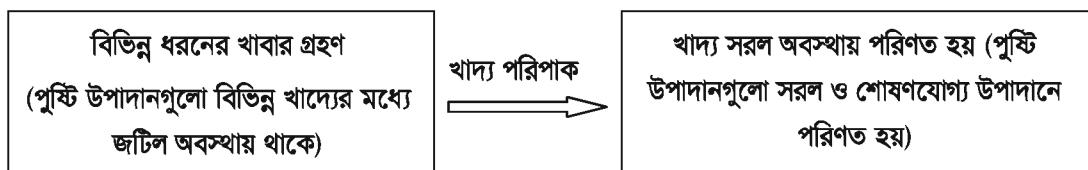
- ১। সানার বয়স পাঁচ বছর। তাকে তার সমবয়সীদের তুলনায় ছোট দেখায়। ইদানীং সে অল্পতেই রেগে যায়। দিন দিন তার চুলের রং ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। মা তাকে ডাঙ্গারের কাছে নিয়ে গেলে তিনি সানার খাদ্যভ্যাস জানতে চান। সব শুনে তিনি সানার গৃহীত খাবারে একটি বিশেষ উপাদানের ঘাটতি রয়েছে বলে মাকে জানান এবং পরবর্তী জটিলতা এড়ানোর জন্য সানাকে সেই উপাদান সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ানোর পরামর্শ দেন।
- ক. কোনটি ছাড়া প্রাণীর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না?
- খ. অ্যামাইনো এসিড বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।
- গ. সানার দেহে কোন উপাদানের অভাবে উল্লিখিত সমস্যাগুলো হচ্ছে। ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. সানার শারীরিক অবস্থা উন্নতণে ডাঙ্গারের পরামর্শটি মূল্যায়ন কর।
- ২। দশম শ্রেণির ছাত্রী পূর্ণির পড়াশোনার প্রচঙ্গ চাপ। প্রতিদিন স্কুল ছুটির পর সে হেঁটে বাসায় ফেরে। তারপর অতি দুর্ত তার ঘামে ভেজা কাপড় পাণ্টিয়ে সে আবার বাইরে শিক্ষকের কাছে পড়তে যায়। এ সময়ে মা তাকে ডাবের পানি, লেবুর শরবত কিংবা ফলের সুগ-জাতীয় পানীয় খেতে দিলে পূর্ণি তা খেতে চায় না। দুপুর কিংবা রাতের খাবারের পরও সে পানি কম খায়। ফলে বেশ কিছুদিন যাবৎ তার শারীরিক সমস্যা হচ্ছে।
- ক. সবচেয়ে বেশি শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য উপাদান কোনটি?
- খ. খাদ্যই বেঁচে থাকার নিয়ামক-বুঝিয়ে লেখ।
- গ. পূর্ণি কী ধরনের সমস্যায় ভুগছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. পূর্ণির শারীরিক সমস্যার সমাধান তার নিজের পক্ষেই করা সম্ভব-বিশ্লেষণ কর।

একাদশ অধ্যায়

খাদ্যের পরিপাক ও খাদ্য পরিকল্পনা

পাঠ-১ : খাদ্যের পরিপাক

বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন প্রকার উৎস থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে থাকি। অধিকাংশ খাদ্যবস্তুই দেহে সরাসরি কাজে লাগে না। কারণ খাদ্য হিসেবে আমরা যেগুলো গ্রহণ করি, সেগুলোর অধিকাংশই বৃহৎ অণুবিশিষ্ট এবং এদের রাসায়নিক গঠন অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির। খুব সামান্য পরিমাণে কয়েকটি খাদ্যবস্তু যেমন – গুকোজ ও কয়েকটি খনিজ লবণ সরাসরি কাজে লাগে। অধিকাংশ খাদ্যবস্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে দেহের গ্রহণ উপযোগী সরল উপাদানে পরিণত হওয়ার পর তা শরীরের কাজে আসে। যেমন – ভাতের প্রধান পুষ্টি উপাদান স্টার্চ। ভাত খাওয়ার সাথে সাথেই এই স্টার্চ শরীরের কোনো কাজে আসবে না। কারণ স্টার্চ অনেক গুকোজ অণুর সমন্বয়ে গঠিত। তাই খাওয়ার পর স্টার্চ ভেঙ্গে গুকোজে পরিণত হলে দেহ গুকোজ শোষণ করে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করবে। তেমনি খাদ্যে অবস্থিত বড় বড় প্রোটিন অণুগুলো ভেঙ্গে অ্যামাইনো এসিডে এবং খাদ্যের ফ্যাট ভেঙ্গে ফ্যাট এসিড ও গ্লিসারলে পরিণত হওয়ার পর এই সকল সরল উপাদান শোষিত হয়ে সরাসরি দেহের কাজে লাগবে।



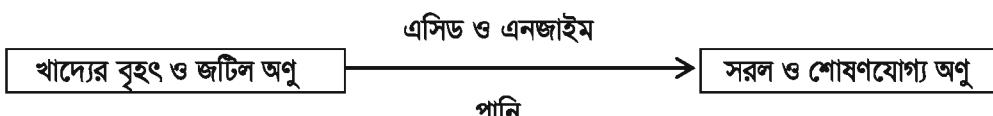
খাদ্য পরিপাকের পরিণতি

যে কোনো খাদ্য বস্তুকে শরীরে কাজে লাগানোর জন্য খাদ্যের বড় বড় অণুগুলো ভেঙ্গে ছোট ছোট সরল অণুতে পরিণত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। খাদ্যের এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে দেহের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় পরিণত হয় পাচন ক্রিয়া বা পরিপাক ক্রিয়ার মাধ্যমে।

পরিপাক

খাদ্য উপাদানের বৃহৎ ও জটিল অণুগুলো ক্ষুদ্র ও সরল অণুতে রূপান্তরিত হয়ে শরীরে শোষিত হয়ে রক্তস্তোতে মিশে যায়। বৃহৎ উপাদান থেকে ক্ষুদ্র ও সরল উপাদানে পরিণত হওয়ার কাজ বিভিন্ন ধরনের এসিড ও এনজাইমের সাহায্যে ধাপে ধাপে বিক্রিয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে। খাদ্যের এই জটিল উপাদান থেকে সরল উপাদানে পরিণত হওয়া ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে পরিপাক ক্রিয়া বলে।

“যে প্রক্রিয়ায় খাদ্যবস্তুর বৃহত্তর জটিল অণুগুলো বিভাজিত হয়ে বা ভেঙ্গে দেহের উপযোগী ও বিশোষণযোগ্য সরল ও ক্ষুদ্রতর অণুতে পরিণত হয় তাকে পরিপাক (Digestion) বলে”।

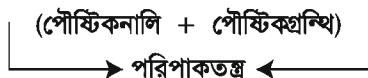


পরিপাক ক্রিয়া

পরিপাক ক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্যের কার্বোহাইড্রেট ভেঙে গুকোজে, প্রোটিন ভেঙে অ্যামাইনো এসিড এবং ফ্যাট ভেঙে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে রূপান্তরিত হয়। এভাবে পরিপাক ক্রিয়ার মাধ্যমে সকল খাদ্যবস্তুই ভেঙে সহজ উপাদানে পরিণত হয় এবং শরীরের পুষ্টি সাধন করে। সকল খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়া দেহের পরিপাকতন্ত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

পরিপাকতন্ত্র

মানবদেহে পরিপাক ক্রিয়া শরীরের একটি মাত্র অংগে সংঘটিত হয় না। শরীরের বেশ কয়েকটি অংগ এই কাজের সাথে জড়িত। যেমন দাঁত দিয়ে চর্বনের মাধ্যমে খাদ্যবস্তু ছেট ও নরম করা হয়। অন্তর্নালির মাধ্যমে চর্বিত নরম খাদ্যবস্তুগুলো পাকস্থলিতে আসে এবং পরিপাক ক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে। পাকস্থলিতে খাদ্যবস্তুর সম্পূর্ণ পরিপাক হয় না, তাই অপরিপাককৃত খাদ্যবস্তুগুলো ক্ষুদ্রান্তে আসে। এখানেই প্রধান পরিপাক কাজ চলে। এরপর বৃহদন্ত্রে খাদ্যবস্তুগুলো প্রবেশ করে এবং পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন করে। পরিপাকের ফলে উৎপন্ন সরল উপাদানগুলো শরীরের মধ্যে শোষিত হয় এবং যে বস্তুগুলো পরিপাক ও শোষিত হয় না অর্থাৎ অপাচ্য দ্রব্যগুলো দেহ নিষ্কাশন করে। খাদ্যকে দেহের গ্রহণ উপযোগী করার জন্য দেহের বিভিন্ন অংশে এই পরিপাক ক্রিয়া সংঘটিত হয়। “দেহের যে অংশের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যবস্তু গ্রহণ, খাদ্যবস্তুর পরিপাক ও শোষণ এবং অপাচ্য অংশের নিষ্কাশণ ঘটে, তাকে পরিপাকতন্ত্র (Digestive System) বলে।” মানবদেহের পরিপাকতন্ত্রটি পৌষ্টিকনালি ও পৌষ্টিকগ্রান্থি নিয়ে গঠিত।



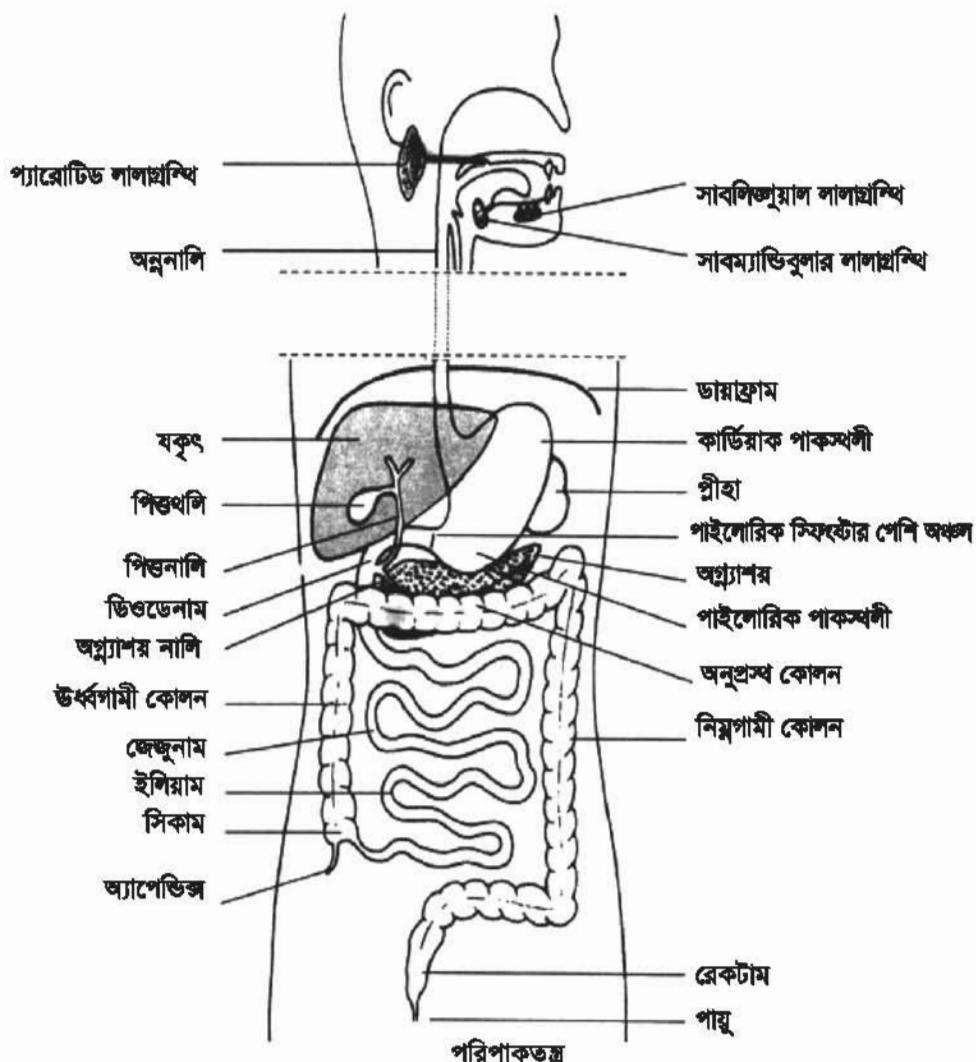
পৌষ্টিকনালির অন্তর্গত অঙ্গগুলো হচ্ছে মুখবিবর, গলাবিল, অন্তনালি, পাকস্থলি, ক্ষুদ্রান্ত ও বৃহদন্ত্র। আর পৌষ্টিক গ্রন্থিগুলো হচ্ছে লালাগ্রান্থি, যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয়।

পৌষ্টিকনালি – মুখবিবর হতে মলদ্বার পর্যন্ত খাদ্যবাহী নালিটিকেই পৌষ্টিকনালি বলে। নিম্নে পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দেওয়া হলো –

পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশ	
ক) মুখবিবর (Buccal cavity)	ঘ) পাকস্থলি (Stomach)
খ) গলাবিল (Pharynx)	ঙ) ক্ষুদ্রান্ত (Small Intestine)
গ) অন্তনালি (Oesophagus)	চ) বৃহদন্ত্র (Large Intestine)

প্রোটিক্রাই

লালঘংস্থি, যকৃৎ ও অঞ্চ্যাশয়।



কাজ - আমাদের দেহে খাদ্য পরিপাকের সাথে জড়িত অংগগুলো বোর্ডে চিত্রের মাধ্যমে চিহ্নিত কর।

পাঠ ২ - কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ও প্রোটিন পরিপাক

বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়ে সরল উপাদানে পরিণত হয়, অবশেষে রক্তের মধ্যে শোষিত হয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে পরিচালিত হয়। পরিপাকের জন্য অপরিহার্য এনজাইমসমূহ লালারস, পাচক রস, অঞ্চ্যাশয় রস ও আঞ্চিক রসে অবস্থিত। এ ছাড়া পিণ্ডরস পরিপাক কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে। বিভিন্ন খাদ্য উপাদান বিভিন্ন এনজাইমের উপস্থিতিতে বিভিন্নভাবে ও ভিন্ন গতিতে

ফর্মা-১৫, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান-৯ম শ্রেণি

পরিপাক হয়ে থাকে। খাদ্যের কার্বোহাইড্রেট এবং ফ্যাট পরিপাকের জন্য সবচেয়ে বেশি সময় প্রয়োজন হয়। খাদ্য মুখগহৰ হতে মলদ্বার পর্যন্ত আসার জন্য প্রায় ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা সময় প্রয়োজন হয়। নিম্নে বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের পরিপাক পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো।

কার্বোহাইড্রেটের পরিপাক (Digestion of Carbohydrates) - শক্তির প্রধান উৎস হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট। আমাদের দৈনিক শক্তি চাহিদার ৬০%-৮০% কার্বোহাইড্রেট থেকে গ্রহণ করি। কার্বোহাইড্রেট দেহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য তাপ ও শক্তি সরবরাহ করে। ভাত, বুটি, আলু, চিনি, গুড়, মধু, ফল ইত্যাদি কার্বোহাইড্রেটের প্রধান উৎস। এ সকল খাদ্যদ্রব্য পরিপাকের মাধ্যমে সরল উপাদানে পরিণত হয় এবং পরে শক্তি উৎপন্ন করে। মনোস্যাকারাইডের কোনো পরিপাকের প্রয়োজন হয় না। এরা সরাসরি রক্তে বিশ্লেষিত হতে পারে। ডাইস্যাকারাইড ভেঙে দুটি মনোস্যাকারাইড উৎপন্ন হয় এবং পলিস্যাকারাইড ভেঙে প্রথমে ডাইস্যাকারাইড এবং পরে মনোস্যাকারাইড উৎপন্ন হয়।

পরিপাকত্বের বিভিন্ন অংশে কার্বোহাইড্রেট পরিপাকের পর শোষণযোগ্য উপাদানে পরিণত হয় ও শোষিত হয়।

ফ্যাটের পরিপাক (Digestion of Fat) - ফ্যাটকে ঘনীভূত শক্তির উৎস বলা হয়। কারণ খাদ্য উপাদানগুলোর মধ্যে ফ্যাটই সবচেয়ে বেশি তাপ ও শক্তি সরবরাহ করে থাকে। ফ্যাটের প্রধান উৎস হচ্ছে তেল, ঘি, মাখন, চর্বিযুক্ত মাংস, তৈলাক্ত মাছ, ডিমের কুসুম, দুধের সর ইত্যাদি। ফ্যাট-জাতীয় খাদ্য ভেঙে গ্লিসারল ও ফ্যাটি এসিডে পরিণত হয়। পাকস্থলিতে পিস্তলবর্ণের অভাব থাকায় এখানে ফ্যাটের সম্পূর্ণ পরিপাক হয় না।

প্রোটিনের পরিপাক (Digestion of Protein) - খাদ্যের পুষ্টি উপাদানগুলোর মধ্যে প্রোটিন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি প্রাণি ও উদ্ভিজ্জ কোষে প্রোটিন আছে। প্রোটিন এর প্রধান কাজ হচ্ছে দেহের গঠন, ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি সাধন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। প্রোটিন সর্বাপেক্ষা জটিল জৈব পদার্থ। বড় বড় প্রোটিন অণু পরিপাক হয়ে এর গাঠনিক একক অ্যামাইনো এসিডে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত শরীরের কোনো কাজে লাগে না।

পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রাত্মে প্রোটিন পরিপাকের পর শোষণযোগ্য উপাদান অ্যামাইনো এসিডে পরিণত হয় ও শোষিত হয়।

কাজ - কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট পরিপাকের পর কী কী উপাদান উৎপাদিত হয়?

পাঠ-৩ : কিশোর-কিশোরীর খাদ্য পরিকল্পনা

শৈশব থেকে পূর্ণ বয়সে পরিনত হওয়ার মধ্যবর্তী সময়কালকে কৈশোর কাল বলা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংঠার মতে ১০-১৯ বছর বয়স এই সময়টা হলো কৈশোর কাল। এই বয়সে শারীরিক বর্ধন দ্রুত হয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে ১২-১৫ বছর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১০-১৩ বছর বয়সে বর্ধনের গতি সর্বোচ্চ হয়।

এই বয়সে বর্ধনের গতি বৃদ্ধির কারণে শক্তির চাহিদা বাঢ়ে, এ ছাড়া প্রোটিন, ভিটামিন ও ধাতব লবণের চাহিদাও বাঢ়ে। এই বয়সের কিশোর-কিশোরী খেলাধুলা করে তাই তাদের শরীরের বিভিন্ন অংগের সংশ্লিষ্ট ঘটে বলে শক্তির খরচ হয়। কিশোর-কিশোরীদের পেশির গঠন, দাঁত, হাড়, রক্ত গঠন ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের চাহিদা বেশি হয়।

কিশোর-কিশোরীর পুষ্টির গুরুত্ব -

- **কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক বর্ধন দ্রুত হয় এবং এই বর্ধনের স্বাভাবিক গতি বজায় রাখার জন্য পর্যাপ্ত কিলো ক্যালরি বা শক্তিসমৃদ্ধ ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্য গুরুত্বপূর্ণ।**
- **এই বয়সে শরীরের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা, পড়ালেখা, বহিরাঙ্গনে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলায় অংশগ্রহণের জন্য জীবনের অন্য সময়ের চেয়ে বেশি শক্তির অর্থাৎ কিলো ক্যালরির প্রয়োজন হয়। এই বর্ধিত শক্তির চাহিদা মেটানোর জন্য কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন হয়।**
- **কিশোর-কিশোরীদের ভিটামিন ও ধাতবলবণ সমৃদ্ধ খাদ্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।**
- **দাঁত ও হাড় গঠনের জন্য ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন-ডি কিশোর-কিশোরীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।**
- **এই বয়সে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের লৌহ ও ফলিক এসিড বেশি প্রয়োজন হয়। কারণ, মেয়েদের মাসিকের জন্য প্রতিমাসে যে রক্তের অপচয় ঘটে তার পরিপূরণের জন্য অর্থাৎ রক্ত গঠনের জন্য প্রয়োজন হয়।**
- **কিশোর-কিশোরীদের দেহ ত্বকের ও চোখের সুস্থিতার জন্য ভিটামিন- এ, বি ও সি সমৃদ্ধ খাদ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।**

কিশোর-কিশোরীর পুষ্টির চাহিদা -

- **শক্তির চাহিদা -** বর্ধনের গতি বৃদ্ধির কারণে শক্তি বা কিলো ক্যালরির চাহিদা বাড়ে। মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের কিছুটা বেশি শক্তি বা কিলো ক্যালরির প্রয়োজন হয়।
- **প্রোটিন -** কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক বর্ধন দ্রুত হয় এবং এই বর্ধনের স্বাভাবিক গতি বজায় রাখার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিনের শক্তি চাহিদার $12\%-15\%$ প্রোটিন জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। $10-12$ বছর বয়সের মেয়েদের প্রোটিনের চাহিদা ছেলেদের চেয়ে কিছুটা বেশি হয়।
- **ধাতবলবণ -** কিশোর-কিশোরীদের হাড়ের বর্ধনের জন্য ক্যালসিয়ামের চাহিদা প্রাপ্ত বয়স্কদের চেয়ে বেশি হয়। হাড়ের যথাযথ বর্ধন নিশ্চিত করার জন্য প্রতিদিন অবশ্যই 150 মিলি গ্রাম ক্যালসিয়াম শরীরে জমা হতে হবে। এই বয়সে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি থাকলে পরবর্তী জীবনে ওস্টিওপোরোসিস দেখা দেওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি বেড়ে যায়। রক্তের হিমোপ্লেবিন সংশ্লেষণের জন্য কিশোরীদের লৌহের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। মাসিকের কারণে লৌহের অপচয় ঘটে বলে কিশোরদের চেয়ে কিশোরীদের লৌহের চাহিদা বেশি হয়। এই বয়সে জিংকের চাহিদাও বাড়ে। এর অভাবে এই বয়সে শারীরিক স্বাভাবিক পরিবর্তনগুলোও পরিগতিতে বিলম্ব হতে পারে।
- **ভিটামিন- শক্তির চাহিদা বেশি হওয়ায় থায়ামিন, রিবোফ্লারিন এবং নায়াসিন-এর চাহিদা বাড়ে।** এই বয়সে দ্রুত টিসু সংশ্লেষিত হওয়ার কারণে ফলিক এসিড ও ভিটামিন বি 1 ও বি 6 -এর চাহিদাও বাড়ে। মাসিকের কারণে কিশোরীদের ভিটামিন বি 1 চাহিদা বেশি হয়। হাড়ের বৃদ্ধির জন্য কিশোর-কিশোরীদের ভিটামিন ডি প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া এই বয়সে প্রজননতন্ত্রের সুস্থ ও স্বাভাবিক গঠনের জন্য ভিটামিন এ, ই ও সি এর প্রয়োজন হয়।

অতএব আমরা দেখতে পাই যে, কিশোর-কিশোরীদের স্বাভাবিক ওজন, উচ্চতা, সুস্থিতা এবং পড়ালেখা ও খেলাধুলার ক্ষমতা ও দক্ষতা বজায় রাখার জন্য প্রতিদিন খাদ্যে ছয়টি পুষ্টি উপাদানেরই পর্যাপ্ত ক্যালরি উপস্থিতি অত্যাবশ্যক। তাই প্রতিদিনের খাদ্য তালিকা থেকে কিলো ক্যালরিসহ প্রয়োজনীয় ছয়টি পুষ্টি উপাদান পেতে হলে খাদ্যের মৌলিক খাদ্য গোষ্ঠীর প্রতিটি গুপ্ত থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য প্রতিদিনই কিশোর-কিশোরীদের নির্ধারিত কিলো ক্যালরি গ্রহণ করতে হবে।

কিশোর-কিশোরীদের খাদ্য তালিকা তৈরির সময় কয়েকটি বিষয় লক্ষ রাখতে হবে। যেমন-

- কিশোর-কিশোরীদের প্রতিদিন কমপক্ষে তিন বেলা প্রধান খাবার ও দুইবার হালকা নাশতা দিতে হবে। এই বয়সে শিশুরা বেশ দীর্ঘ সময় স্কুলে থাকে, স্কুলে পড়ালেখার পাশাপাশি তারা খেলাধুলাও করে থাকে, ফলে প্রচুর শক্তির খরচ হয়। তাই স্কুলে থাকাকালীন একবার পুষ্টিকর নাশতা দিতে হবে এবং বাসায় আরও একবার নাশতা থাবে। তাহলে অপুষ্টি জনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কমে যাবে।
- প্রতি বেলার প্রধান খাবারে অর্ধাং সকাল, দুপুর ও রাতের বেলায় মৌলিক গোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণির বিভিন্ন ধরনের খাদ্য গ্রহণ করতে হবে।
- কিশোর-কিশোরীদের প্রতিদিন প্রয়োজনীয় কিলো ক্যালরির চাহিদা যাতে পুরণ হয় সেজন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে শস্য ও শস্য-জাতীয় খাদ্য প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় থাকতে হবে।
- প্রতিদিনই উচ্চিজ্জ্বল ও প্রাণিজ উভয় উৎস থেকেই প্রোটিন গ্রহণ করতে হবে। দিনে অস্তত একবার প্রাণিজ প্রোটিন গ্রহণ করতে হবে।
- প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় বিভিন্ন ধরনের মৌসুমি ও রঙিন যেমন- হলুদ, সবুজ, লাল, বেগুনি, সাদা ইত্যাদি বর্ণের শাকসবজি ও তাজা টক-জাতীয় ফল অবশ্যই থাকতে হবে।
- সারা দিনে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি গ্রহণ করতে হবে। সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য দিনে ৬-৮ গ্লাস পানি পান করা প্রয়োজন। অতিরিক্ত পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের সফট ড্রিংকস, জুস, মিষ্টি-জাতীয় খাবার ও তেলে তাজা খাবার গ্রহণে সচেতন হতে হবে। মনে রাখতে হবে এই খাবারগুলোতে বেশি ক্যালরি থাকে। যারা পরিশ্রমের কাজ করে বা একেবারেই করে না বা খেলাধুলা করে না তারা এই খাদ্যগুলো প্রতিদিন গ্রহণ থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে। তা না হলে শরীরের ওজন বেশি বেড়ে যাবে অর্ধাং ওজনাধিক্যে আক্রান্ত হবে এবং নানা ধরনের জটিল রোগের সূচনা হবে।
- এই বয়সে ফাস্টফুড এর প্রতি প্রায় বেশির ভাগ কিশোর-কিশোরীরই ঝৌক থাকে। এই খাবারগুলো কোনো বিশেষ দিন বা উপলক্ষে গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে প্রতিদিনই যদি ফাস্টফুড গ্রহণ করে তাহলে খুব সহজেই তাদের শরীরের ওজন বেড়ে যাবে এবং নানা ধরনের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি দেখা দেবে।
- সুস্বাস্থ্য রক্ষায় সঠিক খাদ্যাভাসের ব্যাপারে কিশোর-কিশোরীদের সচেতন হতে হবে। মনে রাখতে হবে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি বাড়ায় এমন সব মজাদার ও পছন্দের খাবারের পরিবর্তে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস করতে হবে।

কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী এক দিনের জন্য একটি খাদ্য তালিকা দেওয়া হলো—

বিভিন্ন প্রেরণির খাদ্য	এক পরিবেশন পরিমাণ	কিশোর (পরিবেশন সংখ্যা)	কিশোরী (পরিবেশন সংখ্যা)
শস্য ও শস্য –জাতীয় খাদ্য	আধা কাপ ভাত, একটি রুটি, এক টুকরো পাউরুটি।	৮-৯	৬-৮
প্রোটিন–জাতীয় খাদ্য	একটি ডিম, মাঝারি এক টুকরা মাছ বা মাঃস, এক কাপ মাঝারি ঘন রান্না ডাল, আধা কাপ রান্না করা ঘন ডাল, আধা কাপ রান্না মটরশুটি, ১/৩ কাপ বাদাম।	৩-৫	৩-৪
শাক–সবজি	এক কাপ কাঁচা সবজি সলাদ, আধা কাপ বিভিন্ন রান্না সবজি, আধা কাপ রান্না শাক, একটা আলু।	৪-৫	৩-৪
ফল	একটি মাঝারি কলা, পেয়ারা, আম, কমলা, আধা কাপ টুকরা ফল।	৩-৪	৩-৪
দুধ ও দুধ –জাতীয় খাদ্য	এক কাপ দুধ বা দই, আধা কাপ ছানা।	২-৪	২-৪
তেল ও ঘি	উচ্চিজ্জ তেল, ঘি, চিনি, গুড় ও বিভিন্ন মিষ্টি জাতীয় খাবার।	কম ক্যালরি	কম ক্যালরি

চিনি, গুড় ও বিভিন্ন মিষ্টি–জাতীয় ও লবণ–জাতীয় খাবার এই বয়স থেকেই কম গ্রহণের অভ্যাস করা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। মনে রাখতে হবে বাইরের কেনা খাবারের চেয়ে ঘরে তৈরি খাবার এবং মৌসুমি শাকসবজি ও ফল বেশি পুষ্টিকর এবং স্বাস্থ্যসম্মত। তাই কিশোর–কিশোরীদের এই খাবারগুলো গ্রহণে সচেতন হতে হবে।

কাজ – তোমার জন্য একদিনের একটি খাদ্য তালিকা তৈরি কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোনটি পৌষ্টিকগুলি?

- | | |
|-------------|---------------|
| ক) গলবিল | খ) অগ্ন্যাশয় |
| গ) পাকস্থলি | ঘ) বৃহদন্ত্র |

২। কিশোর–কিশোরীর দাঁত ও হাড়ের গঠনের জন্য উপযোগী খাদ্য কোনটি?

- | | |
|---------|----------|
| ক) পনির | খ) লেবু |
| গ) আলু | ঘ) বাদাম |

নিচের উক্তীপক্টি পড়ে ও ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

তাসনিমের বয়স ১২ বছর। তার মা তাকে প্রায়ই টিফিলে ছানা, পনির, কাবাব, টিকিয়া ইত্যাদি খাবারগুলো খেতে দেন।

৩। এই খাবারগুলো থেকে তাসনিম কোন খাদ্য উপাদানটি পাবে?

- | | |
|-------------------|------------|
| ক) কার্বোহাইড্রেট | খ) ফ্যাট |
| গ) প্রোটিন | ঘ) ভিটামিন |

৪। মা তাসনিমকে উক্ত খাবারগুলো খেতে দেওয়ার কারণ –

- i. দেহের বৃদ্ধি সাধন করা।
- ii. দেহের ক্ষয়পূরণ করা।
- iii. কর্মশক্তি উৎপাদন করা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১। শম্মা ও লিটু ভাইবোন। তারা দুজনই স্কুলে পড়ে। স্কুল ছুটির পর লিটু প্রায় প্রতিদিনই বাগার, স্যান্ডউচ, ড্রিংকস ইত্যাদি খায়। মা লক্ষ করলেন লিটু দিন দিন মোটা হয়ে যাচ্ছে। অপর দিকে শম্মা বয়সের তুলনায় কম লম্বা হচ্ছে। এ নিয়ে চিন্তিত মা একজন পুষ্টিবিদের সাথে আলাপ করলে পুষ্টিবিদ শম্মার জন্য প্রয়োজনীয় খাবার গ্রহণের পরামর্শ দিলেন এবং লিটুকে সঠিক খাদ্যাভ্যাস গঠনে মাকে মনোযোগী হতে বললেন।

- ক. কৈশোরকালের বয়স সীমা কত?
- খ. খাদ্য পরিপাক হওয়া প্রয়োজন কেন?
- গ. শম্মার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য কীরূপ হবে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. লিটুর সঠিক খাদ্যাভ্যাস গঠনের জন্য মায়ের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

ঢাদশ অধ্যায়

নিয়মতাত্ত্বিক জীবনযাপন ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা

পাঠ-১ : নিয়মতাত্ত্বিক জীবনযাপন

প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে সুস্থাস্থ্যই হচ্ছে সকল সফলতা ও সুখের চাবিকাঠি। আর সুস্থাস্থ্য রক্ষার মূল চাবিকাঠি হচ্ছে নিয়মতাত্ত্বিক জীবনযাপন।

নিয়মতাত্ত্বিক জীবনযাপনের গুরুত্ব -

বিজ্ঞানের প্রসারের সাথে সাথে নগরায়ণের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে সেই সাথে ঘটেছে আমাদের জীবন্যাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন। আমরা যত্ন নির্ভর প্রতিযোগিতামূলক জীবনে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে স্বাভাবিক সুস্থ জীবন গঠনের পথকে নিজেরাই ঝটিল করছি। ফলে নানা ধরনের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির সমূহীন হচ্ছি। জীবন্যাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে আমাদের নিয়মতাত্ত্বিক জীবনের পরিবর্তে এসেছে অনিয়ম ও ঝুঁকিপূর্ণ জীবন প্রণালি।

যখন তখন ফাস্টফুড গ্রহণ, পানির পরিবর্তে সফট ড্রিংকস্ পান করা, ধূমপান করা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চলা, অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকা, দেরিতে শুম থেকে ওঠা, একেক দিন একেক নিয়মে জীবন পরিচালনা করা ও নির্ধারিত কোনো ব্লুটিন মেনে না চলা, খুব বেশি টিভি দেখা বা কম্পিউটার গেমে নিজেকে অভ্যস্ত করা, সব সময় মানসিক চাপের মধ্যে থাকা, শারীরিক ব্যায়াম না করা বা পরিশ্রমের কাজ না করা, সামাজিক ও ধর্মীয় বিধিনিষেধ মেনে না চলা ইত্যাদি বিষয় নিয়মতাত্ত্বিক জীবনযাপনের অন্তরায়। যার প্রভাবে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যগত সমস্যা ও জঙ্গাধিক্য এবং এর প্রভাবে স্কট বিভিন্ন সমস্যা, বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের অসংকোচিত রোগ যেমন - ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগ আমাদের দেশে ক্রমে বেড়েই চলেছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, যারা ছোটবেলা থেকেই নিয়মতাত্ত্বিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত না হয়ে বিভিন্ন ধরনের অনিয়মে অভ্যস্ত হয় তাদের ক্ষেত্রে অল্প বয়সেই ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ ও হৃদরোগ ইত্যাদি রোগগুলো প্রকাশ পায়, কর্মক্ষমতা কমে যায়, বার্ধক্য দ্রুত হয়, এ ছাড়া এ সকল রোগের দীর্ঘমেয়াদি জটিলতায় আক্রান্ত হওয়াসহ জীবনের দীর্ঘতা বা আয়ু কমে যায়। তাই এক কথায় বলা যায় যে, সুস্থাস্থ্য রক্ষায় নিয়মতাত্ত্বিক জীবনযাপনের কোনো বিকল্প নাই।

নিয়মতাত্ত্বিক জীবনযাপনের উপায়-

- ১) স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গঠন করা - নিয়মতাত্ত্বিক জীবনযাপন প্রতিষ্ঠায় স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গঠন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুষম খাদ্য গ্রহণ, খাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময় মেনে চলা, পরিমিত পরিমাণে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা, ক্ষতিকর খাদ্যাভ্যাস পরিহার করা, সঠিক ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কিত বিধিনিষেধ মেনে চলা, শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য খাদ্য গ্রহণে সচেতন থাকা, খাদ্য সম্পর্কিত কুসংস্কারগুলো পরিহার করা ইত্যাদির মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গঠন সম্ভব। আর এর দ্বারা নিয়মতাত্ত্বিক জীবনযাপন প্রতিষ্ঠিত করা যায়। শিশুকাল থেকেই স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গঠন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- ২) নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করা বা ব্যায়াম করা - নিয়মতাত্ত্বিক স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য এবং দীর্ঘজীবন লাভের জন্য নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করা বা ব্যায়াম করা অত্যন্ত জরুরি। ছেটবেলা থেকেই যদি প্রত্যেকে নিজের প্রাত্যহিক কাজগুলো যেমন- নিয়মিত নিজের কাপড় কাচা, নিজের ঘর পরিষ্কার করা, আসবাব পরিষ্কার করা ইত্যাদি কাজগুলো নিজে করার অভ্যাস করা হয় এবং নিয়মিত খেলাধুলা করা হয় তাহলে নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম হয় ফলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে। আর যারা নিজেদের কাজ করতে পারেন না বা খেলাধুলা করার সুযোগ নেই তাদের অবশ্যই নিয়মিত ব্যায়াম করা উচিত। নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করা বা ব্যায়াম শরীরের ওজন স্বাতোবিক রেখে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।
- ৩) ঘুমের সময় ও জেগে উঠার সময় মেনে চলা - প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে যাওয়া ও নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম থেকে উঠা সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য জরুরি। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, যারা অনেক রাত করে ঘুমাতে যায় ও ঘুমের অনিয়ম করেন তাদের শরীরের ওজন দ্রুত বৃদ্ধি হওয়ার প্রবণতা দেখা যায় এবং নানা ধরনের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জটিলতা দেখা দেয়। সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য প্রতিদিন ৬-৮ ঘণ্টা নির্দিষ্ট নিয়মে ঘুমাতে হবে। অনেক রাত করে ঘুমানো পরিহার করতে হবে। প্রতিদিন রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যেতে হবে এবং সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠার নিয়মিত অভ্যাস প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।
- ৪) মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করা - অনিয়ন্ত্রিত ও জটিল জীবনযাপন প্রণালির কারণে বর্তমানে মানসিক চাপ বেড়ে গেছে, যা সুস্বাস্থের অন্তরায় এবং উচ্চরক্তচাপসহ বিভিন্ন জটিল মানসিক রোগের কারণ হিসেবে চিহ্নিত। মানসিক চাপ কমানোর জন্য নিয়ন্ত্রিত সহজ সরল জীবন প্রণালি প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। জীবন চলার পথে সৃষ্টি বিভিন্ন সমস্যায় অস্থির না হয়ে কিছুক্ষণতার সাথে তা মোকাবিলার উপায় বিবেচনা করতে হবে। সঠিক সময়ে সঠিক উপায়ে কাজ সম্পাদন করা, অতিরিক্ত অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণ করা এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে শান্ত রাখতে পারলে মানসিক চাপ সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং এ থেকে সৃষ্টি বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।
- ৫) যথাযথ সময় পরিকল্পনা করা এবং নিজেকে অভ্যস্ত করা - নিয়মতাত্ত্বিক জীবনযাপনের জন্য যথাযথ সময় পরিকল্পনা করা এবং নিজেকে তার সাথে অভ্যস্ত করা জরুরি। মনে রাখতে হবে, ছেটবেলা থেকেই সময়ের সংব্যবহার করতে না পারলে পরবর্তী জীবনেও এর নেতৃত্বাচক ফলাফল ভোগ করতে হবে। সুরু সময় পরিকল্পনা ও এর অনুশীলনের মাধ্যমে নিয়মতাত্ত্বিক জীবনযাপন সহজ হয়।
- ৬) ধূমপান বর্জন করা - নিয়মতাত্ত্বিক জীবনযাপনের জন্য সুস্থিতা প্রয়োজন। আমরা সবাই জানি, ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ধূমপায়ী ব্যক্তির শরীরে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের চাহিদা বেড়ে যায় এবং কোনো কোনো পুষ্টি উপাদানের কার্যকারিতা কমে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়। এদের বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি থাকে। এ ছাড়া ধূমপায়ী ব্যক্তি যখন ধূমপান করেন তখন তিনি শুধু নিজেরই ক্ষতি করেন না, তার আশপাশে অবস্থানকারী ব্যক্তিদেরও ক্ষতি করেন। এক কথায় বলা যায় যে ধূমপায়ী ব্যক্তির সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা ও নিয়মতাত্ত্বিক জীবনযাপন কোনোভাবেই সম্ভব না। তাই অবশ্যই ধূমপান বর্জন করতে হবে।
- ৭) ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি নিষেধ মেনে চলা - ছেটবেলা থেকেই পানাহারে, চলাফেরায়, মেলামেশার ক্ষেত্রে যদি ধর্মীয় ও সামাজিক বিধিনিষেধ মেনে চলায় অভ্যস্ত হওয়া যায় যেমন- পরিমিত আহার করা, অতি ভোজন পরিহার করা, মদপান থেকে বিরত থাকা, পারস্পরিক মেলামেশায় নিরাপদ ও সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তোলা ইত্যাদি বিধি-নিষেধগুলো মেনে চলা যায় তাহলে খুব সহজেই নিয়মতাত্ত্বিক সুস্থ জীবনযাপন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

৮) নিজস্ব নিয়মানুবর্তিতা প্রতিষ্ঠিত করা ও মেনে চলা - সহজ করে জীবন পরিচালনার জন্য ছোটবেলা থেকেই নিজস্ব নিয়মানুবর্তিতা প্রতিষ্ঠিত করা ও তা মেনে চলা। নিয়মতান্ত্রিক স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন সুস্থান বজায় রাখার জন্য অত্যাবশ্যকীয়।

নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন প্রতিষ্ঠায় উপরের আটটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ছোটবেলা থেকে নিজের মধ্যে বিষয়গুলো সম্পর্কে অনুধাবন করে চর্চা করতে পারলে খুব সহজেই নিয়মতান্ত্রিক সুস্থ জীবন লাভ করা যায়। মনে রাখতে হবে সুস্থ ও নিরোগ জীবনযাপনের জন্য এবং শরীরকে বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্ত রাখার জন্য নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপনের কোনো বিকল্প নেই।

নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন না করার পরিণতি - নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন না করলে নানা ধরনের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। যেমন-

- ওজন বেড়ে যাওয়া, ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগ, স্ট্রোক ইত্যাদি রোগ দেখা দেয়।
- জীবনের দীর্ঘতা বা আয়ু কমে যায়।
- কর্মক্ষমতা কমে যায়।
- বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়।

বর্তমানে আমাদের দেশে উপরের সমস্যাগুলো সৃষ্টির প্রবণতা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। আমরা এখন ডায়াবেটিস, হৃদরোগ ও উচ্চরক্তচাপ সম্পর্কে জানব।

কাজ - তুমি কীভাবে তোমার জীবনকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত করতে পারবে তা বর্ণনা কর।

পার্থ-২ : ডায়াবেটিস

ডায়াবেটিস একটি বিপাক জনিত রোগ। শরীরে ইনসুলিন নামক হরমোনের অভাবে বিপাকজনিত ত্রুটি ঘটে, ফলে রক্তে গুরুতরে পরিমাণ বেড়ে যায়। ডায়াবেটিস কোনো সংক্রামক রোগ নয়। একবার ডায়াবেটিস হলে তা একেবারে সেরে যায় না, তবে চিকিৎসা সংক্রান্ত নিয়ম মেনে চললে একে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। খাদ্যনিয়ন্ত্রণ ও নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন ছাড়া কোনোভাবেই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না। যে কেউ যে কোনো বয়সে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হতে পারে তবে নিম্নলিখিত কারণে ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায় -

- বৎসরগত কারণ- যাদের মা-বাবা ও খুব নিকটজনের ডায়াবেটিস আছে, তাদের মধ্যে এই রোগ হওয়ার আশঙ্কা বেশি
- অতিরিক্ত শারীরিক ওজন
- শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম না করা
- অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের উপায় - ডায়াবেটিস সম্পূর্ণ নিরাময় করা যায় না। তবে এই রোগ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য চারটি নিয়ম মানতে হয়-

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ● খাদ্য ব্যবস্থা ● ঔষধ | <ul style="list-style-type: none"> ● শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম ● রোগ সম্পর্কে শিক্ষা |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

উল্লিখিত প্রতিটি ক্ষেত্রেই শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে। তাহলে সহজেই ডায়াবেটিস সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে।

(ক) ডায়াবেটিসে খাদ্য ব্যবস্থাপনা – ডায়াবেটিস হলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়। এই গ্লুকোজ প্রধানত খাবার থেকে আসে। আর তাই ডায়াবেটিস হলে খাদ্য গ্রহণে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হয়। ডায়াবেটিস হওয়ার আগে ও পরে পুষ্টি চাহিদার কোনো তারতম্য ঘটে না। কিন্তু খাদ্য গ্রহণে নিয়ম মেনে চলার উদ্দেশ্য হলো ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা ও স্বাস্থ্য ভালো রাখা।

খাদ্য গ্রহণের নিয়ম –

- বেশি খাওয়া যাবে বা ইচ্ছামতো খাওয়া যাবে – যে খাবারগুলোতে প্রচুর আঁশ আছে সেই খাবারগুলো বেশি খেলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ে না, তাই সেইগুলো বেশি করে খাওয়া যাবে। সব রকমের শাকসবজি যেমন– চিঠিগো, ধল্দুল, পেঁপে, পটেল, শিম, লাউ, শসা, খিরা, করল্লা, উচ্ছে, কাঁকরোল, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ইত্যাদি। ফলের মধ্যে জাম, জামরুল, আমলকী, লেবু, জাম্বুরা ইত্যাদি।
- হিসাব করে খেতে হবে – কিছু খাবার আছে খাওয়ার পর খুব দুর রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ না বাঢ়লেও সেই খাবারগুলো পরিমাণে বেশি খেলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়, তাই সেই খাবারগুলো হিসাব করে খেতে হবে। যেমন– ভাত, ঝুটি, চিড়া, মুড়ি, শৈথি, বিস্কুট, আলু, মিষ্টি আলু, মিষ্টি কুমড়া, দুধ, ছানা, পনির, মাংস, মাছ, ডিম, ডাল, বাদাম, মিষ্টি ফল যেমন– কলা, পাকা আম, পাকা পেঁপে ইত্যাদি। ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও সাদা চাল ও সাদা আটার চেয়ে লাল চালের ভাত ও ভুসিসহ আটার ঝুটি বেশি উপকারী। এগুলো রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ দ্রুত বাঢ়ায় না।
- পরিহার করতে হবে – কিছু কিছু খাবার আছে যা খাওয়ার পর খুব দুর রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়, সেই খাবারগুলো পরিহার করতে হবে। যেমন– চিনি, গুড়, মিসরি, রস, সরবত, সফট ড্রিংকস, জুস, সব রকমের মিষ্টি, পায়েস, ক্ষীর, পেস্ট্ৰি, কেক ইত্যাদি।
- শরীরের ওজন বেশি থাকলে তা কমিয়ে স্বাভাবিক ওজনে আনতে হবে। আবার শরীরের ওজন কম থাকলে তা বাড়িয়ে স্বাভাবিক ওজনে আনতে হবে। সব সময় শরীরের ওজন স্বাভাবিক মাত্রায় রাখতে হবে।
- নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট পরিমাণে খাবার খেতে হবে। নিজের ইচ্ছামতো কোনো বেলার খাবার বাদ দেওয়া যাবে না। এক বেলায় বেশি খাওয়া বা অন্য বেলায় কম খাবার খাওয়া অথবা এক দিন কম এক দিন বেশি খাবার খাওয়া যাবে না।

এক কথায় বলা যায় যে, নিয়মতাত্ত্বিকভাবে খাদ্য গ্রহণে সহজেই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

- (খ) শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম – ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রমের ফলে ইনসুলিনের কার্যকারিতা ও নিঃসরণের পরিমাণ বেড়ে যায় ফলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়।
- (গ) ওষুধ – সকল ডায়াবেটিস রোগীকেই খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম ও শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। তবে কোনো কোনো ডায়াবেটিস রোগীকে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম ও শৃঙ্খলা মেনে চলার পাশাপাশি খাবার বড়ি অথবা ইনসুলিন ইনজেকশন নিতে হয়। যে রোগীকে চিকিৎসার জন্য যে ওষুধ অর্থাৎ খাবার বড়ি অথবা ইনসুলিন ইনজেকশন যা-ই দেওয়া হোক না কেন

তাকে তার জন্য নির্ধারিত ডোজ ও এর সাথে খাদ্য গ্রহণ, ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রমের সঠিক নিয়ম খুবই সচেতনতাবে মেনে চলতে হবে। তা না হলে উষ্ণ রোগ নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে জীবনের ঝুঁকির কারণও হতে পারে।

(ঘ) **রোগ সম্পর্কে শিক্ষা** – ডায়াবেটিস সারা জীবনের রোগ তাই এই রোগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে রোগীকে ও রোগীর নিকট আতীয়দেরও অবশাই রোগ সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে। কারণ ডায়াবেটিস চিকিৎসার জন্য শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

শৃঙ্খলা মেনে চলা – ডায়াবেটিস রোগীদের নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন অর্থাৎ জীবনযাপনে শৃঙ্খলা মেনে চলাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জীবনযাপনে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে-

<ul style="list-style-type: none"> নিয়মিত ও পরিমাণমতো সুষম খাদ্য গ্রহণ এবং এ সঞ্চালন বিধি-নিষেধ মেনে চলা নিয়মিত ও প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম করা চিকিৎসকের পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী খাবার বড়ি অথবা ইনসুলিন ইনজেকশন গ্রহণ করা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা পায়ের নিয়মিত বিশেষ যত্ন নেওয়া 	<ul style="list-style-type: none"> ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসা বন্ধ না করা নিয়মিত রন্তর গুকোজ পরীক্ষা করা ও রিপোর্ট সংরক্ষণ করা ধূমপান ও মদপান পরিহার করা প্রতিদিন জীবনযাত্রায় যথাসম্ভব নির্দিষ্ট রুটিন মেনে চলা ডায়াবেটিস চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করা শারীরিক যে কোনো জরুরি অবস্থায় চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

কাজ – ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপনের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

পাঠ-৩ : হৃদরোগ

আমাদের দেশে দিন দিনই হৃদরোগীর সংখ্যা বাঢ়ছে। হৃদরোগের প্রধান কারণগুলোর মধ্যে – অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন, অতিরিক্ত সম্মুক্ত চর্বি জাতীয় খাদ্য গ্রহণ, প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাদ্যশক্তি গ্রহণ, ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম না করা, বংশগত কারণ, বিপাকীয় ত্বুটি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। হৃদরোগে আক্রান্ত হলে অবশ্যই নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে-

<ul style="list-style-type: none"> নিয়মিত সুষম খাদ্য গ্রহণ এবং এ সঞ্চালন বিধি-নিষেধগুলো মেনে চলতে হবে নিয়মিত ও প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম করা নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী চিকিৎসা গ্রহণ করা নিয়মিত রক্তচাপ পরিমাপ করা 	<ul style="list-style-type: none"> নির্দিষ্ট সময় ঘুমাতে যাওয়া ও ঘুম থেকে ওঠা। ৬-৮ ঘণ্টা ঘুমানো মানসিক চাপ, উত্তেজনা ও রাগ নিয়ন্ত্রণ করা ধূমপান ও মদপান পরিহার করা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন করা প্রতিদিন জীবনযাত্রায় যথাসম্ভব নির্দিষ্ট রুটিন মেনে চলা শারীরিক যে কোনো জরুরি অবস্থায় চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

হৃদরোগে খাদ্য ব্যবস্থাপনা -

হৃদরোগীর খাদ্য এমন হতে হবে যাতে করে রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য শক্তির চেয়ে বেশি খাদ্য শক্তি গ্রহীত না হয় ও খাদ্য সুষম হয়। খাদ্যের মাধ্যমে চিনি, লবণ ও ফ্যাটের গ্রহণ যেন কম থাকে এবং প্রচুর পরিমাণে আঁশ-জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়াও নিচের বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে।

- লাল চালের ভাত ও ভুমিসহ আটার বুটি খাওয়ায় অভ্যস্ত হতে হবে এবং চাল ও আটার তৈরি খাবার প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে বেশি খাওয়া যাবে না।
- বেশি আঁশযুক্ত খাদ্য যেমন- শাকসবজি ও ফল বিশেষ করে টক জাতীয় ফল যেমন- লেবু, জাম্বুরা, কমলা, আনারস ইত্যাদি খাদ্য তালিকায় রাখতে হবে।
- বিভিন্ন রঞ্জিন সবজি যেমন- সবুজ (শাক পাতা), কমলা (মিষ্টি কুমড়া / গাজর), বেগুনি (বিট), লাল (টমেটো), হালকা হলুদ-সাদা (মুলা, শসা) প্রতিদিন গ্রহণ করতে হবে। মৌসুমি তাজা শাকসবজি প্রতিদিন খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে।
- ডাল, বাদাম পরিমিত পরিমাণে খেতে হবে।
- মাছ, চর্বি ছাড়া মাংস, চামড়া ছাড়া মুরগির মাংস, ডিম প্রয়োজনীয় পরিমাণে খেতে হবে।
- ননী তোলা দুধ ও এই দুধের তৈরি টক দই খাওয়া ভালো।
- রান্নায় লবণ কম দিতে হবে এবং খাওয়ার সময় বাড়তি লবণ খাওয়া যাবে না।

যে খাবারগুলো বাদ দেওয়া উচিত-

- মাখন, ঘি, ডালডা, ক্রিম সস, নারকেল, বেশি তেলাক্ত ও চর্বিযুক্ত খাদ্য।
- আইসক্রিম, মিষ্টি-জাতীয় খাদ্য ইত্যাদি।
- বেশি চর্বিযুক্ত মাংস, কলিজা, ইঁস-মুরগির চামড়া ও এদের তৈরি খাদ্য।
- বেশি লবণযুক্ত বা লবণে সংরক্ষিত যে কোনো খাবার, যেমন- পনির, আচার-চাটনি, সস, সয়া-সস, চিপস্, চানাচুর, লবণযুক্ত বাদাম, নোনা ইলিশ, চিনজাত মাছ ইত্যাদি।
- ফাস্টফুড যেমন- চিকেন ফ্রাই, পিঞ্জা, মাংসের তৈরি নাগেট ইত্যাদি।
- বেকারির খাবার যেমন- বিস্কুট, পেস্ট্রি, কেক ইত্যাদি।
- সফট ড্রিংকস ও এনার্জি ড্রিংকস, ডার্ক কফি ইত্যাদি।
- সালাদে লবণ ও সালাদ ড্রেসিং বাদ দিতে হবে।
- চাইনিজ লবণ বা টেস্টিৎ সল্ট বাদ দিতে হবে।

কাজ - হৃদরোগীর জন্য নিয়মতাত্ত্বিক জীবন যাপন করার সময় খাদ্য সংক্রান্ত কোন কোন বিষয়গুলোর দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে?— একটি চার্টের মাধ্যমে দেখাও।

পাঠ-৪ : উচ্চরক্তচাপ

অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, বংশগত কারণ, ওজনাধিক্য, বিপাকীয় ত্বুটি ইত্যাদি কারণে উচ্চরক্তচাপ হতে পারে। উষ্ণথের পাশাপাশি যথাযথ নিয়ন্ত্রিত খাদ্য গ্রহণ ও নিয়মিত পরিশ্রম বা ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীরের ওজন

স্বাভাবিক রাখা এবং নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন করাই উচ্চরক্তচাপ চিকিৎসার অর্থাৎ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সবচেয়ে উত্তম উপায়।

উচ্চরক্তচাপে আক্রান্ত হলে অবশ্যই নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপন করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—

<ul style="list-style-type: none"> নিয়মিত সুষম খাদ্য গ্রহণ এবং এ সংক্রান্ত বিধি নিষেধগুলো মেনে চলা নিয়মিত ও প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম করা নিয়মিত রক্তচাপ পরিমাপ করা নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ওষুধ গ্রহণ করা মানসিক চাপ, উত্তেজনা ও রাগ নিয়ন্ত্রণ করা 	<ul style="list-style-type: none"> নির্দিষ্ট সময় ঘুমাতে যাওয়া ও ঘুম থেকে উঠা। ৬-৮ ঘণ্টা ঘুমানো ধূমপান ও মদপান পরিহার করা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপন করা প্রতিদিন জীবনযাত্রায় যথাসম্ভব নির্দিষ্ট রুটিন মেনে চলা শরীরিক যে কোনো জরুরি অবস্থায় বা রক্তচাপ অনিয়ন্ত্রিত হলে বা রক্তচাপ উঠানামা করলে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা।
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

উচ্চরক্তচাপে খাদ্য ব্যবস্থাপনা

- বেশি আঁশযুক্ত খাদ্য যেমন— শাকসবজি ও ফল বিশেষ করে টকজাতীয় ফল যেমন— লেবু, জাম্বুরা, কমলা, আনারস ইত্যাদি খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে।
- কচি ডাবের পানি উপকারী।
- ভাত ও বুটি এবং চাল ও আটার তৈরি খাবার প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে বেশি খাওয়া যাবে না। সাদা চাল ও সাদা আটার চেয়ে লাল চালের ভাত ও গমের ভূসিসহ আটার বুটি বেশি উপকারী।
- মাছ, চর্বি ছাড়া মাংস, ডিম প্রয়োজনীয় পরিমাণে খাওয়া যাবে।
- ডাল, বাদাম খাওয়া যাবে।
- ননী তোলা দুধ ও এই দুধের তৈরি টকদই খাওয়া।
- রান্নায় লবণ কম দিতে হবে এবং খাওয়ার সময় বাঢ়তি লবণ খাওয়া যাবে না।
- প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাদ্য শক্তি গ্রহণ করা যাবে না।

যে খাবার বাদ দেওয়া উচিত—

- বেশি লবণযুক্ত খাবার বাদ দিতে হবে। যেমন— পনির, আচার-চাটনি, সস, চিপস্, চানাচুর ইত্যাদি।
- লবণে সংরক্ষিত যে কোনো খাবার, যেমন— নোনা ইলিশ, টিনজাত মাছ ইত্যাদি।
- মাখন, ধি, ডালডা, নারকেল ও বেশি তৈলাক্ত ও চর্বিযুক্ত খাদ্য।
- চর্বিযুক্ত মাংস ও এর তৈরি খাদ্য।
- ফাস্টফুড যেমন— চিকেন ফ্রাই, পিঞ্জা, মাংসের তৈরি নাগেট ইত্যাদি।

- বেকারির খাবার যেমন- বিস্কুট, পেস্টি, ক্রিম কেক ইত্যাদি।
- সফট ড্রিংকস ও এনার্জি ড্রিংকস, ডার্ক কফি ইত্যাদি।
- সালাদে লবণ ও সালাদ ড্রেসিং বাদ দিতে হবে এবং সয়াসস, চাইনিজ লবণ বা টেস্টিং সল্ট বাদ দিতে হবে।

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে স্বাভাবিক সুস্থ জীবন যাপন করা সম্ভব হয়, আর নিয়ন্ত্রণে না রাখলে কিডনি নষ্ট হওয়া, স্ট্রোক হওয়া ও হৃদরোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় এবং অন্যান্য শারীরিক জটিলতা দেখা দিতে পারে।

কাজ - উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপনে কোন কোন বিষয়গুলোর দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে?

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে প্রতিদিন কতো ঘণ্টা ঘুমাতে হয়?

- | | |
|--------------|---------------|
| ক) ৩-৪ ঘণ্টা | খ) ৪-৫ ঘণ্টা |
| গ) ৬-৮ ঘণ্টা | ঘ) ৯-১০ ঘণ্টা |

২। মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি কেন?

- | | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ক) এতে আশপাশে যারা থাকেন, কেউ কিছু মনে করে না। | খ) জীবনে চলার পথে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না। |
| গ) নানা রকম সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে হয় না। | ঘ) উচ্চরক্তচাপসহ বিভিন্ন মানসিক রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। |

নিচের উচ্চীপক্ষটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মিসেস ঝর্ণার বয়স ৫০ বছর। চর্বিযুক্ত মাছ, মাংস, কুসুমসহ ডিম খাওয়া তার নিয়মিত অভ্যাস। কয়েক দিন ধরে সে নানা রকম অসুবিধা বোধ করছে। তাই মিসেস ঝর্ণার মেয়ে তাঁকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়।

৩। মিসেস ঝর্ণার কী ধরনের খাদ্য গ্রহণ যুক্তিযুক্ত?

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| ক) সাদা আটার বুটি ও সাদা চালের ভাত | খ) পনির ও মাংসের কাবাব |
| গ) ননীতোলা দুধ ও টকদই | ঘ) কেক ও মিষ্টি দই |

৪। মিসেস ঝর্ণার এ ধরনের সমস্যা সৃষ্টির কারণ—

- i. স্নেহের আধিক্য
 - ii. প্রোটিনের আধিক্য
 - iii. কার্বোহাইড্রেটের আধিক্য

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক) i ও ii
গ) ii ও iii

সুজনশীল প্রশ্ন

১। মিসেস শীলার বয়স ৪৫ বছর। তার সৎসারের রান্নার কাজ, কাপড় ধোয়ার কাজ, ঘরের কাজের জন্য দুজন গৃহকর্মী রয়েছে। তিনি প্রতিদিন দেরিতে সুম থেকে উঠেন। সকালে পরটা, মাঝে, মিষ্টি, ডিম দিয়ে নাশতা করেন। তারপর খবরের কাগজ ও টি.ভি নিয়ে বসেন। দুপুরে গোসল করে খেয়ে দেয়ে ২ ষষ্ঠা স্থামান। দুই বেলাতেই মাছ, মাংস ছাড়া ভাত খান না। অনেক রাত পর্যন্ত তিনি টি.ভি দেখে রাতের খাবার খেয়েই শুয়ে পড়েন। কিছুদিন পর তার দেহের ওজন অনেক বেড়ে যায় এবং তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

- ক. সুস্বাস্থ্য রক্ষার মূল চাবিকাঠি কী ?
 - খ. নিয়মতাত্ত্বিক জীবনযাপন গুরুত্বপূর্ণ কেন ?
 - গ. মিসেস শীলার সঠিক খাদ্যাভ্যাস কীরূপ হবে ? ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. মিসেস শীলার জীবন প্রগালি সংশোধন না করলে তার শারীরিক জটিলতা থেকে উদ্ভোরণ সম্ভব নয়—
কথাটির সঙ্গে তুমি কি একমত ? বিশ্লেষণ কর।

২। মাসুমা বেগম মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলা। তার দেহের ওজনও বেশি। অসুস্থ বাবা-মার দেখাশোনা, দুইবেলা তাদের ইনসুলিন দেওয়া ও খাবারের ব্যবস্থা তাকেই করতে হয়। সৎসারের যাবতীয় কাজ করতে গিয়ে তিনি চলাফেরার কোনো নিয়মশৃঙ্খলা মানেন না। তিনি মিষ্টি, পায়েস, সফট ড্রিংকস, জুস খেতে পছন্দ করেন। মাসুমার শরীর খারাপ হলে চিকিৎসক তাকে ভবিষ্যতের জন্য স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হতে বলেন।

- ক. বিপাকজনিত একটি রোগের নাম লেখ ?
খ. আঁশযুক্ত খাবার গুরুত্বপূর্ণ কেন ? বুঝিয়ে লেখ।
গ. মিসেস মাসুমাকে তাঁর বাবার জন্য কোন ধরনের খাদ্য ব্যবস্থা করতে হয় ? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. মিসেস মাসুমার সুস্থ থাকার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত নিয়মতাত্ত্বিক জীবন প্রণালি—বিশ্঳েষণ কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন

পরিবারের সবার দৈনিক খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য খাদ্য পরিকল্পনা করা হয়। এই খাদ্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সঠিক উপায়ে খাদ্য প্রস্তুত করতে হয়। প্রস্তুতকৃত খাদ্য দ্রব্যাদি সুনির্দিষ্ট কৌশল অবলম্বন করে গ্রহণের জন্য ব্যবস্থা করা হয়— যাকে বলা হয় খাদ্য পরিবেশন। খাদ্যদ্রব্য সম্পূর্ণভাবে তৃপ্তিদায়ক করার জন্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠ-১ : মেনু তৈরি

খাদ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য শুধু ক্ষুধা নিবারণ নয়। খাদ্য গ্রহণের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো যেসব খাদ্য খাওয়া হয় তা যেন শরীরকে কর্মক্ষম রাখে, ক্ষয়পূরণ করে ও বৃদ্ধিসাধন অব্যাহত রাখে এবং শরীরকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন করে তোলে। এ জন্য প্রয়োজন খাদ্যের সব উপাদানসমূহ সুষম খাদ্যের। সুষম ও পুষ্টিকর আহারই দেহের প্রতিটি অবস্থায় প্রয়োজন অনুযায়ী শক্তি সরবরাহ করে দেহকে সুস্থ রাখতে পারে। এ জন্য বয়স (শিশু, কিশোর, বৃদ্ধ) পরিশ্রমের ধরণ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য খাদ্য ব্যবস্থার পরিকল্পনা করতে হয়। এই পরিকল্পনার উপায় হলো ‘মেনু তৈরি।’

প্রতিদিনের আহারে কী কী খাদ্য পরিবেশন করা হবে তার জন্য মেনু পরিকল্পনা করা উচিত। মেনু পরিকল্পনায় পরিবারের বাজেট বা আয় অনুযায়ী প্রত্যেক সদস্যের বুচি, চাহিদা, বয়স, খাদ্য প্রস্তুত পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে।

পরিবারের তিন বেলার আহার ছাড়া শিশুর পরিপূরক খাবার, রোগীর পথ্য, বিয়ে, জন্ম দিন, অতিথি আপ্যায়ন ইত্যাদি যে কোনো উপলক্ষ্যেই খাদ্য প্রস্তুতের আগেই একটা পরিকল্পনা করে নেওয়া ভালো। মেনু তৈরির মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থার সাথে সমর্কযুক্ত বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে খাদ্যের তালিকা তৈরি করা হয়। মোটকথা মেনু পরিকল্পনা খাদ্যের একটি তালিকা বিশেষ। অর্থাৎ যে কোনো খাদ্য ব্যবস্থায় কী খাবার পরিবেশন করা হবে তা স্থির করে যে লিখিত খাদ্য তালিকা তৈরি করা হয় তাকেই মেনু বলে। মেনু পরিকল্পনার মাধ্যমে সুষম, আর্কর্গীয় এবং পুষ্টিকর খাদ্য পরিবেশন করা যায়।

মেনু তৈরির বিবেচ্য বিষয়

মেনু তৈরির মাধ্যমে যাতে পরিবারের খাদ্য ব্যবস্থা সুষম হয় সে জন্য কতোগুলো বিষয় বিবেচনা করতে হয়।
সেগুলো নিম্নরূপ—

- ❖ **বয়স :** একটা পরিবারে বিভিন্ন বয়সের লোক থাকে। বিভিন্ন বয়সের লোকদের খাদ্যের চাহিদার ভিন্নতার বিষয়টি মনে রাখা প্রয়োজন। যেমন : শিশুর সঠিক বৃদ্ধির জন্য দুধ-জাতীয় খাবারের প্রাধান্য দিতে হয়। বৃদ্ধ ও প্রাপ্ত বয়সকদের জন্য ভিটামিনযুক্ত খাদ্য দরকার। পরিবারের গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের জন্য স্বাভাবিক মায়ের তুলনায় বেশি ক্যালরি ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।
- ❖ **শ্রম :** পরিশ্রমের ধরন ক্যালরির চাহিদাকে প্রতিবিত করে। তাই মেনু তৈরির সময় পরিবারের সদস্যদের পরিশ্রমের মাত্রা যাচাই করে পর্যাপ্ত ক্যালরি বহুল খাদ্যের সমন্বয় ঘটাতে হবে। যেমন: বিশেষ করে যারা কঠিন পরিশ্রমের কাজ করে তাদের খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট ও স্লেহ বেশি থাকা ভালো। অপর দিকে হাঙ্কা পরিশ্রমী বা যারা মানসিক শ্রম করে এবং বৃদ্ধ ব্যক্তি যাদের শারীরিক পরিশ্রম কম তাদের জন্য কম কার্বোহাইড্রেট ও স্লেহ প্রয়োজন।

- ❖ আয়—মেনুতে পুষ্টির খাদ্য সংযোজনের বিষয়টি একটা বাজেটের উপর নির্ভর করে। আয়ের উপর ভিত্তি করে পরিবারের জন্য সম্পূর্ণ মাসব্যাপী পুষ্টির খাদ্য যোগান দিতে হয়। সুষম খাদ্যের উপাদান অঙ্গ মূল্যের খাদ্য থেকে সংগ্রহ করে স্বল্প ব্যয়ে মেনু পরিকল্পনা করা যুক্তিযুক্ত। খাদ্যের মূল্য কমানোর জন্য সুষম খাদ্যের উপাদানসমূহ বাদ দেওয়া চলবে না। তাই দামি খাবারের পাশাপাশি তুলনামূলক সমস্তা অথচ পুষ্টির খাদ্যের সমন্বয় থাকা বাস্ফুলীয়।
- ❖ আবহাওয়া ও মৌসুম— আমাদের দেশে খাতু ভেদে বিভিন্ন ফলমূল, তরিতরকারির সমাগম ঘটে। এগুলো পুষ্টির, সুস্বাদু এবং সহজলভ্য হয়ে থাকে। খাদ্য তালিকায় মৌসুমি খাদ্যদ্রব্য সংযোজন করলে স্বাদেও বৈচিত্র্য আসে এবং মূল্য সাধারণকারী খাদ্য তালিকাও বানানো যায়।
- ❖ তিঙ্গা— ছেলে-মেয়েভেদে খাদ্যের চাহিদা ভিন্ন হয়। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের দেহের আয়তন, ওজন ও পেশির পরিমাণ কম। এ জন্য মেয়েদের ক্যালরি ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের চাহিদাও অপেক্ষাকৃত কম হয়।
- ❖ উপলক্ষ— পরিবারের সদস্যসংখ্যা, আর্থিক সংজ্ঞাতি, ঝুঁটি ইত্যাদি বিবেচনা করে দৈনিক খাদ্য তালিকা তৈরি করা যায়। তবে ছেট বা বড় যে কোনো অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে মেনু একটি আকর্ষণের বিষয়। কেননা এতে সাধারণ খাবারের কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটে থাকে। যেমন- বিয়ে, জন্মদিন, মিলাদ, ইদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে মেনু তৈরিতে বিতর্ক থাকে।
- ❖ বৈচিত্র্য সূক্ষ্মি— মেনুতে নানা রং, নানা আকার, নানা প্রকৃতি এবং নানা পদ্ধতিতে রান্না করা খাবার দিয়ে আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যময় করা যায়। মেনুতে সব খাবারই যদি সাদা বা একই রংয়ের হয় তাহলে দেখতে আকর্ষণীয় হয় না। তেমনি সব খাবারই যদি নরম ও শুকনা হয় তাহলে খেয়ে পরিত্বস্ত হওয়া যায় না।
- বিভিন্ন রংের খাবার— যেমন- টমেটো, গাজর, কলা, মটরশুটি, দুধ, দই, ভাত, জর্দা ইত্যাদি।
- বিভিন্ন আকারের খাবার— যেমন- সিঙ্গারা, স্যান্ডউইচ, পাটুরুটি, কেক, নিয়মিক ইত্যাদি।
- বিভিন্ন প্রকৃতির খাবার— যেমন- সুগ, ক্ষীর, হালুয়া, কাস্টার্ড, পুডিং, পাপড়, চিপস ইত্যাদি।
- ❖ এক পরিবেশন পরিমাপ— মেনুতে তালিকাভুক্ত খাবারগুলো কতোজন লোক গ্রহণ করবে তার উপর খাবারের মোট পরিমাণ নির্ভর করে। মেনুতে যেসব খাদ্য রাখা হয় তার প্রত্যেক ব্যক্তিকে অন্তত এক পরিবেশন পরিমাণ বরাদ্দ করতে হয়। যেমন- রান্না করা শাক এক পরিবেশন = ১/৩ কাপ।

দুধ ও দুগ্ধজ্ঞাত খাদ্য এক পরিবেশন পরিমাণ—

টাটকা দুধ	১ কাপ
দই	১/২ কাপ
আইসক্রিম	১/২ কাপ
রসগোল্লা	১ টা

গ্রোচিন জাতীয় খাদ্য এক পরিবেশন পরিমাণ—

কাঁটা ছাড়া মাছ	৩০ গ্রাম
হাড় ছাড়া মাংস	৩০ গ্রাম

ডিম	১ টা
ডাল	২৫ গ্রাম

শাক-সবজি, ফল এক পরিবেশন পরিমাণ—

রান্না করা শাক	১/৩ কাপ
রান্না করা সবজি	১/২ কাপ
সালাদ	১/২ কাপ
ফল মাঝারি আকার	১টি

শস্য জাতীয় খাদ্য এক পরিবেশন পরিমাণ—

ভাত	১ কাপ
আটার বুটি	২টি
পাটুরুটি	২ টুকরা
আলু	১৮০ গ্রাম

এ ছাড়া মেনু তৈরি করার সময় পরিবেশনের ধরন, সঠিক রেসিপির ব্যবহার, তৈজসপত্র ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদির সুবিধা, দক্ষ রন্ধনকারী, উদ্ভৃত খাদ্যের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয়।

নমুনা : একটি পরিবারের এক দিনের মেনু।

পরিবেশন সংখ্যা ০৫

সময়	স্বল্প মূল্যের খাবার	দামি খাবার
সকালের নাশতা	আটার বুটি, সবজি ভাজি, কলা, চা	পরোটা, ডিম ভাজা, আপেল, কফি
দুপুরের খাবার	সাধারণ চালের ভাত, ডাল, শাক, ছোট মাছ, লেবু, কাঁচা মরিচ	চিকন চালের ভাত, বড় মাছের তরকারি, সালাদ
বিকাল	মুড়ি মাখা, চা	ফলের রস/কফি, কেক
রাতের খাবার	ভাত, ডিমের তরকারি, ডাল, আলু ভর্তা	ভাত, মুরগির বোল, আলুর চপ, সালাদ

পাঠ-২ : রেসিপির প্রয়োজনীয়তা

সুস্থ খাদ্য ব্যবস্থাপনার জন্য মেনু অর্থাৎ খাদ্য তালিকা তৈরি করা হয়। এই খাদ্য তালিকায় খাদ্যগুলো তখনই মুখরোচক, আকর্ষণীয় ও তৃপ্তিদায়ক হয়ে উঠে যখন তা সঠিক পদ্ধতিতে রান্না করা হয়। রান্নার কাজটা আপাতভাবে সহজ মনে হলেও প্রয়োজন দেখা যায় কোনো না কোনো ত্বুটি থেকে যায়। একই খাবার একবার মানসম্মত ও সুস্বাদু হলেও পরবর্তী সময় আবার সে রকম মজাদার নাও হতে পারে। কিন্তু একই পদ্ধতিতে এবং পরিমাণমতো উপকরণ দিয়ে রান্না করলে প্রতিবারই রান্না করার বস্তুর মান একই রকম রাখা যায়। এ কারণেই তৈরি হয়েছে রেসিপি। রেসিপি এমন একটা নির্দেশক যা কীভাবে এবং কী কী উপকরণ কী পরিমাণ

ব্যবহার করে রান্না করা হবে তার বিস্তারিত বিবরণ থাকে। সূতরাং রেসিপি বলতে বোঝায় রান্নার প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহের তালিকা, পরিমাণ, রন্ধন পদ্ধতির লিখিত পথ নির্দেশ বিশেষ।

রান্নাকরা প্রতিটি খাদ্যেরই নিজস্ব উপকরণ, পরিমাণ ও রন্ধন পদ্ধতি থাকে। যেমন— পুড়ি, আলুর চপ, কাবাব ইত্যাদি।

রেসিপিতে রান্নার সময় সম্পর্কযুক্ত যে তথ্যগুলো দেওয়া হয় সেগুলো হলো—	
• খাবারের নাম	• ব্যবহৃত উপকরণের নাম
• উপকরণের পরিমাণ	• রান্নায় ব্যবহৃত মাহস কিংবা তরকারির কাটার ধরন
• রান্নার ধারাবাহিক ধাপসমূহ	• রান্নায় ব্যবহৃত তাপমাত্রা
• সময়	• পরিবেশন সংখ্যা
• পরিবেশনের ধরণ	

রেসিপি কী কাজে লাগে—

- রেসিপি থেকে খাবার প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো মেপে নেওয়া হয় ফলে কোনো জিনিসের অগচ্য হয় না।
- আদর্শ রেসিপিতে পরিবেশন সংখ্যা উল্লেখ থাকে। ফলে কতোজন লোক খেতে পারবে তা সহজেই অনুমান করা যায় এবং পরিবেশনের কাজটি সহজ হয়।
- রেসিপি অনুসরণ করে যে কোনো নতুন রান্না আয়ত্তে আনা যায়। মেনুর সাথে রেসিপির নির্দেশনা থাকলে দক্ষ পাঁচক অতি সহজেই তা অনুসরণ করে খাদ্য প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়।
- পাচকদের নিকট রেসিপি থাকলে রান্না করা খাবারের মান ও পরিমাণ যাচাই করতে সুবিধা হয়।

রেসিপি ব্যবহার করার সময় লক্ষণীয় বিষয়—

- রেসিপি সঠিকভাবে বুঝে অনুসরণ করতে হবে।
- রেসিপিতে উল্লিখিত পরিমাণমতো উপকরণ ব্যবহার করতে হবে।
- কোনো উপকরণ বাদ দেওয়া ঠিক নয়।
- রেসিপিতে লেখা কলাকৌশল অবলম্বন করতে হবে।
- যে অবস্থায় (গরম, ঠাণ্ডা, তরল, কঠিন) খাবার পরিবেশন করার কথা উল্লেখ থাকবে সেইভাবেই করতে হবে।
- রেসিপিতে নির্দেশিত রন্ধন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
- রেসিপি বুঝতে হলে খাদ্যের মাপ, ওজন, রান্নার সরঞ্জাম, রান্নার কৌশল ও পদ্ধতি, উপকরণ ও মসলা এবং বিনিময় বা বিকল্প খাদ্য সম্পর্কে ধারণা ইত্যাদি বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন।

কাজ : খাদ্য প্রস্তুতকরণে রেসিপির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

পাঠ ৩ – খাদ্য প্রস্তুত

মেনু তৈরি করার পর খাদ্য প্রস্তুত করার প্রস্তুতি নিতে হয়। খাদ্য প্রস্তুতকরণের পূর্বে কতোগুলো বিষয় বিবেচনা করতে হয়—

- কী খাদ্য প্রস্তুত করা হবে তা মেনু অনুযায়ী নির্বাচন করতে হবে।
- যে যে খাদ্য প্রস্তুত করা হবে সেই খাদ্য তৈরির কাঁচামাল সংগ্রহ করতে হবে।
- খাদ্য প্রস্তুত করার আগে সঠিক রেসিপি জেনে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নেওয়া যায়।
- কাঁচা মাছ-মাংস, শাকসবজি বেছে, কেটে পরিষ্কার করে নিতে হবে।
- সঠিক রন্ধন পদ্ধতি অনুসরণ করে খাদ্য প্রস্তুত করতে হবে।
- খাদ্য প্রস্তুতের সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় যেমন : খাবার ঢেকে রান্না করা, বেশি তাপে খাদ্য রান্না না করা ইত্যাদি।
- খাদ্য প্রস্তুত করার সাথে সাথে পরিবেশনের প্রস্তুতি নিতে হয়।
- খাদ্য প্রস্তুতের পর পরই খাদ্য গরম গরম পরিবেশন করতে হয়।

এখন আমরা পুড়িৎ ও সবজি নিরামিষ প্রস্তুত প্রণালি আলোচনা করব।

রেসিপির নমুনা—

নমুনা – ১ পুড়িৎ

উপকরণ	পরিমাণ	প্রস্তুতকৃত খাদ্যের পরিমাণ (পরিবেশন সংখ্যা)
ডিম	৩ টি	৫০০ গ্রাম প্রায় ৪ পরিবেশন
দুধ	৫০০ গ্রাম (ঘন)	
চিনি	৩ টেবিল চামচ	
ভেনিল এসেন্স	৪ ফেট্টা	

প্রস্তুত প্রণালি :

- পুড়িৎ তৈরি করার পাত্রে চিনি ক্যারামেল (উনুনের উপরে বেশি তাপে চিনি গলিয়ে বাদামি রং করা) করে নিতে হবে।
- অপর একটি পাত্রে ডিমগুলো ভালোভাবে ফেটাতে হবে। ফেটানো ডিমের সাথে দুধ চিনি ও ভেনিল এসেন্স মেশাতে হবে।
- পুড়িৎ তৈরির পাত্রটি ঠান্ডা করে তাতে উক্ত মিশ্রণটি (ডিম-দুধ-চিনির) ঢালতে হবে।

- বড় সসপ্যানে ফুটানো পানি দিয়ে দুধ-ডিম মেশানো পাত্রটি মুখ বক্ষ করে এমনভাবে বসাতে হবে যাতে পাত্রটির ১/৩ অংশ পানিতে ডুবে থাকে।
- চুলার আঁচ মাঝামাঝি করে ১ ঘণ্টা ফুটাতে হবে।
- পুড়ি সম্পূর্ণরূপে জমে গেলে ঠাণ্ডা করে নিতে হবে।
- ঠাণ্ডা হলে ছুরি দিয়ে পুড়ি-এর চারদিক ছাঢ়াতে হবে। প্রেটে তৈরি করা পুড়ি-এর পাত্রটি উল্টে পুড়ি ঢেলে নিতে হবে।

পরিবেশন সংখ্যা— প্রস্তুতকৃত পুড়িয়ের পরিমাণ প্রায় ৫০০ গ্রাম। দুগ্ধজাত খাদ্য পুড়িয়ের এক পরিবেশন পরিমাণ = ১/২ কাপ বা ১২৫ গ্রাম। এর ফলে প্রস্তুতকৃত খাদ্যের পরিবেশ সংখ্যা ৪ অর্থাৎ ৪ জন খেতে পারবে।

রেসিপির নমুনা—২

খাদ্যের নাম— সবজি নিরামিষ

উপকরণ	পরিমাণ	প্রস্তুতকৃত খাদ্যের পরিমাণ (পরিবেশন সংখ্যা)
মিষ্টি কুমড়া	২০০ গ্রাম	১ কেজি
বেগুন	১০০ গ্রাম	১০ পরিবেশন
পটোল	২০০ গ্রাম	
পেঁপে	২০০ গ্রাম	
আলু	৩০০ গ্রাম	
আদা বাটা	১ চা চামচ	
রসুন কাটা	১/২ চা চামচ	
হলুদের গুঁড়া	১/২ চা চামচ	
মরিচের গুঁড়া	১/২ চা চামচ	
ধনের গুড়া	১ চা চামচ	
জিরার গুঁড়া	১/২ চা চামচ	
পেঁয়াজ কুচি	১/২ কাপ	
লবণ	২ চা চামচ	
চিনি	পরিমাণমতো	
কাঁচা মরিচ	১/৪ চা চামচ	
তেজপাতা	২টি	
তেল	১০০ গ্রাম	
গাঁচ ফোড়ন	পরিমাণ মতো	

প্রস্তুত প্রণালি :

- সবথরনের সবজিগুলো কাটার আগে ভালো করে ধূতে হবে।
- সবজিগুলো পছন্দমতো টুকরা করে কেটে নিতে হবে।
- গরম তেলে পেঁয়াজ কুচি, বাটা ও গুড়া মসলাগুলো কষিয়ে নিতে হবে।
- বেগুন ও মিষ্টি কুমড়া ছাড়া বাকি সব সবজি লবণ দিয়ে নেড়ে নিতে হয় ৩-৪ মিনিট পর ১ কাপ গরম পানি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- পানি ফুটলে বেগুন, মিষ্টি কুমড়া দিয়ে ভালো করে ঢেকে মৃদু ঝালে রাখতে হবে।
- ১০-১৫ মিনিট পর সবজি সিন্ধু হলে কাঁচা মরিচ, চিনি ও টলা পাচফোড়নের গুড়া ছড়িয়ে দিতে হবে।
- সবজির পানি শুকিয়ে তেল উপরে উঠলে চুলা থেকে নামাতে হবে।

পরিবেশনের সংখ্যা- এই রেসিপিতে রান্না করা সবজির পরিমাণ ১ কেজি। রান্না করা সবজির ১ পরিবেশন = ১/২ কাপ। এটা দশজনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এর ফলে প্রত্যেকে অত্তত ১ পরিবেশন পরিমাণ পাচ্ছে—যা একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির ন্যূনতম পুর্ণি চাহিদা মেটায়।

পাঠ-৪ : খাদ্য পরিবেশন

খাদ্য যথাযথভাবে পরিবেশনের মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণের সম্মূর্ণ তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করা যায়। খাদ্য পরিবেশন হচ্ছে একটা কৌশলগত পদ্ধতি, যার মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা হয়।

যে পদ্ধতিতে মেনু অনুযায়ী প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্যটি কোনো সুনির্দিষ্ট কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে ব্যক্তিবর্গের গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করা হয় তাকে খাদ্য পরিবেশন বলে।

সুন্দর পরিবেশনের মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থার উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করে। বাড়িতে, বাইরে কিংবা বিভিন্ন উৎসবে খাদ্য পরিবেশনের ব্যবস্থা সুন্দর ও সুস্থু হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পরিবেশনের সাথে পারিবারিক ঐতিহ্য, সামাজিক আচার-আচরণ সম্পর্কযুক্ত। জাতিগত, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থাপনায় বিবেচনা করা দরকার।

টেবিল সাজানো

সাধারণত খাবার যখন টেবিলে সাজানো হয় সেটাই পরিবেশন। খাবার আগে টেবিল গোছানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে খাওয়ার কাজটি সহজ ও আনন্দময় করা। খাবার টেবিলে খাদ্য গ্রহণের আনুষঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় বাসনপত্র সুসজ্জিত থাকলে তা আহারের তৃপ্তি বাড়ায়।

টেবিল সাজানোর ধারাবাহিকতা নিম্নরূপ—

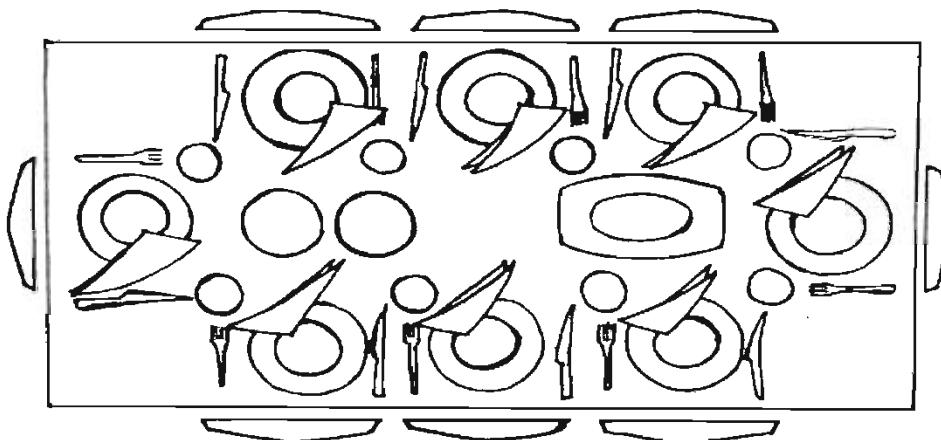
- টেবিলে কাপড় বিছানো ও ম্যাট সাজানো।
- সজ্জামূলক সামগ্রী দিয়ে সাজানো যেমন— খাবার টেবিলের উপরোগী পুঁজ্বিন্যাস করা, খাদ্য গ্রহণকারীর সংখ্যা অনুযায়ী টেবিল-চেয়ারের ব্যবস্থা করা।

- খাবারের পাত্র সাজাতে হয়। এ ক্ষেত্রে ঘরোয়া কিংবা আনুষ্ঠানিকতার মাত্রা ও রীতি অনুযায়ী সাজাতে হয়।
- খাদ্য গ্রহণের টেবিল বা স্থানটি সুবিন্যস্ত এবং শান্ত ও মনোরম পরিবেশে হওয়া দরকার। এ জন্য প্রয়োজন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও আলোকিত পরিবেশ।

আনুষ্ঠানিক পরিবেশন

কোনো নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের জন্য যে ভোজের আয়োজন করা হয় তাকেই আনুষ্ঠানিক ভোজ বলে। এ ধরনের ব্যাপক আয়োজন সাধারণত : রাষ্ট্রীয় ভোজ, সামাজিক আচার-আচরণ, বাস্তৱিক প্রীতিভোজ, বিবাহ অনুষ্ঠান ইত্যাদি ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এ ছাড়া হোটেল, রেস্তোরাঁর খাবার পরিবেশনও আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা। আনুষ্ঠানিক ভোজের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো নিম্নরূপ—

- আনুষ্ঠানিক ভোজে পদব্যাদা অনুযায়ী চেয়ার, টেবিল সাজানো হয়ে থাকে।



আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে খাদ্য পরিবেশন

- আনুষ্ঠানিক ভোজের বিশেষত্ব হচ্ছে প্রত্যেক অতিথির জন্য এককভাবে প্রতিটি খাবারের পরিবেশনের জন্য একক মোট পরিমাণ (unit) সাজানো থাকে অথবা পরিবেশনকারী পর্যায়ক্রমে পরিবেশন করে থাকে।
- সাধারণত আনুষ্ঠানিক ভোজে প্রধান অতিথির টেবিলের বিপরীত দিকে নিমজ্জনকারী বা হোস্ট/হোস্টেস বসার রীতি।
- আনুষ্ঠানিক ভোজে একই সাথে সব খাদ্য টেবিলে সাজানো থাকে না। বরং পরিবেশনকারী প্রধান খাদ্য থেকে শুরু করে খাবার শেষে বিভিন্ন ডেজার্ট (ফলমূল/মিষ্টি/পানীয় ইত্যাদি) পরিবেশন পর্যন্ত সব খাদ্যই পর্যায়ক্রমে সরবরাহ করে থাকে।
- আনুষ্ঠানিক ভোজকে আকর্ষণীয় করার জন্য পরিবেশন টেবিলের কেন্দ্রীয় সজ্জায় আলো ও পুক্ষসজ্জা করা হয়।

- যদি পরিবেশনকারী ডান দিক থেকে পরিবেশন শুরু করে তবে সে তার ডান হাত দিয়েই প্রেট, প্লাস অথবা আনুসংজীক জিনিসপত্র, খাবার এবং খাবার দিবে এবং ডান হাত দিয়ে খাওয়া শেষে সরিয়ে নেবে আবার বাম দিক থেকে পরিবেশন করতে হলে পরিবেশনকারীকে বাম দিকে দাঁড়িয়ে বাম হাত দিয়ে সরিক্ষু সরিয়ে নিতে হবে এবং দিতেও হবে।

পাঠ ৫ – বু-ফে পরিবেশন

অতিথির সংখ্যা বেশি হলে, জায়গা কম থাকলে এবং বিশেষ বা প্রধান অতিথি না থাকলে বু-ফের ব্যবস্থা করা যায়। এক্ষেত্রে উৎসবগুলোও অনন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। যেমন- জন্মদিন, আকিকা, বিবাহবার্ষিকী ইত্যাদি।

বু-ফে পরিবেশনের নীতি-

- বিভিন্ন জায়গায়, বাসার শনে বা লম্বা বারান্দায় অথবা খোলা বাগানে, হলুমে ইত্যাদি স্থানে কয়েকটি টেবিলে একই ধরনের খাবার সরবরাহ করা হয়।
- খাবার গ্রহণের প্রেট, প্লাস, চামচ, কাপ ও আনুসংজীক দ্রব্যাদি একটি টেবিলে সুদর্শনভাবে রাখা হয়।
- টেবিলের দুই পাশে একইভাবে অথবা টেবিলের চারপাশে একইভাবে খাবারগুলো সাজালে যে কোনো পাশ থেকে অতিথিরা প্রত্যেক প্রকার খাবার প্রেটে নিয়ে স্বার্থীনভাবে পছন্দমতো জায়গায় বসে গঞ্জ-গুজবের মধ্য দিয়ে আনন্দের সাথে খাবার উপভোগ করতে পারেন।

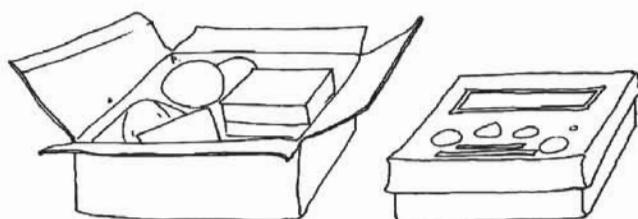


বু-ফে পদ্ধতিতে খাদ্য পরিবেশন

কাজ – খাদ্য পরিবেশনে কোন পদ্ধতিটিকে ভূমি যুগোপযোগী মনে কর এবং কেন?

পাঠ-৬ : প্যাকেট পরিবেশন

বিভিন্ন খাবারকে মোড়কজাত করে পরিবেশন করাকে প্যাকেট পরিবেশন বলা হয়। সময়ের স্বজ্ঞতা, দক্ষ শ্রমিকের অভাব, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বাড়তি ঝামেলা এড়ানো ইত্যাদি কারণে আজকাল প্যাকেট পরিবেশনের কদর বেড়েছে। সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন- মিলাদ,



প্যাকেট পরিবেশনের নমুনা

সেমিনার, ইফতার পার্টি কিংবা স্কুল-কলেজের অনুষ্ঠানে প্যাকেট পরিবেশনের বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

প্যাকেট পরিবেশনে যেসব খাদ্য সরবরাহ করা হয় তা সুষম, আকর্ষণীয়, বুচিকর এবং বহনে সুবিধা করার জন্য কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন। যেমন –

- মোড়কজাত খাবার শুকনা ও হালকা হলে পরিবেশন করতে সুবিধা হয়।
- মোড়কজাত খাবারের মেনু তৈরি করার সময় খাদ্যের চারটি মৌলিক বিভাগ থেকে খাদ্য নির্বাচন করতে হবে।
- উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ প্রোটিনের সমন্বয় করা হলে মোড়কজাত খাবারের পুষ্টিমূল্য বাড়ে।
- একঘেয়েমি দূর করার জন্য মৌসুমি ফল, মুড়কি, পিঠা প্রভৃতি দেওয়া যায়।
- খাবারের ঘনত্ব এমন হওয়া উচিত যাতে প্যাকেট ভিজে না যায়।
- স্কুলের বাচ্চাদের জন্য যখন প্যাকেটে লাক্ষ পরিবেশন করা হয় তখন তা পুষ্টিকর ও আকর্ষণীয় হওয়া উচিত এবং ক্যালরি ও প্রোটিনের দৈনিক চাহিদা $1/3 - 1/4$ অংশ এই লাক্ষ দ্বারা পূরণ করা উচিত।
- প্যাকেট পরিবেশনের উপযোগী মেনু যেমন –

 - সিঙ্গারা/সমুচা, লাজ্জু/সন্দেশ, পনির, আপেল/কলা।
 - ডালপুরি, কাবাব, সন্দেশ, সালাদ।
 - স্যান্ডউইচ, সালাদ (শসা, গাজর), যে কোনো শুকনা মিষ্টি।
 - সবজি পাকোরা, মিষ্টি, কলা।

কাজ : প্যাকেট পরিবেশনের মেনু তৈরি কর এবং মূল্যায়ন কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আদর্শ রেসিপিতে কোনটি উল্লেখ থাকে?

- | | |
|----------------|-------------------|
| ক) খাবারের নাম | খ) পরিবেশন সংখ্যা |
| গ) উপকরণ | ঘ) রন্ধন পদ্ধতি |

২। রেসিপি অনুসারে খাবার রান্না করলে—

- i. খাবারে নতুনত্ব আনা যায়
- ii. উপকরণ বাদ পড়ে যায়
- iii. খাবারে পরিবেশন সংখ্যা ঠিক থাকে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

নিচের ছক অনুযায়ী ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

উপকরণ	পরিমাণ	পরিবেশন সংখ্যা
ডিম	৬ টা	
দুধ	১ কেজি	
তেনিলা এসেপ	৮ ফ্রেঁটা	
চিনি	৬ টেবিল চামচ	

৩। উপরোক্ত পুড়ি কতো পরিবেশন হতে পারে।

- | | |
|------|-------|
| ক) ৮ | খ) ৬ |
| গ) ৮ | ঘ) ১০ |

৪। উপরোক্ত পুড়ি দ্বারা ৫ জনকে আপ্যায়ন করা হলে—

- i. অর্থের অপচয় হতে পারে।
- ii. খাদ্য উত্পন্ন থাকতে পারে।
- iii. পরিবেশনে সমস্যা হবে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। মেরের জন্মদিনে রাবেয়া বেগম তার ছেট বাসায় অনেককে আমন্ত্রণ করেন। তিনি নিজ হাতে রান্না করা থেকে শুরু করে টেবিলে খাবার সাজানো সব একাই করেন। খাবার পরিবেশনের পূর্বমুহূর্তে তিনি দেখলেন যে, একটি গুরুত্বপূর্ণ খাবারের আইটেম করা হয় নি। খাবার পরিবেশনের সময় একসাথে সবাইকে বসাতে না পেরে তিনি বিব্রতবোধ করলেন।

ক. রেসিপি কী?

খ. খাদ্য পরিবেশন বলতে কী বোঝায়?

গ. একটি গুরুত্বপূর্ণ খাবারের আইটেম বাদ পড়ার কারণটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. খাবার পরিবেশনের বৈচিত্র্যতাই পারত তার বিব্রতবোধ অবস্থা রোধ করতে— বিশেষণ কর।

২। মালা মধ্যবিস্ত পরিবারের গৃহিণী। দুই সন্তান স্কুলে পড়ে, স্বামী ও বৃন্দ মা-বাবা নিয়ে তার পরিবার। তার বাচ্চাদের মাংস-জাতীয় খাবার বেশি পছন্দ। তাদের কারণে প্রায় দিনই মাংস রান্না করা হয়। কিছুদিন হলো তার মায়ের বুকে ব্যথা করছে। ডাক্তার তার খাবারের দিকে বিশেষ নজর দিতে বললেন।

ক. মেনু কাকে বলে?

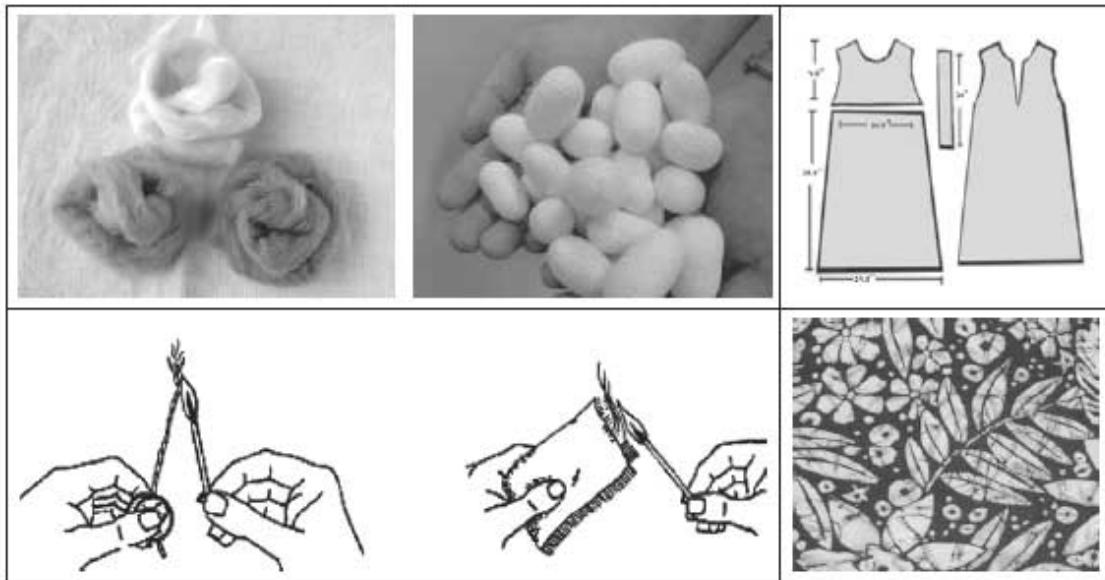
খ. খাদ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য কী? ব্যাখ্যা কর।

গ. মালার মায়ের অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণ কী? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মালার পরিবারে সকলের সুস্থতার জন্য সাঠিক মেনু পরিকল্পনা অতি গুরুত্বপূর্ণ—তোমার মতামত দাও।

ষ - বিভাগ

বস্ত্র ও বয়ন তত্ত্ব



এই বিভাগ অধ্যয়ন করে আয়োজন করে আয়োজনা –

- তত্ত্ব প্রেরণবিভাগ ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- তত্ত্ব শনাক্তকরণের এক্সিমা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পোশাক নির্ধাচনের ক্ষেত্রে শিল্প উপাদান ও শিল্পনীতি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারব;
- বর্ণচক্র বিশ্লেষণ করতে পারব;
- বর্ণচক্রের মাধ্যমে দেহের স্ফুর এবং শারীরিক কাঠামো অনুসারে পোশাকের ঝুঁট নির্ধাচন করতে পারব;
- পোশাক নির্ধাচনের ক্ষেত্রে রেখা, অঙ্গ এবং নকশার ক্ষেত্রে শিল্পনীতির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- বস্ত্রাঙ্গার প্রকার এবং পদ্ধতিসূলো ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ছাফটিংের শিয়াম জেনে পোশাক প্রস্তুত করতে উচ্চৰ্ষ হব;
- ঘড়ুমা ও বেবি ক্রকের ছাফটিং করে সঠিক মাপে তা প্রস্তুত করে দেখাতে পারব;
- বিভিন্ন নকশার বেবি মুক তৈরি করে থার্মার্ন করতে পারব;
- বস্ত্র খৌতকরণে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিকল্পনক মূল্য ও সরঞ্জামাদির বর্ণনা করতে পারব;
- বিভিন্ন খরচের পোশাক খৌতকরণ ও সজ্জকরণের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব;
- ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানী পোশাক নির্ধাচন করতে পারব।

চতুর্দশ অধ্যায়

বয়ন তন্ত্র

মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে খাদ্যের পরই বস্ত্রের স্থান। সৃষ্টির আদিতে মানুষের লজ্জা নিবারণের জন্য কোনো বস্ত্রের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু সভ্যতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ লজ্জা ও শীত-তাপ থেকে আত্মরক্ষা ছাড়াও নানাবিধ প্রয়োজনে বস্ত্র পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করল। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে ঝুঁটির পরিবর্তন হওয়ায় বস্ত্র পরিচ্ছদেও নানা বৈচিত্র্যতা দেখা দিয়েছে। মানুষ তার প্রয়োজনে নানা রকম তন্ত্র আবিষ্কার করেছে এবং করছে। বস্ত্র তৈরি হয় মূলত সুতা থেকে, এই সুতা আবার তৈরি হয় আঁশ বা তন্তু হতে। বিশেষ প্রক্রিয়ায় আঁশকে সূতায় পরিণত করা হয়। তবে এটা জেনে রাখা প্রয়োজন যে, সব রকম আঁশ বা তন্তু বস্ত্র বয়নের উপযোগী নয়। এই বয়ন তন্তুর উৎস প্রকৃতি হতে পারে আবার কৃত্রিমও হতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ে বস্ত্র তৈরির উপকরণ ছিল সুতি, লিনেন, রেশম ও পশম তন্তু। পরবর্তীতে রেয়ন, নাইলন, ডিনিয়ন, সরণ ইত্যাদি নামের অনেক কৃত্রিম তন্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রতিটি বয়ন তন্তুর বৈশিষ্ট্য সাধারণত ভিন্ন হয়। তাই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট বয়নতন্তু ব্যবহার করতে হলে সেই তন্তুটির বৈশিষ্ট্য জানা ও শনাক্ত করা প্রয়োজন হয়।

পাঠ-১ : বস্ত্র তৈরির উপযোগী তন্তু

সাধারণত বস্ত্র তৈরি হয় সুতা থেকে। তাই সুতাকে বস্ত্রের ক্ষুদ্রতম মৌলিক একক বলে মনে করা হতো। কিন্তু এ ধরনের সুতা আবার কতগুলো আঁশ বা তন্তুর সমন্বয়ে গঠিত। তন্তু বলতে যে কোনো প্রকার আঁশ বোঝালেও বস্ত্রশিল্পে তন্তু বলতে বয়ন তন্তুকেই বোঝানো হয়ে থাকে। সহজভাবে বলতে গেলে বলা যায়, বস্ত্র তৈরির কাজে যে কাঁচামাল ব্যবহার করা হয় তাকেই বয়ন তন্তু বলে। অন্যভাবে বলা যায় যে, বস্ত্রের মৌলিক ক্ষুদ্রতম এককই বয়ন তন্তু। ল্যাটিন শব্দ টেক্সো (Texo) থেকে টেক্সটাইল (Textile) শব্দের উৎপত্তি। টেক্সো কথাটির অর্থ হচ্ছে— বুনন করা। এ জন্য বস্ত্রের তন্তুকে বয়ন তন্তু বা টেক্সটাইল ফাইবার বলা হয়।

সাধারণত যেসব গুণ থাকলে কোনো আঁশ বা তন্তুকে বয়ন তন্তু হিসেবে গণ্য করা যায় সেসব বৈশিষ্ট্য গুলোর মধ্যে কিছু আছে মুখ্য বা প্রধান এবং কিছু রয়েছে গৌণ বা মাধ্যমিক গুণাবলি। প্রধান বা মুখ্য গুণাবলিগুলো হলো— দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অনুপাত, তন্তুর অন্তর্নিহিত শক্তি, নমনীয়তা, সমরূপতা, আসঞ্চনপ্রবণ ইত্যাদি। অন্যদিকে গৌণ বা মাধ্যমিক গুণাবলিগুলোর মধ্যে রয়েছে— রেসিলিয়েন্সি, উজ্জ্বলতা, স্থিতিস্থাপকতা, বিশোষণ, তাপ পরিবাহিতা, সংকোচন ইত্যাদি। নিচে বয়ন তন্তুর গুণাবলি উল্লেখ করা হলো—

মুখ্য গুণাবলি –

- ১। **দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অনুপাত (Length to width ratio)** - বয়ন তন্তুর ব্যাসের চেয়ে দৈর্ঘ্য তুলনামূলকভাবে বড় হতে হবে। অধিকাংশ প্রাকৃতিক তন্তুতেই এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। সাধারণত তন্তুর ব্যাস যত সূক্ষ্ম হবে, তন্তু তত নমনীয় ও মসৃণ হবে।
- ২। **তন্তুর অন্তর্নিহিত শক্তি (Tenacity)** - বয়ন তন্তুর পর্যাপ্ত শক্তি থাকতে হবে। ন্যূনতম শক্তি না থাকলে তন্তুকে সুতা বা বস্ত্রে পরিণত করা সম্ভব হবে না। প্রকৃতপক্ষে তন্তু কতোটুকু টান সহ্য করতে পারে তা দিয়েই তন্তুর শক্তি প্রকাশ করা হয়।

- ৩। **নমনীয়তা (Flexibility)** - বয়ন তন্তুর তৃতীয় মুখ্য গুণাবলি হচ্ছে নমনীয়তা। যেহেতু সূতা ও বস্ত্র ভাঁজ করতে হয়, তাই বস্ত্রে ব্যবহৃত তন্তুকে অবশ্যই নমনীয় হতে হবে। নমনীয়তার জন্যই বয়নতন্তু দিয়ে সূতা পাকানো যায়।
- ৪। **আসঞ্চলিক প্রবণতা (Cohesiveness)** - এ বৈশিষ্ট্যের কারণে ছোট ছোট আঁশগুলো একে অপরের সাথে জড়িয়ে থাকে। যার ফলে তন্তু থেকে উৎপাদিত সূতা বস্ত্র শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

গৌণ গুণাবলি –

- ১। **রেসিলিয়েন্সি (Resiliency)** - তন্তুকে ভাঁজ করা, মোচড়ানো বা কুঁচকানোর পর আগের অবস্থায় ফিরে আসার ক্ষমতাকে রেসিলিয়েন্সি বলে। বস্ত্রের কুণ্ডন প্রতিরোধের জন্য তন্তুর এ গুণটি থাকা উচিত। যেসব বস্ত্রের স্থিতিস্থাপকতা তালো তাদের রেসিলিয়েন্সিও তালো হয়।
- ২। **উজ্জ্বলতা (Luster)** - একটি তন্তুর নিজস্ব চাকচিক্য, মসৃণ ও দীপ্তিময় ভাবই তার উজ্জ্বলতা। উজ্জ্বলতা বয়ন তন্তুর একটি প্রয়োজনীয় গুণ। রেশম তন্তুর স্বাভাবিক চাকচিক্যের কারণেই একে তন্তুর রানী হিসেবে গণ্য করা হয়। আজকাল বিভিন্ন ধরনের তন্তুতে সমাপ্তিকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চাকচিক্য সৃষ্টি করা যায়।
- ৩। **বিশোষণ (Absorbency)** - যেসব তন্তুর আর্দ্রতা শোষণ ক্ষমতা তালো, তাতে সহজেই রং ও ফিনিশ প্রয়োগ করা যায়। এরূপ তন্তুর বস্ত্র সহজে ধোয়া যায় এবং পরিধানের জন্য সুবিধাজনক হয়। যেসব বস্ত্রের বিশোষণ ক্ষমতা কম, তাদের তাঢ়াতাঢ়ি ধুয়ে শুকিয়ে নেয়া যায়।
- ৪। **স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity)** - বয়ন তন্তুকে স্থিতিস্থাপক হতে হয় অর্থাৎ তন্তু টানলে প্রসারিত হবে এবং টান সরিয়ে নিলে আগের অবস্থায় ফিরে আসবে।
- ৫। **সমরূপতা (Uniformity)** - সূতা তৈরিতে একই দৈর্ঘ্য-প্রস্থের নমনীয়, পাঁক বা মোচড় দেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন তন্তু বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কৃত্রিম তন্তুর মতো সমরূপ প্রাকৃতিক তন্তু পাওয়া সহজ নয়। তবে এই বৈশিষ্ট্যের ফলে তৈরি সূতার মান তালো হয় এবং সূতা সমান ও মসৃণ হয়।
- ৬। **তাপ পরিবাহিতা (Heat conductivity)** - তাপ পরিবাহক হিসেবে ফ্ল্যাক্স তন্তুর স্থান স্বার উপরে। তুলাও তালো তাপ পরিবাহক হওয়ায় গরমকালে ব্যাপক হারে ব্যবহার করা হয়। প্রোটিন তন্তু তাপ কুপরিবাহী। তাই সিঙ্ক ও উল শীতকালের পোশাকের জন্য উপযোগী।

কাজ – বয়ন তন্তুর মুখ্য ও গৌণ গুণাবলি উল্লেখ করে দুটি চার্ট তৈরি কর।

পাঠ-২ : তন্তুর শ্রেণিবিভাগ

বহু বছর আগে থেকে বয়ন তন্তুর শ্রেণিবিভাগ বিভিন্নভাবে হয়ে এসেছে। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার সাথে সাথে শ্রেণিবিন্যাসের ধরনও বদল হয়েছে। প্রথম দিকের শ্রেণিবিভাগ ছিল বেশ সহজ সরল। যেমন- প্রাণিজ, উষ্ণিজ, খনিজ ইত্যাদি। কৃত্রিম তন্তু আবিষ্কারের ফলে আগের শ্রেণিবিভাগ অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে। পরবর্তীতে একই গুণসম্পন্ন তন্তুদের এক দলে ফেলে শ্রেণিবিভাগ করার প্রবণতা দেখা দেয়। এর ফলে জনগণ একই শ্রেণিভূক্ত তন্তুগুলোর গুণাগুণ, যত্ন ও ব্যবহার বিধি সম্বর্কে সম্মত জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়।

উৎস অনুযায়ী বয়ন তত্ত্বকে প্রধানত : দুইভাগে ভাগ করা যায়-১। প্রাকৃতিক তত্ত্ব এবং ২। কৃত্রিম তত্ত্ব

১। প্রাকৃতিক তত্ত্ব (Natural fiber)- প্রাকৃতিক তত্ত্বৰ মধ্যেও শ্রেণিভেদ রয়েছে। যেমন:-

(ক) উষ্ণিজ তত্ত্ব (Vegetable fibers)- উষ্ণিজ তত্ত্ব উষ্ণিজ জগৎ থেকে পাওয়া যায়, যা সেলুলোজ দিয়ে গঠিত। এরা সেলুলোজ তিতিক হওয়ায় এদের সেলুলোজিক তত্ত্ব বলে। এরা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে-

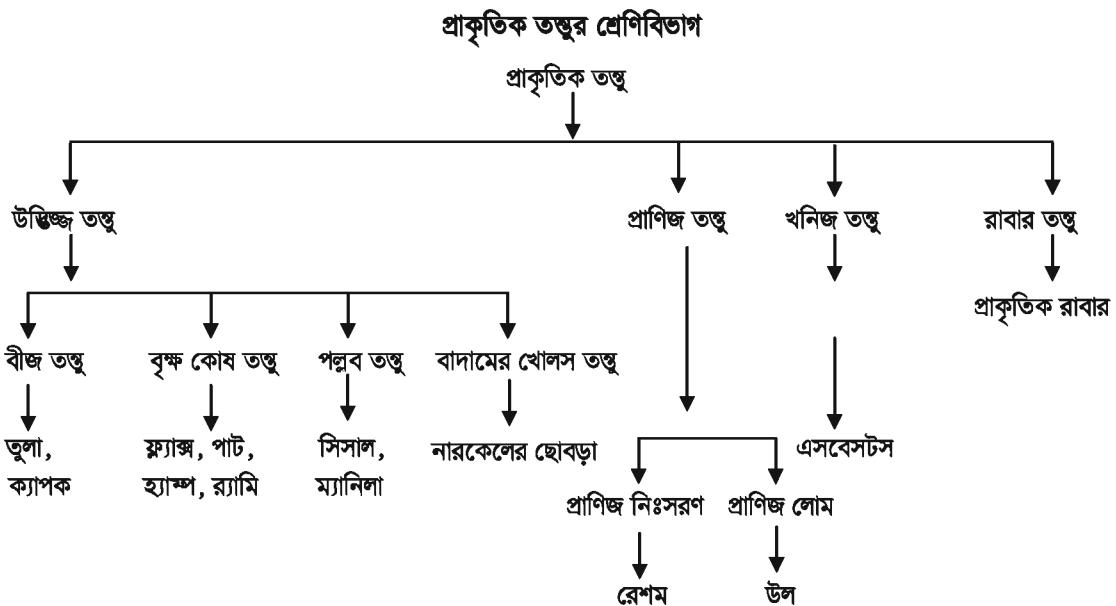
- **বীজ তত্ত্ব (Seed hairs)**- বীজের চারপাশে যে আঁশগুলো অবস্থান করে তাদের বীজ তত্ত্ব বলে। যেমন-তুলা, ক্যাপক ইত্যাদি।
- **উষ্ণিজ বাকল বা বৃক্ষ কোষ তত্ত্ব (Bast fibers)** - গাছের কাণ্ড থেকে এ তত্ত্ব পাওয়া যায়। যেমন-পাট, ফ্ল্যাঞ্চ, র্যামি, শণ ইত্যাদি।
- **গন্ধুব তত্ত্ব (Leaf fibers)** - এদের ভাসকুলার ফাইবারও বলে। গাছের পাতা, মূল বা ডাটায় পাওয়া যায়। যেমন-পিনা, সিমাল ইত্যাদি।
- **বাদামের খোলস তত্ত্ব (Nut husk fibers)** - যেমন- নারকেলের ছোবড়া থেকে প্রাপ্ত তত্ত্ব।

(খ) প্রাণিজ তত্ত্ব (Animal fibers) - প্রাণিজ তত্ত্ব প্রাণী বা পোকামাকড় থেকে পাওয়া যায়। এদের মূল উপাদান প্রোটিন, তাই এদের প্রোটিন তত্ত্ব বলেও গণ্য করা হয়। যেমন-

- **প্রাণিজ লোম তত্ত্ব (Animal hair fibers)** - বিভিন্ন প্রজাতির ভেড়া ও ভেড়া-জাতীয় পশু যেমন- আলপাকা, মোহেয়ার, এঙ্গোরা ইত্যাদির লোমকে পশমতত্ত্ব হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
- **প্রাণিজ নিঃসরণ তত্ত্ব (Animal secretion fibers)** - রেশম বা গুটি পোকার শালা নিঃসৃত পদার্থ সিঙ্ক তত্ত্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(গ) ঝনিজ তত্ত্ব (Mineral fibers) - মাটির নিচে বিভিন্ন ধরনের কঠিন শিলার স্তরে স্তরে এক প্রকার আঁশ জমা হয়, যা এসবেস্টস নামক বয়ন তত্ত্ব হিসেবে স্বীকৃত। এরা আয়রন এবং এরূপ অন্যান্য ধাতু যেমন- সোডিয়াম, এলুমিনিয়ম বা ম্যাগনেশিয়ামের জটিল সিলিকেট হয়। এরূপ তত্ত্ব এসিড, মরিচিকা ও আগুণ প্রতিরোধক্ষম।

(ঘ) প্রাকৃতিক রাবার (Natural rubber) - প্রাকৃতিক রাবারকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সংকোচন করে বিভিন্ন প্রকার তত্ত্ব ও সূতা তৈরি করা হয়।



২। **কৃত্রিম তন্তু (Man made fiber)** - যে সব তন্তু প্রাকৃতিকভাবে জন্মায়নি, মানুষ বিভিন্ন পদার্থ বা রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে উদ্ভাবন ঘটিয়েছে, তাদের কৃত্রিম তন্তু বলে। কৃত্রিম তন্তুগুলো বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ধাপে ধাপে কারখানায় তৈরি করা হয়। এসব তন্তুর কাঁচামাল প্রাকৃতিক বা রাসায়নিক হতে পারে। এরূপ তন্তুর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাই এদের খাটো বা লম্বা হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। উৎস ও রাসায়নিক গঠনের উপর ভিত্তি করে কৃত্রিম তন্তুগুলোকে ছয়ভাগের ভাগ করা যায়। যেমন-

- ক) সেগুলোজিক তন্তু** - ছোট তুলার আঁশ, বাঁশের বা কাঠের গুঁড়া ইত্যাদি প্রাকৃতিক সেগুলোজ ভিত্তিক পদার্থের সাথে রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে কৃত্রিম সেলুলোজিক তন্তু উৎপাদন করা হয়। যেমন - কিউপ্রামোনিয়াম রেয়ন, ডিসকোস রেয়ন ইত্যাদি।
- খ) পরিবর্তিত সেলুলোজিক তন্তু** - প্রাকৃতিক সেলুলোজ ভিত্তিক পদার্থের সাথে রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সেলুলোজের গঠন পরিবর্তন করে এ ধরনের তন্তু উৎপাদন করা হয়। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে সেলুলোজ বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে না। যেমন - এসিটেট, ট্রাই- এসিটেট ইত্যাদি।
- গ) সাংশেষিক তন্তু** - প্রাকৃতিকভাবে সেলুলোজভিত্তিক নয় এমন পদার্থ যেমন- কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদির সাথে রাসায়নিক পদার্থের বিক্রিয়া ঘটিয়ে যখন এমন পদার্থ সৃষ্টি করা যায়, যা তন্তুর গুণাবলি প্রকাশ করে- সেগুলোকে সাংশেষিক তন্তু বলে। নানা প্রকার প্রাকৃতিক উপাদান যেমন- কয়লা, বায়, পানি, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি থেকে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি সংশেষণ পদ্ধতিতে আলাদা করে নিয়ে আবার বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় একত্র করে এরূপ তন্তু উৎপাদন করা হয়। এদের মধ্যে রয়েছে- নাইলন, পলিয়েস্টার, একরাইলিক, ভিনিয়ল, সরন ইত্যাদি তন্তু।

- ঘ) প্রোটিন তত্ত্ব – ধান, গম, প্রভৃতি শস্য এবং দুধের প্রোটিনকে রাসায়নিক উপায়ে প্রক্রিয়াজাত করে কৃত্রিম প্রোটিন তত্ত্বতে রূপান্তরিত করা যায়। তবে বাণিজ্যিক ভাবে এরা সফলতা লাভ করে নি। যেমন- এজলন, ক্যাসিন ইত্যাদি।
- ঙ) খনিজ তত্ত্ব – বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য এককভাবে বা সংমিশ্রণ অবস্থায় প্রক্রিয়াজাত করে খনিজতত্ত্ব তৈরি করা যায়। যেমন- সিলিকা, লাইমস্টোন এবং অন্যান্য খনিজ উপাদান একত্র করে গঠন করা হয় গ্লাস তত্ত্ব।
- চ) ধাতব তত্ত্ব – এলুমিনিয়ম, রূপা, সোনা প্রভৃতি ধাতুকে খনি থেকে বিভিন্ন অপদ্রব্যের সাথে উভোলন করার পর পরিশূল্দ করে নানা উপায়ে কৃত্রিম ধাতব তত্ত্ব তৈরি করা হয়।
- অন্যান্য কৃত্রিম তত্ত্ব – এলজিনেট, টেফলন ইত্যাদিও মানুষ দ্বারা তৈরি তত্ত্ব। সমুদ্র শৈবাল থেকে প্রাপ্ত এলজিনেট তত্ত্ব পানিতে দ্রবীভূত হওয়ায় এরূপ তত্ত্বের গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে কম।

প্রাথমিক পর্যায়ে বয়ন তত্ত্বের জন্য প্রাকৃতিক উৎস ও যোগানের উপর নির্ভর করতে হলেও উনবিংশ শতাব্দির প্রারম্ভে মানুষ কৃত্রিম তত্ত্বের আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। দেখা গেছে, ১৯০০ সাল থেকে কৃত্রিম তত্ত্বের উন্নাবন উন্নরণের বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৯৩০ সালের পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা আরও উজ্জ্বলভাবে কৃত্রিম তত্ত্ব আবিষ্কারে সফল হন।

কাজ – প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম তত্ত্বের শ্রেণিবিভাগ পোষ্টারের মাধ্যমে উপস্থাপন কর।

পাঠ-৩-৪ : বিভিন্ন তত্ত্বের ব্যবহার

তুলা তত্ত্বের ব্যবহার – পোশাক পরিচ্ছদে তুলা তত্ত্ব ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কেননা এর রয়েছে বহুবিধ ব্যবহার ক্ষমতা। এই তত্ত্বের মূল্য তুলনামূলকভাবে কম, তাই এই তত্ত্বের তৈরি বস্ত্র-বিছানার চাদর, শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা, মশারি, লেপ, সোফার কাপড়, ন্যাপকিন, ঘর সাজানোর সামগ্রী ইত্যাদি কম ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া এর অর্থনৈতিক মূল্যও অনেক। কেননা এর যত্ন নেওয়া সহজ। পরিধেয় গুণাবলি ভালো হওয়ায় ভোক্তার কাছে এর চাহিদাও বেশি। সুতি বস্ত্র বেশ তাপ সহ্য করতে পারে, এজন্য ইস্ত্র করার সময় বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় না। গরম পানি দিয়ে প্রয়োজনে সিদ্ধও করা যায়। সুতি বস্ত্র মানবদেহের জন্য অত্যন্ত উপযোগী, স্বাস্থ্যসম্মত এবং সব খুতুতে ব্যবহার করা যায়। হালকা ওজনের বস্ত্রও প্রয়োজনে এ তত্ত্ব দিয়ে তৈরি করা যায়। মূলত আরামের জন্যই সুতি বস্ত্র আজ তত্ত্বের রাজা হিসেবে সমাদৃত।

অনেকদিন যাবৎ সুর্যালোকের সংসর্ষে থাকলে সুতি বস্ত্র হলুদ রং ধারণ করে এবং দুর্বল হয়ে যায়। স্যাতসেক্ষেত্রে অবস্থায় রাখলে তিলা পড়ে। এই তত্ত্ব উচ্চ তাপ সহ্য করতে পারে, ফুটন্ট পানিতে রাখলে এই তত্ত্বের কোনো ক্ষতি হয় না। ক্ষার দিয়ে সুতি বস্ত্র ধোয়া যায়। শক্তিশালী এসিডে এরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, মৃদু এসিডে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। ব্লিচিং করা যায়, তবে ব্লিচিংয়ের ফলে কাপড়ের আয়ু হ্রাস পায়। তুলা তত্ত্বের রং ধারণ ক্ষমতা ভালো, পানিতে ডিজলে তুলা তত্ত্বের শক্তি বৃদ্ধি পায়, তাই ধোয়ার সময় চাপ ও ঘর্ষণ সহ্য করতে পারে।

ফ্ল্যাঙ্ক তত্ত্বের ব্যবহার – ফ্ল্যাঙ্ক খুব শক্তিশালী তত্ত্ব। এটা দিয়ে সূক্ষ্ম সুতা ও মস্ণ লিনেন বস্ত্র তৈরি করা যায়, যা খুব মজবুত ও ঠান্ডা। এরূপ বস্ত্র পরিধানে আরাম বোধ হয়, এগুলো সহজেই ধোয়া যায়। আকর্ষণীয়, অভিজ্ঞাত, সমতলভাবে অবস্থান করে এবং সুন্দরভাবে ঝুলে থাকে- তাই টেবিল কভারের জন্যও সহজেই ফর্মা-১৯, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান-৯ম প্রেণি

নির্বাচন করা যায়। রাসায়নিক দ্রব্য ও ধোয়ার উপকরণের প্রতি প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো। সুর্যালোকে নষ্ট হয় না। পরিধেয় ও গৃহস্থালী বস্ত্র হিসেবে এর জনপ্রিয়তা অনেক। তন্তুর গঠনগত কারণে সহজে ময়লা হয় না। পানি শোষণ ক্ষমতা অনেক বেশি থাকায় এ তন্তুর তৈরি লিনেন বস্ত্র গরমের দিনের জন্য আরামদায়ক। সুতির বস্ত্রের তুলনায় লিনেন বস্ত্র বেশি টেকসই হয়।

কাজ - তুলা এবং ফ্ল্যাঙ্ক তন্তুর ব্যবহার সম্পর্কে লেখ।

রেশম তন্তুর ব্যবহার - রেশমকে তন্তুর রানী বলা হয়। এই তন্তু নরম, মসৃণ ও দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় বিলাসবহুল ও ফ্যাশন বহুল বস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। রেশমি বস্ত্র সুতি ও লিনেনের চেয়ে ওজনে হালকা। এর বহুমুখী ব্যবহার উপযোগিতার কারণে শার্ট, ব্লাউজ অর্ধাং ছেলে ও মেয়েদের পোশাক, সজ্জামূলক উপকরণের উপযোগী বস্ত্র ইত্যাদি এ তন্তু থেকে তৈরি করা হয়। স্থিতিস্থাপকতার জন্য এরূপ বস্ত্র দিয়ে নানা ধরনের কুঁচি, প্লিট, বালর প্রভৃতি ডিজাইনযুক্ত পোশাক সহজেই তৈরি করা যায়। রেশমি বস্ত্র দামি ও যত্নসহকারে ব্যবহার করলে অনেক দিন স্থায়ী হয়।

পশম তন্তুর ব্যবহার - পশম তাপ কুপরিবাহী। তাই পশমিবস্ত্র পরিধানে গরম অনুভব হয়। শীতবস্ত্র হিসেবে পশমের বহুবিধ ব্যবহার দেখা যায়। যেমন- সোয়েটার, মোজা, মাফলার, কোট, প্যাণ্ট, জ্যাকেট ইত্যাদি। এ ছাড়া পশম দিয়ে নানা ধরনের কম্বল, শাল, কার্পেট ইত্যাদিও তৈরি করা হয়। ধোয়া ও ইস্ত্রি করার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। পশমি বস্ত্র বেশ দামি। যত্নসহকারে ব্যবহার করলে অনেকদিন ব্যবহার করা যায় এবং টেকসই হয়।

কাজ - রেয়ন ও পশম তন্তুর ব্যবহার উল্লেখ কর।

রেয়ন তন্তুর ব্যবহার - অন্যান্য বস্ত্রের তুলনায় রেয়ন সম্মত। বিভিন্ন মূল্যের রেয়ন বস্ত্র বাজারে পাওয়া যায় বলে এরূপ বস্ত্র সহজেই অনেকে কিনতে পারে। রেয়ন তন্তুর একটি গুণ হলো এর আকর্ষণীয় রূপ। বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন মাত্রার এরূপ উজ্জ্বল তন্তু বাজারে পাওয়া যায়। এ ছাড়া বহুমুখী ব্যবহারের জন্য এই তন্তু বেশ জনপ্রিয়। এরূপ তন্তুর নির্মিত কার্পেট, পর্দা ইত্যাদি ঘরের নতুনত্ব আনয়ন করে। রেয়ন তন্তুর বস্ত্র মজবুত, উজ্জ্বল ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে রেয়ন হতে নানা রকম অভিজ্ঞাত বস্ত্র প্রস্তুত করা যায়। এরূপ বস্ত্র সহজে ধোয়া ও যত্ন নেওয়া যায়। এই তন্তুর পানি শোষণ ক্ষমতা কম বলে দ্রুত শুকায়।

নাইলনের ব্যবহার - নাইলনের বস্ত্র মজবুত ও ওজনে হালকা হওয়ায় এর বহুমুখী ব্যবহার দেখা যায়। টেকসই ও স্থিতিস্থাপক বলে অন্তর্বাস, মশারি, বিছানার চাদর, আসবাবপত্রের ঢাকনা, ছাতার কাপড়, ফিতা, চুপের নেট, লেস, সুতা, মাছ ধরার জাল, চামড়া জাতীয় সামগ্ৰীর আস্তরণ, কার্পেট, গলফ খেলার ব্যাগ ইত্যাদি তৈরিতে নাইলনের সুতা ও বস্ত্র ব্যবহৃত হয়। নাইলনের বস্ত্র সহজেই ধোয়া ও শুকানো যায়, এজন্য বৰ্ষার দিনে বেশি ব্যবহার করা হয়। নাইলনের তন্তু অন্যান্য তন্তুর সমন্বয়ে নানা ধরনের গুণসম্পন্ন বস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। যেমন- নাইলন-সুতি, নাইলন-পশম, নাইলন- রেয়ন ইত্যাদি। ময়লার প্রতি আকর্ষণ কম বলে সহজে ময়লা ধরে না। বেশি ইস্ত্রি করারও দরকার হয় না।

কাজ- রেয়ন ও নাইলন তন্তুর ব্যবহার পোষ্টারের মাধ্যমে উল্লেখ কর।

পাঠ - ৫-৬ : তত্ত্ব শনাক্তকরণ

বাজারে নানা ধরনের প্রাকৃতিক, কৃত্রিম ও মিশ্র তত্ত্ব বস্ত্র দেখা যায়। কোনো একটি নির্দিষ্ট পরীক্ষার মাধ্যমে একটি কাপড়ের তত্ত্ব প্রকৃতি সঠিকভাবে নির্ণয় করা কষ্টকর। একাধিক পরীক্ষার সাহায্যেই তা স্থির করতে হয়। সাধারণত যেসব পরীক্ষার সাহায্যে তত্ত্ব প্রকৃতি নির্ধারণ করা হয় তাকেই তত্ত্ব শনাক্তকরণ বলে। তত্ত্ব চেনার জন্য যেসব পরীক্ষার আশ্রয় নিতে হয় সেগুলো হলো—

তত্ত্ব ভৌত পরীক্ষা (Physical test) - ভৌত পরীক্ষাগুলো ঘরে বসেই করা যায়। এগুলো অপ্রযুক্তিগত বা non technical হওয়ায় এসব পরীক্ষার উপর খুব বেশি নির্ভর করা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তত্ত্ব প্রকৃতি সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায় মাত্র, সঠিকভাবে তত্ত্ব প্রকৃতি নির্ধারণ করা যায় না।

ভৌত পরীক্ষাগুলো নিচে তুলে ধরা হলো—

- ১। **সর্প করে পরীক্ষা** – অনেক দিনের অভিজ্ঞতার কারণে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি হাত দিয়ে সর্প করে বিভিন্ন প্রকার তত্ত্ব তৈরি কাপড় শনাক্ত করতে পারেন। যেমন— সুতির কাপড় হাত দিয়ে ঘষলে ঠাণ্ডা ও নরম অনুভূতি জাগে। লিনেন কাপড় সুতি কাপড়ের তুলনায় অনেক ঠাণ্ডা ও মসৃণ মনে হয়। তবে পশমি বস্ত্র গরম ও নমনীয় এবং রেশমি বস্ত্র গরম ও মসৃণ মনে হয়। দুই বা ততোধিক তত্ত্ব দিয়ে মিশ্রিত তত্ত্ব কাপড় এ পদ্ধতিতে শনাক্ত করা কঠিন।
- ২। **চাক্স পরীক্ষা** – ভৌত পরীক্ষাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সহজ পরীক্ষা হলো চাক্স পর্যবেক্ষণ। তত্ত্ব দৈর্ঘ্য, উজ্জ্বলতা ইত্যাদি দেখে তত্ত্ব প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করা যায়।
- ৩। **ঁাঁজ করে পরীক্ষা** – একটি বস্ত্র দুই ঁাঁজ করে আঙুলের সাহায্যে চেপে ধরতে হবে। বস্ত্রটি যদি ফ্ল্যাঙ্ক তত্ত্ব হয় তাহলে ঁাঁজের দাগ বেশ সুস্পষ্ট হবে এবং এ দাগ সহজে মিলে যাবে না। সুতির বস্ত্রেও ঁাঁজের দাগ পড়বে কিন্তু এ দাগ লিনেনের মতো এত সুস্পষ্ট হবে না। রেশমি ও পশমি বস্ত্রে এ পরীক্ষায় কোনো ঁাঁজ পড়বে না। কাজেই এ পরীক্ষার সাহায্যে সুতি– লিনেন ও রেশমি– পশমি বস্ত্রের পার্থক্য শনাক্ত করা যায়।
- ৪। **পাক খুলে পরীক্ষা** – বস্ত্র থেকে কয়েকটি সূতা বের করে তাদের পাক খুলে ফেলতে হবে। বস্ত্রটি পশম তত্ত্ব হলে পশমি সূতায় পশমের স্বাভাবিক ঁাঁজ বা ঢেউ দেখা যাবে। এ ছাড়া একটি সূতাকে ছিঁড়ে তার ছেঁড়ে অংশ পরীক্ষা করেও তত্ত্ব উৎস শনাক্ত করা যায়। যেখানে তত্ত্বটি ছিঁড়ে যাবে তার সম্মুখভাগ যদি দেখতে সুঁচের মতো সরু হয় তবে তা ফ্ল্যাঙ্ক তত্ত্ব বুঝতে হবে। অন্যদিকে যদি সম্মুখভাগ দেখতে একটি তুলির সম্মুখভাগের মতো মোটা হয় তবে তা তুলা তত্ত্ব বলে বুঝতে হবে।
- ৫। **ভিজিয়ে পরীক্ষা** – এ পরীক্ষার সাহায্যে ফ্ল্যাঙ্ক ও নাইলন তত্ত্ব সহজেই চেনা যায়। কেননা লিনেন বস্ত্রের পানি শোষণ ক্ষমতা বেশ ভালো। আঙুলের সাহায্যে এক ফোটা পানি কোনো কাপড়ের উপর রাখার সাথে সাথে যদি পানি কাপড়ে প্রবেশ করে এবং চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তবে বুঝতে হবে কাপড়টি ফ্ল্যাঙ্ক তত্ত্ব দিয়ে প্রস্তুত। অন্যদিকে শোষণ ক্ষমতা না থাকার কারণে নাইলন তত্ত্ব বস্ত্রে পানি প্রবেশ করবে না।
- ৬। **গরম ইস্ত্র দিয়ে পরীক্ষা** – এ পরীক্ষার মাধ্যমে কৃত্রিম তত্ত্ব বস্ত্র সহজেই শনাক্ত করা যায়। একটি

ইতিমধ্যে সর্বমুক্ত কাপড়ের উপর চেপে খালে বলি কাপড়চূটি এলিটেট, সাইলন বা তেজোস তত্ত্ব দ্বাৰা ভাবে তা একেবারেই গলে যাবে। কৃষ্ণা, কৃষ্ণ, ক্রেশ, পথ বা জোনের হাল কাপড়ে শান্তভাবে পোড়া যাবে পর্যবেক্ষণে।

- ৭। সেখেল মেৰে পৰীক্ষা – কাপড়ের পাত্র সহজে লেবেলে অথবা সম্পর্কিক নাম ধূঢ়নের ফলে সেখেল পৰীক্ষা দ্বাৰা ধূঢ়ন কৰতে পাবে, বা সেখেল একেবল কেৱল কাপড়চূটি কৈল ধূঢ়নের তত্ত্ব তৈরি সে সম্পর্কে ধাৰণা লাভ কৰতে পাবে।
- ৮। কাপড় পুঁজিৰ পৰীক্ষা – পোড়ানো পৰীক্ষা ধূঢ়ন পুঁজি তালো আধিক্যিক পৰীক্ষা। এ পৰীক্ষার কল্পনা কল্পনার কাপড়গুলো হচ্ছে— কাপড়ের টীকা সূতা হচ্ছে সুই একটা সূতা লিঙে গুৰু পুঁজি আলুদের শিখায় ধূঢ়ন পুঁজিলের সন্দৰ্ভে এ হচ্ছে পুঁজিৰ পৰীক্ষা কৰতে হবে এবং তত্ত্ব ধূঢ়নে হেঁ পুঁজি হচ্ছে তা কুকু কৰতে হবে। অৱশ্যে পাত্রে সূতা নিয়ে পুঁজিলের পৰীক্ষা কৰতে হবে। কুন্নন প্রক্ৰিয়ায় কাপড়চূটি তৈরি না হলে সূতাৰ পৰিবৰ্তে এক ইৰুকু কাপড় পোড়ানো পৰীক্ষার ব্যবহৃত কৰতে হবে।



পোড়ানো পৰীক্ষার তত্ত্ব হ্যাবন্ডে



পোড়ানো পৰীক্ষার কাপড়চূটি হ্যাবন্ডে



পোড়ানো পৰীক্ষার হাই বা অবশিষ্টান্ত

তত্ত্ব পোড়ানো পৰীক্ষার ফলাফলের চার্ট

ক্ষ.	সেখেল কল	পীথি তেলে ধীৰিয়া	পীথি কাতে ধীৰিয়া	ধূল	কলীক্ষণ র হাই
১	পীথিৰ কল কলাম সহজে হাবে।	হাত সেজে। কুকু কুকু তীব্ৰ সেজে হাবে।	পীথি কেক সীমে আৰাম কুকু সুকু হাবে।	সামৰ পোড়ানো সেজে হাত হাত হাবে।	পীথেলে সেজে হাস্তা, ক্রাম, কুকু হাবে অবশিষ্টান্ত হাবে।
২	পীথিৰ কলাম কুকু গুটি হাবে।	কুকু পোড়ে এবং পোড়ানো কলাম কুকু হাবে।	সামৰেত সিলেক নিক হাবে।	কুকু বা কলাম পোড়ানো হাবে হাবে।	কুকু বা কলাম কলাম হাবে, অট কলাম গুটি গুটি হাবে।
৩	পীথিৰ কলাম হাবে, সহজে হাবে।	কাতে কাতে হাতে হাতে পোড়ে।	পীথি নিকেল হাবে হাবে।	সামৰে হাবে হাবে হাবে।	কুকু, কলাম, কুকু সেজে আৰাটো গুটিক পীথাবান, বা জাহা হাবে হাবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বয়ন তত্ত্বের প্রধান বা মুখ্য গুণাবলি কোনটি?

- | | |
|-----------|--------------|
| ক) বিশোষণ | খ) নমনীয়তা |
| গ) সংকোচন | ঘ) উজ্জ্বলতা |

২। তত্ত্বের ব্যাসের উপর কাপড়ের কোন বৈশিষ্ট্যটি নির্ভরশীল?

- | | |
|-------------------|-------------|
| ক) উজ্জ্বলতা | খ) খসখসে |
| গ) স্থিতিস্থাপকতা | ঘ) নমনীয়তা |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আনীদ বৃক্ষিতে ভিজে এসে তার স্কুল ড্রেস খুলে রাখল। দুই দিন পর তার মা ধোয়ার জন্য বের করে দেখলেন জামায় ছোট ছোট কালো দাগ পড়েছে। ফলে জামাটি পরার অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে।

৩। আনীদের জামাটি কোন তত্ত্বের তৈরি?

- | | |
|---------|----------|
| ক) রেশম | খ) সুতি |
| গ) পশম | ঘ) নাইলন |

৪। আনীদের জামাটি পরার উপযোগী করার উপায় হলো –

- বিচিত্রের ব্যবহার
- ধোয়ার সময় ঘষে ঘষে ধোয়া
- গাঢ় এসিডে ধোয়া

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১। নাজমা বেগম পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি থাকতে পছন্দ করেন। কিছুদিন হলো তিনি গরমে ইাপিয়ে উঠছেন এবং তাঁর শ্বাসকষ্ট দেখা দিচ্ছে। এই অবস্থা দেখে তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে বললেন, তোমার পরিধেয় বস্ত্রের কারণে এমনটি হচ্ছে এবং তাঁরা নাজমাকে আরামদায়ক কাপড় পরার পরামর্শ দিলেন।

- বীজ তত্ত্ব কী?
- সাংশেষিক তত্ত্ব বলতে কী বোঝায়?
- নাজমা বেগম কোন ধরনের কাপড় ব্যবহার করছেন—ব্যাখ্যা কর।
- নাজমা বেগমের এই অবস্থায় সহকর্মীদের পরামর্শটি কী যুক্তিযুক্ত? ব্যাখ্যা কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পোশাকের শিল্প উপাদান ও শিল্পনীতি

ব্যক্তিত্ব বিকাশে পোশাকের ভূমিকা অন্যীকার্য। ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য প্রত্যেকের উচিত রুচিসম্মত পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা। যেহেতু পোশাক-পরিচ্ছদ দৈনন্দিন জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, তাই এই শিল্প প্রস্তুত, নির্বাচন ও পরিধানে শিল্প উপাদান ও শিল্পনীতির সুষ্ঠু প্রয়োগে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।

পাঠ-১-৩ : পোশাকের শিল্প উপাদান

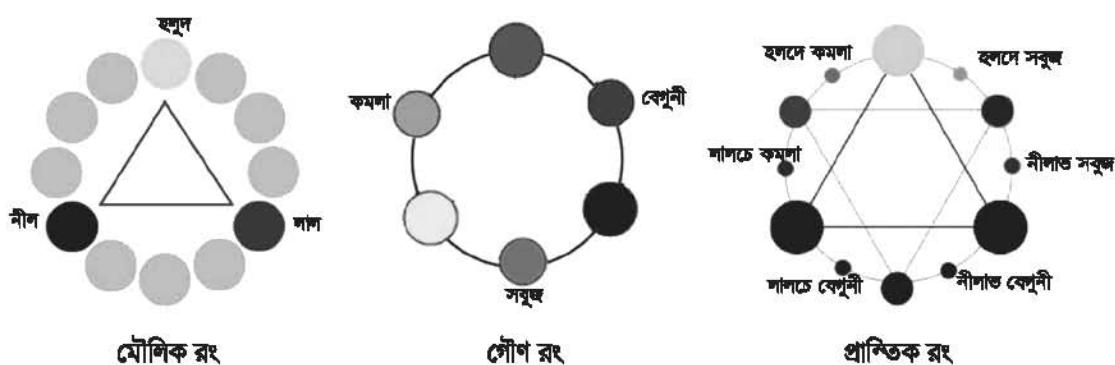
পোশাক তৈরি কারুশিল্পের অর্ণগত একটি শিল্প। অন্যান্য শিল্পের ন্যায় এই শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রেও বহু বছর আগে থেকেই কিছু উপাদান ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পোশাকশিল্পে যেসব শিল্প উপাদানগুলো ব্যবহৃত হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— রং, বিদ্রু, রেখা, আকার ও জমিন। ব্যবহার উপযোগী সুন্দর ও আকর্ষণীয় পোশাক তৈরির ক্ষেত্রে এই শিল্প উপাদানের যথাযথ প্রয়োগ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রং— আমাদের চারপাশের প্রতিটি বস্তুরই নিজস্ব রং রয়েছে। এই রঙের উৎস প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম হতে পারে। পোশাক পরিচ্ছদে সুষ্ঠুভাবে রং ব্যবহার করার জন্য বর্ণচক্রের রং সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা দরকার।
রং মূলত তিন প্রকারঃ— ১। মৌলিক রং ২। গৌণ রং ৩। প্রাণ্তিক রং।

১। **মৌলিক রং** – লাল, হলুদ ও নীল এই তিনটি মৌলিক রং। মৌলিক বা প্রাথমিক রংগুলো বিশুদ্ধ রং।
কেননা এগুলো অন্যান্য রঙের সংমিশ্রণে তৈরি হয় না বরং এদের সংমিশ্রণে অন্যান্য রং সৃষ্টি হয়।

২। **গৌণ রং** – দুইটি মৌলিক রঙের মিশ্রণে গৌণ রং তৈরি হয়। এদেরকে মিশ্র বা মাধ্যমিক বর্ণও বলা হয়।
যেমন—হলুদ + নীল = সবুজ, নীল + লাল = বেগুনি, লাল + হলুদ = কমলা।

৩। **প্রাণ্তিক রং** – মৌলিক রঙের সাথে কাছাকাছি যে কোনো একটি গৌণ রং মিশিয়ে প্রাণ্তিক রং প্রস্তুত করা হয়। যেমন— হলুদ + সবুজ = হলদে সবুজ, নীল + সবুজ = নীলাত সবুজ, নীল + বেগুনি = নীলাত
বেগুনি, লাল + বেগুনি = লালচে বেগুনি, লাল + কমলা = লালচে কমলা, কমলা + হলুদ = হলদে
কমলা।



কাজ - মৌলিক রং, গৌণ রং এবং প্রান্তিক রং উল্লেখ করে একটি বর্চক্র তৈরি কর।

প্রত্যেক প্রকার রঞ্জেই নিচের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মৌলিক রঞ্জগুলোর মধ্যে শাল ও হলুদ এবং তাদের মিশ্রণে উৎপন্ন সমস্ত রঞ্জগুলো উক্ত বা উজ্জ্বল বর্ণ নামে পরিচিত। অন্যদিকে নীল এবং নীলের মিশ্রণে উৎপন্ন রঞ্জগুলো শীতল বা স্থিত বর্ণ নামে পরিচিত। সাধারণত উক্ত (Warm colour) রঞ্জগুলো আগাত দৃষ্টিতে দূরের জিনিস কাছে টানে, বস্তুকে অপেক্ষাকৃত বড় করে তোলে এবং প্রাণ্য সৃষ্টি করে। অন্যদিকে শীতল (Cool colour) রং আগাত দৃষ্টিতে পরিবেশে শান্তভাব আনে, বস্তুকে দূরে সরিয়ে দেয়, বস্তুকে অপেক্ষাকৃত ছোট করে দেখায়।

কাজ - বিভিন্ন ধরনের রঞ্জের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।

পোশাকে রঞ্জের ভূমিকা-

পোশাকের জন্য মাননসই রং নির্বাচন করে ব্যক্তিত্বকে যথাযথভাবে বিকশিত করা যায়। আবার যে রং মানায় না সে রঞ্জের পোশাক পরলে মানুষকে মশিন দেখায়। প্রকৃতপক্ষে সবই রঞ্জের কারসাজি। যেহেতু রঞ্জের ভূমিকা ব্যাপক তাই পোশাকের রঞ্জের প্রতি আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। পোশাকে রঞ্জের ভূমিকা সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো-

১. **সুর্তু ব্যক্তিত্ব গঠন** - রং চেহারার মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারে। পোশাকের রং সঠিকভাবে নির্বাচন করলে সকলকেই ব্যক্তিভূসম্পর্ক মনে হবে। বয়স, ব্যক্তিত্ব, উপলক্ষ ইত্যাদি অনুসারে পোশাকে উপযুক্ত রং নির্বাচনে ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে পোশাকের ত্রিপূর্ণ রং নির্বাচন সৌন্দর্য বা ব্যক্তিত্বকে ঘৃন করে দিতে পারে। পোশাকের রং নির্বাচন করার সময় তাই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
২. **ত্বকের উজ্জ্বলতা প্রদান** - পরিধানকারীর দেহ ত্বকের উপর পোশাকের রঞ্জের প্রভাব অনেক বেশি। তাই পোশাকের রং এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে দেহত্বক বাহ্যিক দৃষ্টিতে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠে।
- **ত্বকের বর্ণ উজ্জ্বল হলে হালকা বর্ণের এবং অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল বর্ণের ত্বকের ক্ষেত্রে গাঢ় বর্ণের পোশাক পরা শ্রেষ্ঠ।**

৩. দেহাকৃতির পরিবর্তন – রং পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যক্তিবিশেষকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে স্তুলকায় বা কৃষকায় হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। তাই দেহাকৃতি বিবেচনা করে পোশাকের রং নির্বাচন করা উচিত।

- অন্যা ও মধ্যম দেহাকৃতির ব্যক্তিরা বয়সের সাথে সঙ্গতি রেখে সব রঙের পোশাকই নির্বাচন করতে পারে।
- অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতা ও কৃষকায় ব্যক্তির জন্য দুই রং বিশিষ্ট পোশাক উপযুক্ত হবে না। এ ধরনের ব্যক্তিদের সাধারণত হালকা রঙের পোশাকই মানায়।
- কৃষভাব বাহ্যিক দৃষ্টিতে কমানোর জন্য উজ্জ্বল রঙের পোশাক নির্বাচন করা যেতে পারে। কৃষকায় ব্যক্তি বিপরীত রঙের পোশাক পড়তে পারে।
- স্তুলকায় ব্যক্তিদের গাঢ় রঙের পোশাক পরলে আরও স্তুল দেখাবে। তাই হালকা রঙের পোশাক ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপকরণ এরা নির্বাচন করতে পারে।

৪. প্রাধান্য সৃষ্টি – পোশাকের রং নির্বাচনে প্রাধান্য দিতে হলে উজ্জ্বল বা গাঢ় রং নির্বাচন করা যেতে পারে।
যেমন–

- কোনো পোশাকে গাঢ় রঙের ডিজাইন ব্যবহার।
- বিপরীত রং ব্যবহার করেও পোশাকের আকর্ষণ বাড়ানো যেতে পারে।

আবার কোনো ব্যক্তি যদি নিজেকে প্রকাশ করতে না চায় তাহলে শীতল বা হালকা রঙের পোশাক নির্বাচন করতে পারে।

৫. পোশাকে সমন্বয় রক্ষা – রং পোশাকের ডিজাইনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই দেহ ত্বক ও শারীরিক গঠনকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্য পোশাকে সন্নিবেশিত বিভিন্ন রঙের সম্পর্ক এমন হওয়া উচিত, যাতে সব রং মিলে একটি সমন্বয়ের আভাস পাওয়া যায়। একটি পোশাকে বিভিন্ন রং ব্যবহৃত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে পোশাকে সমন্বয় রক্ষা করতে হলে –

- দুটি রঙের ব্যবহার এক না হয়ে একটি অপরটি হতে বেশি হওয়া উচিত
- আবার যখন হালকা রঙের পোশাক নির্বাচন করতে হয় তখন পোশাকের ছোট ছোট অংশে গাঢ় রং ব্যবহার করা উচিত
- এ ছাড়া কোনো ব্যক্তির জন্য যে রং মানানসই হবে পোশাকে সে রং দিয়ে প্রাধান্য সৃষ্টি করা যেতে পারে।

কাজ – তোমার দেহাকৃতি বিবেচনা করে কোন রঙের পোশাক ব্যবহার যথাযথ তা ব্যাখ্যা কর।

পোশাকের রেখার প্রভাব – পোশাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে রেখা একটি শক্তিশালী শিল্প উপাদান। কতোগুলো রেখার সমন্বয়ে একটি পোশাকের আকৃতি গড়ে উঠে। পোশাকের নকশায় রেখার বৈচিত্র্যময় বিন্যাসের ফলে পরিধানকারীকে কখনো লম্বা, কখনো খর্বকায়, কখনো ছুল, আবার কখনো কৃষকায় মনে হয়। পোশাকের নকশায় রেখার সূচু বিন্যাসের মাধ্যমে দেহের ছোটখাটো ভূটি গোপন করা যায়।

রেখা মূলত দুই প্রকার – (১) খাড়া রেখা ও (২) বক্র রেখা। এ ছাড়া রেখার গতিপথের উপর নির্ভর করে রেখাকে আবার ছয় ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন – ১। খাড়া রেখা ২। সমান্তরাল রেখা ৩। কোনাকূনি রেখা ৪। বক্র রেখা ৫। তীর্থক রেখা এবং ৬। তগ্ন রেখা।

প্রতিটি রেখার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা পরিধানকারীর দেহ কাঠামো, উচ্চতা, মুখমণ্ডল, গ্রীবা প্রভৃতির উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। এসব রেখার সূচিভিত্তি নির্বাচন ও সূব্য বিন্যাসের মাধ্যমে দেহের ভূটি গোপন করে ব্যক্তিত্বকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। এখানে পোশাকের উপর বিভিন্ন রেখার প্রভাব তুলে ধরা হলো।

১। খাড়া রেখা – খাড়া বা লম্বা রেখা গম্ভীর উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টা, সাহস, সততা ইত্যাদি প্রকাশ করে। এই রেখা সাধারণত কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য আপাত দৃষ্টিতে বাঢ়ায়। তাই এই রেখার নকশার পোশাক ছুলকায় ও অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতার ব্যক্তির জন্য বিশেষ উপযোগী। এতে ব্যক্তির উচ্চতা কিছুটা বাড়িয়ে দেয় বলে মনে হয়।



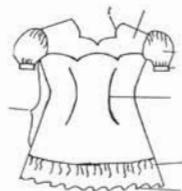
পোশাকে খাড়া রেখা

২। সমান্তরাল রেখা – এ ধরনের রেখার মাধ্যমে বিশ্রাম ও আরামের অনুভূতি আসে। লম্বা ও কৃষকায় ব্যক্তির জন্য এ ধরনের রেখার পোশাক উপযোগী। এতে তাদের দেহের কৃশ ভাব কিছুটা কম মনে হয়। এ গঠনের মেঝেরা চওড়া পাড়ের শাড়ি, আড়াআড়ি রেখার ডুরে শাড়ি পরতে পারে এবং ছেলেরা আড়াআড়ি রেখার পাঞ্জাবী পড়তে পারে। এই রেখা আপাত দৃষ্টিতে কোনো কিছুর দৈর্ঘ্যকে হ্রাস করে এবং প্রশস্ততা বৃদ্ধি করে।



সমান্তরাল রেখা

৩। বক্র রেখা – বক্র রেখা দিয়ে কোমলতা, নমনীয়তা, তৎপরতা ইত্যাদি বোবানো হয়। বক্র রেখার গতি উত্তর্মুখী হলে আনন্দ-উদ্বাস বোবায়। পক্ষান্তরে গতি নিম্নমুখী হলে তা বিশাদের ভাব প্রকাশ করে। চেউ খেলানো বক্র রেখা আপাত দৃষ্টিতে দৈর্ঘ্য কমায়, তবে সৌন্দর্য ও কোমনীয়তা বাড়িয়ে দেয়। এরূপ রেখা পোশাকে বৈচিত্র্য ও ছবি আনে।



বক্র রেখা

৪। তীর্থক বা কৌশিক রেখা – তীর্থক রেখা সংযমের পরিচয় বহন করে। এই রেখার বৈচিত্র্যময় ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য হ্রাস ও বৃদ্ধি করা যায়। তীর্থক রেখাগুলো উত্তর্মুখী, সরু ও কাছাকাছি হলে পরিধানকারীকে লম্বা এবং অন্যদিকে নিম্নমুখী, চওড়া ও কাছাকাছি না হলে ছুলকায় ও উচ্চতায় কম মনে হবে।



তীর্থক রেখা

৫। আকারীকা বা হিগজ্যাগ রেখা – এই রেখা দৈত ভূমিকা পালন করে। এই রেখাগুলোর কোণের মাত্রা ও দিকের উপর নির্ভর করে কোনো কোনো সময় ব্যক্তিকে লম্বা এবং কোনো কোনো সময় উচ্চতায় কম ও ছুলকায় মনে হয়।

পোশাকে বিদ্যুর প্রভাব – যে কোনো শিল্পের গাঠনিক একক (building block) বা ভিত্তি হচ্ছে বিদ্যু। বিদ্যু বড়, ছোট, মোটা বা চিকন হতে পারে। আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে, তাদের প্রত্যেকের মাঝেই আছে রেখা। আর এই রেখার সৃষ্টি হয় বিদ্যু থেকে। ছোট একটি বিদ্যু যখন গতি পায় তখন তা থেকেই রেখা, আকার, আকৃতি গঠিত হতে পারে। আবার অসংখ্য ছোট ছোট বিদ্যুর সমন্বয়ে নতুন এক অনুভূতির মাধ্যমে জমিন সৃষ্টি করা যায়, যাকে stippling বলে। পোশাকে বিদ্যুর পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে ছবি আনায়ন করা যায়।



হিগজ্যাগ রেখা



পোশাকে বিদ্যুর প্রভাব

কাজ – পোশাকে বিভিন্ন ধরনের রেখার প্রভাবের উপর একটি চার্ট তৈরি কর।

পোশাকে আকৃতির প্রভাব – দেহের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পরিচ্ছদের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যে পরিচ্ছদ ব্যক্তিত্ব ও দেহের সৌন্দর্যকে ছাপিয়ে নেতৃবাচকভাবে উপস্থাপন করে, সে পরিচ্ছদ যত মূল্যবানই হোক না কেন তা বর্জনীয় হবে। আর ব্যক্তিত্বের সঠিক বিকাশের জন্য প্রত্যেকের উচিত নিজেকে জানা।

- প্রত্যেকেরই নিজের ধরন ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করা উচিত। দেহের বিভিন্ন পেশি ও অংশ বিশেষের গঠনভঙ্গিকে প্রাথান্য দিতে গিয়ে অক্ষ রাখা দরকার, যাতে পরিচ্ছদ বেশি আঁটসাঁট না হয়। অন্যথায় সৌন্দর্যের হানি ঘটে।
- পরিচ্ছদ নির্বাচন করার সময় দৈহিক উচ্চতা ও আকার ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে কম লম্বাযুক্ত ও ছুলকায় ব্যক্তিরা ছোট ছাপার কাপড় পড়বেন। দেহের বিভিন্ন অংশের ত্রুটি সুপরিকল্পিত পোশাকের আকৃতির মাধ্যমে পোশন করে সুস্মর দিকগুলো প্রস্ফুটিত করে ব্যক্তিত্বকে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়।
- পোশাকে ইয়েক, চিকন টাক, কুঁচি, পকেট, চওড়া কলার ইত্যাদি ব্যবহার করে দেহের গাঠনিক পরিমার্জনের পাশাপাশি সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যায়।
- গ্রীবা ছোট ব্যক্তিদের জন্য ‘ভি’ বা ‘ইউ’ আকৃতির গলার নকশা মানানসই। এদের জন্য ছোট গলা বা উচু কলার উপযুক্ত নয়। অন্যদিকে যাদের গ্রীবা লম্বা বা সরু তাদের জন্য ছোট গলা এবং উচু ফিটিং গলা বেশি মানানসই।

- মানুষের মুখের আকৃতি নানা রূপর হয়। যেমন—লম্বা, গোল, চারকোনা, ডিম্বাকৃতি। যাদের মুখের আকৃতি চারকোনা বা গোলাকার তাদের ‘ডি’ আকৃতি এবং ‘ইউ’ আকৃতির গলার নকশা ব্যবহার করা ভালো। লম্বা মুখ হলে ছেট গলার নকশা মানানসই হয়। এ ধরনের ব্যক্তিরা উচ্চ কলারের জামা পরলে তাদের গ্রীবার সরু ভাব ঢাকা পড়ে।



ডিম্বাকৃতি মুখে গলার নকশা



গোল বা চারকোনা মুখে গলার নকশা

- অনেকের পেছনের দিকে ঘাড়ের কাছে মাঝে উচ্চ হয়ে থাকে। তা ঢাকার জন্য কেউ কেউ উচ্চ কলার সুন্দর পোশাক পরে। কিন্তু একেতে সঠিক উপায় হচ্ছে পোশাকের গলার ইটাটিকে ওই মাঝসিঙ্গের ঠিক মাঝামাঝি স্থান দিয়ে নিয়ে আসা। এভাবে তৈরি পোশাক পরলে ঘাড়ের গাঠনিক পরিমার্জন সহজেই সম্ভব হবে।
- চেহারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আলংকারিক বস্তুও নির্বাচন করতে হবে। যেমন— লম্বা চেহারার যদি লম্বা কানের দূর কিংবা একটি লম্বা নেকলেস পরে, তাহলে তাকে আরও লম্বা মনে হবে।

কাজ – কোন ধরনের দেহাকৃতির জন্য কী ধরনের পোশাকের ডিজাইন হওয়া উচিত উল্লেখ কর।

পোশাকে জমিনের প্রভাব – কাপড়ের জমিন নানা ধরনের হয়। পশমি বস্ত্র নরম, রেশমি কাপড় দেখতে উজ্জ্বল, স্যাটিন বস্ত্র চকচকে এবং সুতি বস্ত্র দৃঢ় প্রকৃতির হয়। সুতি, রেশমি, পশমি ছাড়াও তসর, আভি, অর্ণ্যাভি ইত্যাদি কাপড়েও অনেক জমিন দেখা যায়। বস্ত্রের জমিনের ভিন্নতার জন্য প্রতিটি পোশাক ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়। যেমন— নরম, মধ্যম, দৃঢ়, ওজনে ভারী, চকচকে, নিম্নলভ ইত্যাদি। জমিনের সূর্য ব্যবহার করে ব্যক্তি নিজেকে কাজিত পর্যায়ে উপস্থাপন করতে পারে।

- জার্সি, শিফল ইত্যাদি নরম প্রকৃতির কাপড়। এসব কাপড়ের পোশাক শরীরের সাথে সেঁটে থাকে এবং পরিধানে আরাম অনুভূত হয়।
- মধ্যম ধরনের দৃঢ় প্রকৃতির কাপড়, যেমন— ডেনিম কাপড় শরীরের সাথে বেশি সেঁটে থাকে না এবং আরামদায়ক।

৩. দৃঢ় প্রকৃতির যেমন— ট্যাফেটা-জাতীয় কাপড়ে পরিধানকারীকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে ছুল দেখায়।
৪. ভারী জমিনের পশমি কাপড়ে আপাতদৃষ্টিতে দেহাকৃতি বড় দেখায়।
৫. ফ্লানেল, ডেনিম প্রভৃতি নিষ্ঠাভ জমিনের কাপড় বেশি আলো শোষণ করে, তাই এরূপ কাপড়ে ব্যক্তিকে ছেট দেখায়। বয়স্ক ও শুল মানুষের জন্য এরূপ বস্ত্র উপযোগী।
৬. চকচকে কাপড়ে আলোর প্রতিফলন হয় বলে পরিধানকারীকে বড় দেখায়। যেমন— সার্টিন, মারশেরাইজ করা সুতির বস্ত্র ইত্যাদি। যেসব কাপড়ে ধাতব তন্তুর কাজ থাকে সেগুলোর জমিনও চকচকে হয়। লম্বা, কৃষ ও অল্প বয়সীদের জন্য এমন জমিন মানানসই।

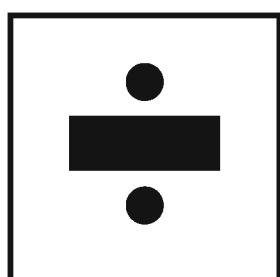
অতএব ঝাতু, দেহের আকৃতি ও বয়স ভেদে বস্ত্রের জমিন নির্বাচন করতে হয়।

কাজ – পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কার জন্য কী ধরনের জমিনের বস্ত্র প্রয়োজন এবং কেন প্রয়োজন – উল্লেখ কর।

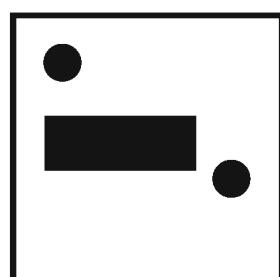
পাঠ-৪-৫ : পোশাকে শিল্পনীতি

পোশাকে ডিজাইন সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন শিল্প উপাদানগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করতে শিল্পের মৌলিক নীতিমালার জ্ঞান আবশ্যিক। কাজেই শিল্প উপাদানগুলো সুসংগঠিত উপায়ে ব্যবহার করার জন্য যে নীতিমালাগুলো আমাদের দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে তাদের শিল্পনীতি বলে। সুন্দর ও আকর্ষণীয় ডিজাইন সৃষ্টিতে শিল্পের তারসাম্য, অনুপাত, প্রাধান্য, ছব্দ ও মিল এ নীতিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ডিজাইনের নীতিমালার জ্ঞান জীবনের সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োগ করতে হয়। পোশাকের নকশা নির্বাচন, পোশাক তৈরি, আনুষঙ্গিক উপকরণ নির্বাচন ইত্যাদি শিল্পনীতি ছাড়া কল্পনা করা যায় না।

পোশাকে ভারসাম্য— কেন্দ্র স্থির রেখে যখন দুই দিকের সম দূরত্বে সম ওজনের বস্তুসামগ্ৰী রাখা হয় তখন তাকে ভারসাম্য বলে। অর্থাৎ ভারসাম্যে দুই দিকের ওজন ও শক্তি একই থাকে। এ ক্ষেত্ৰে বিভিন্ন উপাদান এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যাতে কোনো একটি অংশ অন্য অংশের চেয়ে অধিক ভারী বা ক্ষমতাসম্পন্ন না হয়। পোশাকে তিন ধরনের ভারসাম্য দেখা যায়। প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ ও রশ্মিগত ভারসাম্য। নিম্নে দুই ধরনের ভারসাম্য দেখানো হলো—



প্রত্যক্ষ ভারসাম্য



অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্য

১. **প্রত্যক্ষ ভারসাম্য (Formal balance)** - সম্বালপ্তি বা আড়াআড়িভাবে কোনো ডিজাইনের উভয় দিক এ ক্ষেত্রে একই রকম দেখায়। এরূপ ভারসাম্য সবচেয়ে বেশি স্থির ও মর্যাদাসম্পন্ন মনে হয়। কিন্তু বারবার এ ধরনের ডিজাইনের পুনরাবৃত্তি করলে একযোগে লাগতে পারে। পোশাকের দুই দিকে একই উচ্চতায় একই ডিজাইনের দুইটি পকেট কিংবা একই ধরনের প্রিট দিয়ে পোশাকের প্রত্যক্ষ ভারসাম্য সৃষ্টি করা যায়।

২. **অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্য (Informal balance)** - এ ক্ষেত্রে উভয় দিকে সম্বওজনের বস্তু থাকলেও কেন্দ্র থেকে সম দূরত্বে বা একই উচ্চতায় অবস্থান করে না। এ ধরনের বিন্যাস খুবই চিন্তাকর্ত্তৃক (interesting), তবে এক্ষেত্রে অধিক দক্ষতা ও চিন্তা প্রয়োজন। এরূপ বিন্যাসে—

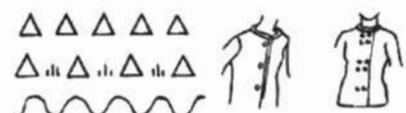
- এক দিকে বড় জিনিস একটি ও অন্য দিকে ছোট জিনিস কয়েকটি রাখা যেতে পারে
- অধিক আকর্ষণীয় বস্তুটি কেন্দ্র থেকে কাছে রেখে কম আকর্ষণীয় বস্তুগুলো দূরে রাখা যেতে পারে
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে দূরত্ব কমানোর জন্য উজ্জ্বল রং ব্যবহার করা যেতে পারে।

পোশাকে অনুপাত - পোশাকের একটি অংশের সাথে অন্য অংশের এবং প্রতিটি অংশের সাথে সম্পূর্ণ জিনিসটির সম্পর্কই অনুপাত। অনেক ব্যক্তি আছে যারা অনুপাত বোধ নিয়েই জন্য প্রহণ করে, তবে এ বিষয়ে সহজেই শিক্ষা লাভ করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ করে পোশাকের ক্ষেত্রে এটি একটি অংকের ব্যাপার। বিষয়টি যাচাই করার জন্য প্রয়োজন— গজ ফিতা, সেকল ইত্যাদি। দেখা গেছে বোতামের আকার ও রং বাছাই, দুটি বোতামের মধ্যবর্তী দূরত্ব, লেসের চপড়া বাছাই এবং এদের মাধ্যমে কয়েকটি সারি করতে হলে সারিগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনুপাত মেনে চলা আবশ্যিক।

কাজ – একটি পোশাকে কীভাবে ভারসাম্য আনা যায় তা বর্ণনা কর।

পোশাকে ছন্দ— রং, রেখা, কিন্দু, আকার, জমিন ইত্যাদি শিল্প উপাদানগুলো পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করে ছন্দ সৃষ্টি করা যেতে পারে। পোশাকের ডিজাইনে ছন্দ রক্ষা করলে চোখ একটি রেখা বা রং থেকে আর একটি রেখা বা রঞ্জের দিকে আকৃষ্ট হয়। পোশাকে চারটি পদ্ধতিতে ছন্দ আনা যায়। যথ—

১) **পুনরাবৃত্তি (Repetition)** - রেখা, রং বা আনুষঙ্গিক উপকরণ বারবার ব্যবহার করে কিংবা সেলাই, বোতাম, সূচিকর্ম, লেস ইত্যাদির সমান্তরাল লাইন সৃষ্টি করে ছন্দ আনা যায়। দেখা গেছে, তিন বা ততোধিকবার রেখা বা আকার ব্যবহার করলে তা একটি নকশায় পরিণত হয়।



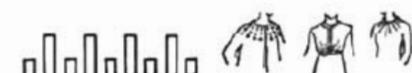
পুনরাবৃত্তি

২) **বিক্রিণ (Radiation)** - একটি কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন দিকে রেখা ব্যবহার করে ছন্দ সৃষ্টি করা যায়। পোশাকের গলার রেখা, স্কার্ট ও হাতায় ডার্ট, টাকস, পুঁতি, সিকুয়েল, সূচিকর্ম ইত্যাদির মাধ্যমে এ ধরনের ছন্দ আনা যায়।



বিক্রিণের মাধ্যমে ছন্দ

- ৩) ক্রমবিন্যাস (Gradation) - রঞ্জের সেড, রেখা বা আকৃতির ক্রম পরিবর্তন করে হৃদ সৃষ্টি করা যায়। রং বা রেখার এই পরিবর্তন প্রথম বরাবর না করে দৈর্ঘ্য বরাবর করলে চোখ বেশি আন্দোলিত হয়।



পোশাকে বিকিরণ ও ক্রমবিন্যাস

- ৪) নিরবচ্ছিন্নতা (Continuity) - পোশাকে সরল, ঢেউ খেলানো, জিপজ্যাগ ইত্যাদি চলমান রেখা ব্যবহার করে হৃদ আনা যায়। এ ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা ভাষ্টার জন্য আড়াআড়ি বা কোনাকুনি রেখা ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন- কুটি দেওয়া লম্বালম্বি রেখার পোশাকে আড়াআড়ি রেখার পকেটের ব্যবহার।



রেখার মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নতা

পোশাকে আধান্য - পোশাকের যে অংশে দৃষ্টি আকৃত হয় তাই হচ্ছে আধান্যের কেন্দ্রবিন্দু। পোশাকে আধান্য সৃষ্টির জন্য পাচ বা বিশেষীভূত রঞ্জের বেল্ট, বোতাম, লেস ইত্যাদি বাছাই করা যেতে পারে।



পোশাকে আধান্য

পোশাকে মিল - একটি পোশাকের বিভিন্ন অংশ ও ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত মিল। রং, রেখা, আকার, জমিন ইত্যাদি উপাদানগুলোর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে পোশাকে মিল বজায় রাখা যায়। মিল বজায় রাখার জন্য -



পোশাকে মিল

- একই রকম আকৃতি বা রেখা ব্যবহার করা যায়।
যেমন- বর্গাকার বা স্কোয়ার পলার সাথে বর্গাকৃতি পকেট সংযোজন করা যেতে পারে
- সালোয়ার, কামিজ ও শুভ্রার রঞ্জের সাথে মিল থাকতে হবে।
- ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও উপলক্ষের সাথে সঙ্গতি রেখে ডিজাইন নির্বাচন করতে হবে।
- পোশাকের জমিনের সাথে আনুষঙ্গিক উপকরণের (Accessories) মিল থাকতে হবে।

তবে অতিরিক্ত মিল আবার অনেক সময় একদেয়ে ভাব আনয়ন করে। কাজেই যুক্তিসংজ্ঞাতভাবে বৈচিত্র্য আনয়ন করতে হবে।

কাজ - স্কুলের ক্লাশ পার্টিতে তোমার পোশাক নির্বাচনের সময় কীভাবে মিল রক্ষা করবে বর্ণনা দাও।

পোশাকে শিল্পনীতির যথাযথ ব্যবহার করতে পারলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যেমন সুন্দর হবে তেমনি তার আত্মবিশ্বাসও বৃদ্ধি পাবে। তাই পোশাকে শিল্পনীতির প্রয়োগ সম্পর্কিত জ্ঞান সবারই অঞ্চলিক থাকা প্রয়োজন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বক্ত রেখা দ্বারা কী বোঝানো হয়?

- | | |
|-------------|------------|
| ক) নমনীয়তা | খ) সততা |
| গ) সাহস | ঘ) বিশ্রাম |

২। সার্টিন কাপড়ের জামা পরিধানে তারী গঠনের ছেলে-মেয়েকে কেমন দেখাবে?

- | | |
|----------|----------|
| ক) লম্বা | খ) ছুল |
| গ) কৃষ | ঘ) পাতলা |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

লিটনের সাদা রঙের পাঞ্জাবিতে কালো রঙের সুতার কাজ রয়েছে। এতে তার পাঞ্জাবিটি বেশ সুন্দর দেখায়।

৩। লিটনের পাঞ্জাবিতে শিল্পের কোন নীতির প্রয়োগ ঘটিয়েছে?

- | | |
|-------------|--------------|
| ক) ভারসাম্য | খ) প্রাধান্য |
| গ) অনুপাত | ঘ) ছন্দ |

৪। লিটনের পাঞ্জাবিতে-

- দৃষ্টিশক্তি আন্দোলিত হয়।
- পোষাকটি বেশি আকর্ষণীয় হয়।
- রঙের বৈচিত্র্য বিবেচনা করা হয়েছে।

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

- ১। গোলগাল চেহারার অপেক্ষাকৃত কম লম্বা মেয়ে বন্যা একদিন পোশাক কিনতে মার্কেটে যায়। সমান্তরাল
রেখার নকশাযুক্ত জামা ও উচু কলার দেওয়া গলার বড় ছাপাযুক্ত জামা দুটি তার খুব পছন্দ হয়। কিন্তু
সব কিছু চিন্তা করে সে ওই দুটি জামা না কিনে ইউ আকৃতির গলাযুক্ত খাড়া রেখার নকশাসমূহ অন্য
একটি জামা তার নিজের জন্য কিনে আনে।
- ক. যে কোনো শিল্পের ভিত্তি কোনটি?
- খ. পোশাকের ভারসাম্য বলতে কী বোঝায়?
- গ. বন্যার সমান্তরাল রেখার নকশাযুক্ত জামাটি না কেনার কারণ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. তুমি কি মনে কর বন্যার পোশাক নির্বাচন সঠিক হয়েছে? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।
- ২। সাবা ও সানা দুই বোন। উভয়েরই গায়ের রং ফর্সা হলোও দেহের গঠন ও আকৃতিতে দুইজন একেবারেই
বিপরীত। একদিন বিয়ের অনুষ্ঠানে দুইজনেই নীল রঙের শাড়ি পরে যায়। অনুষ্ঠানের সবাই শুধু
কৃষকার সাবার প্রশংসা করে।
- ক. রং মূলত কত প্রকার?
- খ. পোশাকের রং নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় কেন? বুবিয়ে লেখ।
- গ. সাবার প্রশংসিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. সানার পরিধেয় পোশাক তার ব্যক্তিত্বের অন্তরায় হয়েছে— বিশ্লেষণ কর।

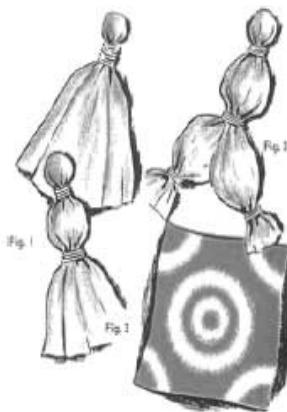
ବନ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ

ବନ୍ଦ ଛାପା ଓ ରଙ୍ଗରଣ

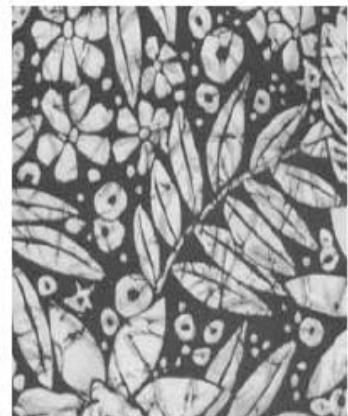
ବନ୍ଦଶିଳେ ଛାପା ଓ ରଙ୍ଗରଣ ଏକଟି ପୂରୁଷଗୁର୍ବ ବିଷୟ । କାରାନାର ସଥଳ ବନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ତଥନ ତାକେ ଯେ ଫେଣ୍ଡିକ ବଲେ । ମତିକାର ଅର୍ଥେ ଏବୁଗ ବନ୍ଦ ସରାସରି ବାଜାରେ ଖୁବ ଏକଟା ଛାଡ଼ା ହୁଏ ନା । ବନ୍ଦେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ମାଣିତ ଛାପା ଓ ରଙ୍ଗରଣର ପର ବାଜାରଜାତ କରା ହୁଏ । ଏତେ କରେ ବନ୍ଦେର ଆକର୍ଷଣ କମତା ଓ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ । କୁଟି ପ୍ରକାଶର ଅନ୍ୟ ବନ୍ଦେର ଟପର ମ୍ବାନ ବିଶେଷେ ବିଭିନ୍ନ ରଂ ଥତିଫଳିତ କରାର ପ୍ରମାଣିକେ ବନ୍ଦ ଛାପା ବଲେ । ଏ ପର୍ମାଣିତ କାଗଢ଼େର ଟପର ରଂ ବେଳେ ଏଇ ନକ୍ଶା ତୈରି କରେ ଅନ୍ୟତ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରେ ତୋଳା ହୁଏ । ବ୍ରକ, ବାଟିକ, ଚିକନ, ସେଟଲସିଲ, ଡ୍ରୋଲାର ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ମାଣିତ ବନ୍ଦେ ଛାପାର କାଜ କରା ଯେତେ ପାରେ । ଅନ୍ୟଦିକେ ରଙ୍ଗରଣର କେତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଢ଼ୁଟି ରଙ୍ଗେ ମ୍ରବଣେ ଦ୍ଵୀବିତ୍ରେ ସବ ଜୀବଶାୟ ସମାନଭାବେ ରଂ ଲାଗିଯେ ଦେଉରା ହୁଏ । ରଙ୍ଗରଣର ଥକ୍ରିଆଟି ବନ୍ଦ ତୈରିର ପୂର୍ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ତମ୍ଭୁ ବା ସୁତାର ମଧ୍ୟେ ଥାଯୋଗ କରା ଯେତେ ପାରେ । ଆବାର ଅନେକ ସମୟ ଟାଇ-ଡାଇ ପର୍ମାଣିତ କେତେ ସୁକୋଶଲେ କାଗଢ଼ୁଟି ବୈଶେ ରଙ୍ଗେ ମ୍ରବଣେ ଭୋବାଲେଓ ସୁନ୍ଦର ଏକଟି ନକ୍ଶା କାଗଢ଼େ କୁଟିଯେ ତୋଳା ପାଇ ।



ବ୍ରକ



ଟାଇ-ଡାଇ



ବାଟିକ

ପାଠ ୧ – ବନ୍ଦ ଛାପା

ବନ୍ଦଶିଳେ ପିଣ୍ଡିଙ୍ ବା ଛାପା ଏକଟି ପୂରୁଷଗୁର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ । ବନ୍ଦକେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାର ଏଟି ଅନ୍ୟତମ ପର୍ମା । ବନ୍ଦ ଛାପାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ମାଣିତ ରହେଛେ । ଏବୁଜନ ପିଣ୍ଡିଙ୍ ତାର ଥରୋଜନ, ସାର୍ଥ୍ୟ, ପରିବେଶ, ପରିବିହିତ ଅନୁସାରେ ଛାପାର ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ମାଣିତ ଯେହେ ନେଲ । ବନ୍ଦ ରଂ କରା ଓ ଛାପାର ମଧ୍ୟେ ମୂଳ ପାର୍ଦ୍ଦକ୍ୟ ହଞ୍ଚେ, ପ୍ରସମ୍ଭାବିତ ପର୍ମାଣିତ ବନ୍ଦଟିକେ ଧାରାବାହିକଭାବେ ଏବଇ ବର୍ଣ୍ଣ, ଏବଇ ଗାଢ଼େ ସମଭାବେ ରଞ୍ଜିତ କରେ ତୋଳା ହୁଏ । ଆର ଛାପା ପର୍ମାଣିତ ବନ୍ଦେର ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନେ ଏକ ବା ଏକଥିକ ବର୍ଣ୍ଣର ସମାବ୍ରାହ ଘାଟିଯେ ବନ୍ଦଟିକେ ନକ୍ଶାନୁଯାୟୀ କୁଟିଯେ ତୋଳା ହୁଏ ।

ଆବାର ରଂ କରାର କେତେ ଥରୋଜନୀୟ ଯାତ୍ରାର ରଂ ନିଯେ, ତାର ସାଥେ ଥାଇର ପରିମାଣେ ପାନି ବା ଅନ୍ୟ କୋନୋ ମ୍ରବଳ ଯୋଗ କରା ହୁଏ । ଏ କେତେ ତୁଳନାମୂଳକଭାବେ କମ ଘନଦେହ ମ୍ରବଣେ ଯୋଟାଯୁଟି ଅନେକ ସମୟ ଧରେ ବନ୍ଦକେ ନିଯମିତ ରାଖା ହୁଏ । ଅର୍ଥମ ଦିକେ ତାପମାତ୍ରା କମ ଧାକଣେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରା ହୁଏ, ଯାତେ ବନ୍ଦେର ସବ ଜୀବଶାୟ ସମାନଭାବେ ରଂ ଲାଗେ । କିମ୍ବୁ ଛାପାର ଲୋମ ବେଶ ସନଦ୍ରେର ରଙ୍ଗେ ପେଟ ବ୍ୟବହାର କରା ହୁଏ । ଏଇ ପେଟ ଫର୍ମ-୨୧, ଗାର୍ହିନ୍ଦ୍ର ବିଜାନ-୯୮ ପ୍ରେସି

বস্ত্রের উপরিভাগে শুধুমাত্র নকশাযুক্ত স্থানে প্রয়োগ করা হয়। এরপর দ্রুত শুকিয়ে তাপ বা বাষ্প ব্যবহার করে সেই রংকে বস্ত্রের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট জায়গায় অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বাকি রং খুঁয়ে বের করে ফেলা হয়।

বস্ত্রছাপা ও রংকরণের প্রণালি ভিন্ন হওয়ার কারণে ছাপার কাজে যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় রংকরণের ক্ষেত্রে সেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় না। তবে বস্ত্র ছাপা ও রংকরণ উভয় ক্ষেত্রেই প্রক্রিয়া শুরুর আগে বস্ত্রের মাড় দূর করে, খুঁয়ে, ইস্ত্রি করে নিতে হয়।

কাজ - বস্ত্র রংকরণ ও ছাপার পার্শ্বক্য উল্লেখ কর।

প্রকৃতপক্ষে বস্ত্র ছাপা ও রংকরণ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত মূল উপকরণ হচ্ছে রং। আর রঙের সাহায্যে বস্ত্রকে আকর্ষণীয় করার ক্ষেত্রে ব্লক ছাপা, টাইডাই ছাপ ও বাটিক ছাপা উল্লেখযোগ্য।

পাঠ-২-৩ : ব্লক ছাপা

সত্যিকার অর্থে বস্ত্র ছাপার ইতিহাসে সর্বপ্রথম যে কৌশল বা উপকরণ অবলম্বন করা হয়েছিল তা হচ্ছে ব্লক। অন্যান্য প্রিণ্টিং পদ্ধতির পাশাপাশি ব্লক প্রিণ্টিং-এর মাধ্যমে আমরা এখনো পরিধানের কাপড়, বিছানার চাদর, টেবিল ক্লথ ইত্যাদি প্রিণ্ট করে থাকি এবং আমাদের কুটুরশিল্পে এর জনপ্রিয়তাও অনেক বেশি।

ব্লক তৈরি- ব্লক প্রিণ্টে ব্যবহৃত কাঠের ব্লকগুলো ২-৪ ইঞ্চি বা ৫.০৮-১০.১৬ সে.মি. পুরু হওয়া উচিত। নতুন বা রো টেকসই হবে না। ব্লকের আকৃতি যদিও ডিজাইনের উপর নির্ভর করবে, তবে লম্বায় ১২-১৬ ইঞ্চি বা ৩০.৪৮-৪০.৬৪ সে.মি. বেশি না হওয়াই ভালো। ব্লক তৈরির জন্য কাঠ নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাবলা, গাব, লিনোলিয়াম (শিরীষ) ইত্যাদিকে গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে। আলু, টেঁড়শ ইত্যাদিও ব্লক প্রিণ্টে তাঁকণিক কাজের জন্য ব্যবহার করা যায়।

ডিজাইনের যে অংশ কাপড়ের উপর ফুটিয়ে তুলতে হবে, সে অংশ ব্লকের উপরে উচ্চ করে রেখে বাকি অংশ গভীরভাবে কেটে তুলে ফেলতে হবে। এর ফলে কালার ট্রেতে যখন ব্লক দুবিয়ে কাপড়ে ছাপ দেওয়া হবে, তখন কেবল ডিজাইন যুক্ত অংশেরই রং কাপড়ে ফুটে উঠবে। একই কাপড়ের উপর একাধিক রঙের ডিজাইন ছাপানো যায়। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক রঙের জন্য নির্দিষ্ট ব্লকের কাজ শেষ করার পর তিতীয় ব্লকের কাজ শুরু করতে হবে।

প্রিণ্টিং টেবিল ও কালার ট্রে প্রস্তুত - ব্লক প্রিণ্ট এর জন্য পাথর, সিমেন্ট, শোহা, ষিল কিংবা ভালো কাঠের তৈরি মজবুত টেবিল হলে সুবিধা হয়। টেবিলের উপর কয়েক প্রথম কম্বল বিছিয়ে তার উপর কোরা কাপড় এমনভাবে পিন দিয়ে আটকিয়ে দিতে হয় যাতে প্রিণ্টিংয়ের সময় কাপড় টানটান করে ছড়িয়ে থাকে বা কোনো ঝাঁজ সৃষ্টি না হয়। ছাপার রঙের জন্য একটি কালার ট্রে-এর নিচে রাবার ক্লথ দিয়ে আটকিয়ে তার উপর মাপমতো ৩-৪ সে.মি. পুরু ফোমের টুকরা বিছিয়ে দিতে হয়। এবার ফোমের উপর এক টুকরা পশমি কাপড় বা চট বিছিয়ে তার উপর রং প্রয়োগ করে ব্রাশের সাহায্যে রং ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ছাপা কাজের সময় ব্লকটি পশমি কাপড় বা চটে ২/৩ বার লাগিয়ে প্রকৃত কাপড়ে ছাপ দেওয়া হয়। কাজের শেষে ব্লক খুঁয়ে রাখতে হয়।



ব্লক তৈরি



তৈরিকৃত ব্লক



কালার ট্রে

জু প্রস্তুত (পুস্তিগ্রন্থ) – বুক প্রিচ্চিনের অন্য বিভিন্ন ধরনের প্রস্তুত জু বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, যা বুকে তালোতাবে শালিয়ে কাপড়ের উপর ছাপ দিলেই ছাপা হয়ে যায়। তবে রাজের প্রস্তুত প্রণালি জানা থাকলে নিজের পছন্দমতো জু তৈরি করে কাপড়ে ছাপ দেওয়া যায়। এখানে পুস্তিগ্রন্থ পেস্ট তৈরি ও ছাপা পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো।

পেস্টের উপকরণ ও পদ্ধতি বিবরণ

পুস্তিগ্রন্থ রং	৬%
কুটো পরম পানি	২০%
ইউরিয়া সার	৩%
খৰার সোডা	৩%
কাপড় কচার সোডা	৩%
গুলামো পানি	৬২%
অধিস্ট সংট	১%
গ্রিসারিন	২%



কাপড়ে পিট করা

পেস্ট তৈরি – পেস্ট তৈরির ২৪ ঘণ্টা আগেই আধা পিটার পানিতে ১ ডেস্কা কাইন পান্থ মিলিয়ে রাখতে হয়। এরপর পরিষ্কার পান্থে হালকা পরম পানিতে ২৫ গুণে ইউরিয়া সার, খৰার সোডা, কাপড় কচার সোডা, অধিস্ট সংট রাজের সাথে মিলিয়ে তৈরিত্ব কামের সাথে একজ্য করে মেশাতে হবে (বর্ণাকালে ইউরিয়া সার ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই)।

পিটিং পদ্ধতি – পেস্ট তৈরি হয়ে পেলে হাবলির সাহায্যে হেঁকে গ্রিসারিন মিলিয়ে কাপড়ে পিট করতে হবে। এই পেস্ট পিরে সঙ্গে সঙ্গে কমজ করাই উচিত। কেবলো ৪ ঘণ্টা পর এর শুণ্ঠিত মান সংট হয়ে যায়। পিট করা হয়ে পেলে হাজার এবং কিছুদিন আগে শুকাতে হবে। পুস্তিগ্রন্থ রংকে বুক পিট করার পর স্টিম ও খোলাই করতে হবে। স্টিমিং-এর অন্য একটি হাতিতে পানি ঝুটাতে হবে। এবার চট পিরে কাপড়টি ঢেকে হাতিতে উপর একটি চালসি বলিয়ে, তার উপর কাপড়টি রেখে চালসি পিরে ঢেকে স্টিমিং করা যেতে পারে।

কজ – প্রশিককে একটি টেবিল করে বুক ছাপা করে দেখাও।

অনুশীলনী

বন্দুশির্ষাচনি প্রশ্ন

১। বন্দু ছাপার ইতিহাসে প্রথম ব্যবহৃত কৌশল কোনটি?

- (a) সিল
- (b) স্টেমিল
- (c) বুক
- (d) রোশায়

২। ব্লক ছাপায় কী কী উপকরণ দরকার?

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| ক) ব্রাশ, পেন্সিল | খ) রং, সুচি ও সুতা |
| গ) রং, প্রিন্টিং টেবিল | ঘ) কালার ট্রে ও আর্ট পেপার |

নিচের উদ্দীপকটি গড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সুমনা তার দুদের জামাটিতে ব্লক ছাপা করবে বলে ১" পুরু বাবলা কাঠ বাছাই করল। এবং নিম্নের রঙের মিশ্রণ তৈরি করল। এরপর ইচ্ছামতো নকশা করার জন্য কাজ শুরু করল। কিন্তু ছাপার মান আশানুরূপ হলো না।

প্রুসিয়ান রং	:	৬%
ফুটন্ট গরম পানি	:	১০%
গলানো গাম	:	৬২%
খাবার সোড়া	:	৩%

৩। মিশ্রণটির ত্রুটি কোথায়?

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| ক) প্রুসিয়ান রঙের পরিমাণে | খ) ফুটন্ট গরম পানির পরিমাণে |
| গ) গলানো গামের পরিমাণে | ঘ) খাবার সোডার পরিমাণে |

৪। ছাপার মান আশানুরূপ না হওয়ার কারণ কী?

- i. রঙের মিশ্রণে ত্রুটি থাকা
- ii. কাঠ নির্বাচনে ত্রুটি থাকা
- iii. ব্লক তৈরিতে ত্রুটি থাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। তরু কতোগুলো কাপড়ে প্রুসিয়ান রঙের ব্লক প্রিন্ট করেই সাথে সাথে কাপড়গুলো বিক্রির জন্য তারা দোকানে নিয়ে আসে। কিন্তু কাপড়গুলো অবিক্রীত অবস্থায় পড়ে থাকে।

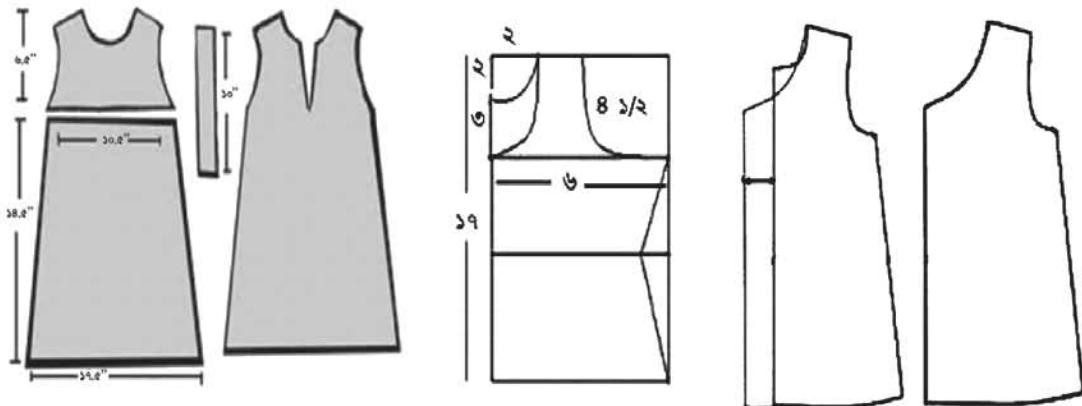
- ক. কারখানায় প্রস্তুতকৃত বস্ত্রকে কী বলে?
- খ. বস্ত্র রং করা ও ছাপার মধ্যে পার্থক্য কী?
- গ. তরুর কাপড়গুলো অবিক্রীত অবস্থায় পড়ে থাকার কারণ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ব্যবসায় সাফল্যের জন্য তরুকে আরও সচেতন হতে হবে— স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

সম্পত্তিশ অধ্যায়

ড্রাফটিং

কোনো পোশাক তৈরি করতে গেলে প্রথমে সমতল কাগজে পোশাকের একটি নমুনা আঁকা হয়। একে মূল নকশা বা মূল ড্রাফট বলে। এরপর মূল নকশাকে ভিত্তি করে দেহের মাপ অনুযায়ী সমতল কাগজে যে চূড়ান্ত নকশা আঁকা হয় তাকেই বলে প্যাটার্ন ড্রাফটিং। সকলভাবে প্যাটার্ন ড্রাফটিং তৈরিতে আরাম ও সেলাইয়ের জন্য মূল মাপের সাথে বাড়তি কিছু মাপ যোগ দিতে হয়।

ড্রাফটিং করার অনেক সুবিধা রয়েছে। যেমন – প্রয়োজনে পোশাকের ডিজাইন সহজেই পরিবর্তন করা যায়, একই সাইজের অনেক পোশাক একসাথে ছাঁটা যায়, কাপড়ের অপচয় লোধ করা যায়, পোশাক ছাঁটতে সময় কম লাগে, কাপড়ের বাড়তি ছাঁট বা টুকরা দিয়ে ছোটদের পোশাক ছাড়াও ঘরের প্রয়োজনীয় নানা রকম সামগ্রী – ন্যাপকিন, ঝুমল, টি কোজি, টেবিল ম্যাট ইত্যাদি তৈরি করা যায় এবং মূল ড্রাফটিংয়ের উপর ভিত্তি করে নানা ধরনের বৈচিত্র্যময় নকশার পোশাক সহজে তৈরি করা যায়।



পাঠ ১-৩ শিশুদের পোশাক – ফতুয়ার ড্রাফটিং

যোরোয়া বা বাইরের পোশাক খুপে ফতুয়া প্রীত্যকালের জন্য বেশ আরামদায়ক। একটি ৩ বছরের শিশুর ফতুয়া তৈরির জন্য প্রথমেই মূল নকশার পরিকল্পনা করে কাগজে ড্রাফটিং করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ড্রাফটিংয়ের জন্য যেসব জিনিস সঞ্চাহ করতে হবে সেগুলো হচ্ছে— বাদামি কাগজ, পেনসিল, স্কেল, শেপকাট, রাবার, গজফিতা, পিন ইত্যাদি। ফতুয়া তৈরিতে ৩ বছরের শিশুর উপরোক্তি শরীরের বিভিন্ন অংশের মূল মাপগুলো এবং ড্রাফটিং তৈরির পদ্ধতি নিচে তুলে ধরা হলো।

প্রয়োজনীয় মাপ

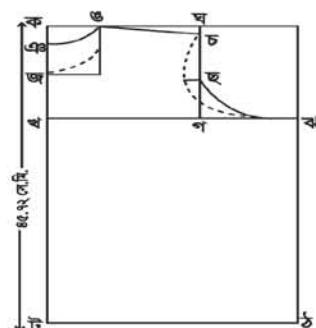
বুল- ১৭ ইঞ্চি বা ৪৩.১৮ সেন্টিমিটার

বুক- ২২ ইঞ্চি বা ৫৫.৮৮ সে.মি.

কাথ- ৯ ইঞ্চি বা ২২.৮৬ সেন্টিমিটার

হাতার লম্বা- ৩.৫ ইঞ্চি বা ৮.৮৯ সেন্টিমিটার

এবং কাফ বা মুড়ুরী- ৪ ইঞ্চি বা ১০.১৬ সেন্টিমিটার।



ফতুয়ার সামনের ও পেছনের অংশের ড্রাফটিং

ফতুয়ার পেছন ও সামনের অংশের ড্রাফটিং একই সাথে করা হয়। প্রথমে কাঁধের মাপের অর্ধেক বা পুর্টের মাপের সাথে ১.২৭ সে.মি. যোগ করে ক ঘ ($11.83 + 1.27 = 12.7$ সে.মি.) রেখা টানতে হবে। অতঃপর বুকের $1/4$ অংশের মাপ (১৩.৯৭ সে.মি.) নিয়ে ক খ রেখা টানতে হবে। খ বিন্দু হতে বুকের $1/4$ অংশ + ৫.০৮ সে.মি. টিলা + ১.২৭ সে.মি. সেলাই = ২০.৩২ সে.মি. দূরে বা বিন্দু নির্ধারণ করে খ বা যোগ করতে হবে। খ বা রেখার উপর ক খ গ ঘ আয়তক্ষেত্র তৈরি হবে।

গলার চওড়া নির্ধারণের জন্য ক বিন্দু থেকে বুকের $1/12$ অংশ = ৪.৫৭ সে.মি. দূরে গ বিন্দু শনাক্ত করতে হবে। পেছনের গলার গভীরতার জন্য ক বিন্দু হতে ২.৫৪ সে.মি. নিচে এবং বিন্দু শনাক্ত করে গ এবং গোল করে যোগ করতে হবে। এখন সামনের গলার শেইপ তৈরি করার জন্য ক বিন্দু হতে বুকের $1/8$ অংশ = ৬.৯৮ সে.মি. নিচে জ বিন্দু শনাক্ত করে গ থেকে জ গোল করে যোগ করতে হবে। গলার শেইপ পছন্দমতো আরও গভীর করা যেতে পারে। অতঃপর ঘ বিন্দু থেকে ১.২৭ সে.মি. নিচে চ বিন্দু শনাক্ত করে গ চ যোগ করতে হবে। বগলের শেপের জন্য গ চ রেখার মধ্যবিন্দু ছ শনাক্ত করে ছ বা বিন্দু বাঁকা ভাবে যোগ করলে পেছনের বগলের শেইপ তৈরি হবে। সামনের বগল পেছনের বগল হতে ১.২৭ সে.মি. বেশি গভীর হবে।

সম্পূর্ণ বুলের সাথে নিচে হেমের জন্য ১.২৭ সে.মি. এবং সেলাইয়ের জন্য ১.২৭ সে.মি. যোগ দিতে হবে। এখন ক খ রেখাকে ক বিন্দু হতে ৪৫.৭২ সে.মি. নিচ পর্যন্ত বাড়িয়ে ক ট রেখা আঁকতে হবে। অতঃপর বা খ ট ঠ আয়তক্ষেত্র অংকন করতে হবে।

হাতার ড্রাফটিং- ক-ঘ = হাতার লম্বা- ৮.৮৯ সে.মি.+

মুড়ি- ২.৫৪ সে.মি.+ সেলাই ১.২৭ সে.মি. = ১২.৭ সে.মি.

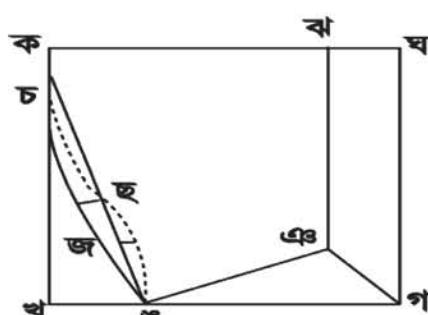
ক-খ = হাতার চওড়া = বুকের $1/8$ = ১৩.৯৭ সে.মি.

খ-গ = বুকের $1/12+1.27$ সে.মি.= ৫.৮৪ সে.মি.

বা-ঘ = মুড়ি ২.৫৪ সে.মি.

বা-এও = কাফ $1/2 + 1.27$ সে.মি.= ১১.৮৩ সে.মি.

ক-চ = ১.২৭ সে.মি.



এবার চ ও খ বিস্তু কোনাকেনিভাবে বেগ করতে হবে। এই জ্বালা মধ্যবিস্তু হ। ই বিস্তু ১.২৭ সে.মি. বাইজে একটি বিস্তু সিরে খ থেকে চ পর্যন্ত শেইপ করতে হবে। হাতার সামনের অংশের শেইপ করার জন্য এবার ছ ও ষ—এর মধ্যবিস্তু ছ নিয়ে, ছ এর ০.৬৫ই সে.মি. তেওরে একটি বিস্তু খনাস্তু করে ছ ছ এর সাথে চিত্রের ঘড়ো শেইপ করতে হবে।

কাজ – একটি ফস্টুয়ার সামনের অংশ, পেছনের অংশ ও হাতার জ্ঞানটিৎ প্রস্তুত কর।

ফস্টুয়া প্রস্তুত – জ্ঞানটিৎ অনুসারে ফস্টুয়া প্রস্তুত করতে হলে প্রথমে পরিকল্পনা অনুসারে কাগড়ের পরিমাণ নির্ধারণ করে, নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী ইটে সেলাই করতে হবে। একটি ও বছরের শিশুর ফস্টুয়া তৈরির জন্য ১ গজ কাগড় এবং সেলাইজের জন্য সূতা, সুচ, বোতাম, কাঁচি, সেলাই মেশিন ইত্যাদি হাতের কাছে রাখতে হবে।

কাগড় ঝাঁটা – কাগড়কে সঠিক পদ্ধতিতে তৈরি করে তার উপর ফ্লাফটিংের কাগড় রেখে শিল দিয়ে আঁচিকিরে নিতে হবে। এরপর নকশা অনুযায়ী কাগড় ঝাঁটতে হবে। ঝাঁটজ পর পেছনের অংশ আলাদা করে, সামনের অংশের বক্সের শেইপ ও গলা ছেট গলার মধ্যবিস্তু থেকে ৭.৬২ সে.মি. নিচ পর্যন্ত ঝাঁটতে হবে।

গালের কাগড়কে গুলুম ঝাঁজ করে হাতার জ্ঞানটিৎ কেলে একসাথে ঝাঁটতে হবে। এবার হাতার জ্ঞানটিৎজের সামনের অংশের শেইপ করে, দুই হাতার সামনের অংশের কাগড় একসাথে করে, গুলুম ফ্লাফটিং কেলে সামনের অংশের হাতার শেইপ ঝাঁটতে হবে।

এবার টুকরা কাগড় দিয়ে গলার পাইপিং এবং বোতামের পটি তৈরি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের কাগড়ও ব্যবহার করা যায়।



পাইপিং তৈরির পদ্ধতি

সেলাই – প্রথমে সামনের ও পেছনের অংশ একত্র করে দুই দিকের কাঁধের সেলাই করতে হবে। এরপর বোতামের জন্য পটির ব্যবস্থা করে গলার পাইপিং শাগাতে হবে। তারপর সুইপাশ সেলাই করে, বুকের সামনে লুপ ও বোতাম শাগাতে হবে। সবশেষে অভিন্ন সূতা কেটে, ইন্সি করে ফস্টুয়া সেলাই শেষ করতে হবে।



তৈরিত ফস্টুয়া

কাজ – ফ্লাফটিং অনুসারে একটি ফস্টুয়া তৈরি কর।

পাঠ-৪-৫ : বেবি ফ্রকের ড্রাফটিং

বেবি ফ্রক হচ্ছে শিশুর উপযোগী পোশাক। এই পোশাক বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন— এ লাইন শেইপ ফ্রক, ইয়োক ফ্রক, টিউনিক ইত্যাদি। এখানে ৩ বছরের শিশুর উপযোগী এ লাইন শেইপ বেবি ফ্রকের ড্রাফটিং তৈরি করতে শরীরের যেসব অংশের মাপ নিতে হবে, সেসব অংশের মূল মাপ এবং ড্রাফটিংয়ের পদ্ধতি নিচে তুলে ধরা হলো—

প্রয়োজনীয় মাপ
বুল— ৪৫.৭২ সেন্টিমিটার
বুক— ৫৫.৮৮ সে.মি. এবং
পুট— ১১.৪৩ সেন্টিমিটার।

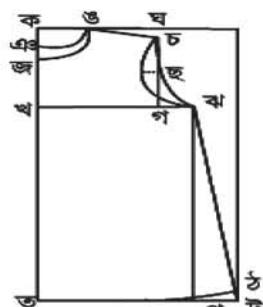
ড্রাফটিংয়ের জন্য বাদামি কাগজ, পেনসিল, স্কেল, শেইপকাট, রাবার, গজ, পিন ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হবে। এ ধরনের বেবি ফ্রকের পেছন ও সামনের অংশের ড্রাফটিং একই সাথে করা হয়।

প্রথমে পুটের মাপের সাথে ১.২৭ সে.মি. যোগ করে ক খ রেখা টানতে হবে। অতঃপর বুকের ১/৪ অংশের সাথে ২.৫৪ সে.মি. যোগ করে ক খ রেখা টানতে হবে। খ বিন্দু হতে বুকের ১/৪ অংশের সাথে টিলা এর জন্য ৬.৩৫ সে.মি. এবং সেলাইয়ের জন্য ১.২৭ সে.মি. যোগ করে ২১.৫৯ সে.মি. (১৩.৯৭ সে.মি. + ৬.৩৫ সে.মি. + ১.২৭ সে.মি.) দূরে বা বিন্দু নির্ধারণ করতে হবে। এবার খ বা যোগ করে খ বা রেখার উপর ক খ গ ঘ আয়তক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। এরপর সম্পূর্ণ বুলের সাথে নিচে হেমের জন্য ১.২৭ সে.মি. এবং সেলাইয়ের জন্য ১.২৭ সে.মি. যোগ দিয়ে (৪৫.৭২+ ১.২৭+১.২৭) ক খ রেখাকে ক বিন্দু হতে ৪৮.২৬ সে.মি. নিচ পর্যন্ত বাড়িয়ে ক ত রেখা আঁকতে হবে। এবার বা খ ত থ আয়তক্ষেত্র অংকন করতে হবে। ঘেরের জন্য খ বিন্দু থেকে প্রায় ৪ সে.মি. দূরে ট বিন্দু দিয়ে বা ট যোগ করে শেইপকাট দিয়ে সুন্দরভাবে চিত্রের ন্যায় ঘ ঠ রেখা বরাবর শেইপ করতে হবে। গলার চওড়া নির্ধারণের জন্য ক বিন্দু থেকে বুকের ১/১২ অংশ = ৪.৬ সে.মি. দূরে ও বিন্দু শনাক্ত করতে হবে। পেছনের গলার গভীরতার জন্য ক বিন্দু হতে ১.২৭ সে.মি. নিচে ও বিন্দু শনাক্ত করে ও ওল করে যোগ করতে হবে। এখন সামনের গলার শেইপ তৈরি করার জন্য ক বিন্দু হতে বুকের ১/৮ অংশ নিচে ও বিন্দু শনাক্ত করে ও থেকে ওল করে যোগ করতে হবে। গলার শেইপ পছন্দমতো আরো গভীর করা যেতে পারে। এরপর ঘ বিন্দু থেকে ১.২৭ সে.মি. নিচে চ বিন্দু শনাক্ত করে ও চ যোগ করতে হবে। বগলের শেপের জন্য গ চ রেখার মধ্যবিন্দু ছ শনাক্ত করে ছ বা বিন্দু বাঁকা ভাবে যোগ করলে পেছনের বগলের শেইপ তৈরি হবে। সামনের বগল পেছনের বগল হতে ১.২৭ সে.মি. বেশি গভীর হবে।

কাজ – ৩ বছরের একটি শিশুর শরীরের মাপ নিয়ে একটি এ লাইন শেইপ বেবি ফ্রকের ড্রাফটিং তৈরি কর।

কাগড় ছাঁটা ও সেলাই— উপরোক্ত ড্রাফটিং অনুসারে বেবি ফ্রক ছাঁটার জন্য ১১.৪৪ সে.মি. চওড়া ও ৫০.৮ সে.মি. লম্বা কাগড়কে ভাঁজ করে তার উপর ড্রাফটিংয়ের কাগজ রেখে পিন দিয়ে আটকিয়ে নিতে হবে। এরপর নকশা অনুযায়ী কাগড় ছাঁটতে হবে। পাশের টুকরা কাগড় দিয়ে গলা ও বগলের পাইপিং এবং বোতাম পট্টি তৈরি করতে হবে। এ ধরনের বেবি ফ্রকের পিঠ সম্পূর্ণ খোলা বা অর্ধেক খোলা থাকতে পারে।

সেলাইয়ের ক্ষেত্রে প্রথমে সামনের ও পেছনের অংশ একত্র করে দুই দিকের কাঁধের সেলাই করতে হবে। এরপর গলা ও বগলের পাইপিং লাগিয়ে বোতাম পট্টি সেলাই করতে হবে। অনেক সময় দুই কাঁধেও বোতামের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তারপর দুইপাশ সেলাই করে, বুল পরীক্ষা করে নিচের কাগড় ভাঁজ করে মুড়ে টাক



বেবি ফ্রকের ড্রাফটিং

সেলাই দিতে হবে। ফিটিং পরীক্ষা করে নিচে হেম সেলাই দিয়ে, প্রয়োজনীয় বোতাম লাগাতে হবে। সবশেষে অতিরিক্ত সূতা কেটে, ইস্ত্র করে ফ্রকের সেলাই শেষ করতে হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। গ্রীষ্মকালের জন্য আরামদায়ক পোশাক কোনটি?

- | | |
|-------------|-----------|
| ক) শার্ট | খ) ফতুয়া |
| গ) পাঞ্জাবি | ঘ) সাফারি |

২। ড্রাফটিং করলে সুবিধা হয় কেন?

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| ক) কাপড়টি সংকুচিত হয় না | খ) দেহের ফিটিং ভালো হয় |
| গ) সেলাই মজবুত হয় | ঘ) ডিজাইন ভালো করা যায় |

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জুলেখা তার বন্ধুর মেয়ের জন্মদিনে বেবিথ্রুক দিবে বলে মন স্থির করে। সে কাপড় কেটে সেলাই করে। সেলাইয়ের পর কাপড়টি ইস্ত্র করতে গেলে দেখে সেলাই উটেোপাল্টা হয়েছে।

৩। জুলেখা প্রথমেই কাপড়ে কোন অংশ সেলাই করলে কাপড়টি উটেোপাল্টা হতো না?

- | | |
|------------------------|---------------------------------------------|
| ক) গলায় পাইপিং লাগালে | খ) নিচের অংশ জোড়া দিলে |
| গ) নিচ সেলাই করলে | ঘ) ফ্রকের সামনের ও পেছনের অংশের কাঁধ একত্রে |

সেলাই করলে

৪। জুলেখার তৈরি ফ্রকটি সঠিকভাবে তৈরি করার জন্য করণীয় ছিল-

- ফ্রকের সামনের ও পেছনের অংশ একসাথে ছাঁটা
- সেলাইয়ের সঠিক ধাপ অনুসরণ করা
- কাপড় কেনার সময় কম কাপড় না কেনা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১। প্রশিক্ষণের পর রোজিনা প্রথম তার তিন বছরের শিশুর ফতুয়া তৈরি করার জন্য কাপড় কিনে। সে শিশুটির কাঁধের মাপের $\frac{1}{3}$ অংশ, বুকের মাপের $\frac{1}{2}$ অংশ মাপ নেয় এবং কাপড়টি কেটে ফেলে। পোশাকটি তৈরি করার পর শিশুটির গায়ে দিতে গেলে দেখে জামাটি তার গায়ে ঢুকছে না। সে জামাটি পরিবর্তন করতে চাইলে কোনোভাবেই তা করতে পারে না।

ক. কোন ধরনের কাগজে পোশাকের নমুনা আঁকা হয়?

খ. প্যাটার্ন ড্রাফটিং বলতে কী বোঝায়?

গ. রোজিনা শিশুর পোশাকটি উপযোগী করে কীভাবে তৈরি করতে পারত। ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর পোশাকটি তৈরিতে রোজিনার কোনো ত্রুটি ছিল? বিশ্লেষণ কর।

অষ্টদশ অধ্যায়

পোশাকের যত্ন ও পারিপাট্যতা

পোশাক ব্যক্তির সৌন্দর্যবোধ, ঝুঁটি এবং ব্যক্তিত্বের পরিচয় তুলে ধরে। নিজের পছন্দমতো পোশাক শুধু ক্রয় করলেই চলে না। বরং পোশাকের কর্মউপযোগী ও টেকসই রাখতে হলে পোশাকের যত্ন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ক্রমাগত পরিধানের ফলে নতুন পোশাকও পুরানো ও জীর্ণ হয়ে পড়ে। এমন পুরানো বা জীর্ণ বস্ত্র বা পোশাককে উপযুক্ত সংস্কারের সাহায্যে নতুনভাবে ব্যবহারোপযোগী করে তোলা যায়। অনেক সময় পোশাকে দাগ লেগে পোশাকটির সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়। এই ধরনের ক্ষতি কমানোর জন্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে পোশাকের দাগ উঠিয়ে ফেলা উচিত।

পোশাকের স্থায়িত্ব, সৌন্দর্য ও ব্যবহারোপযোগিতা বজায় রাখার জন্য যথাযথভাবে যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। সঠিক নিয়মে যত্ন নিলে কাপড়চোপড় অনেক দিন টেকে, সুন্দর অবস্থায় থাকে এবং অর্থের সাথ্রয় হয়। পরিষ্কার ও পরিপাটি পোশাক দেহ ও মনের সুস্থিতা বজায় রাখে।

পাঠ-১ : বস্ত্র ধোতকরণ

পোশাকের যত্নে সবচেয়ে অধিক প্রচলিত পদ্ধতিটি হলো বস্ত্র ধোতকরণ। বস্ত্র ধোতকরণের মূল উদ্দেশ্য হলো—

- কাপড়ের ময়লা দূর করে পরিষ্কার করা।
- পরিষ্কার কাপড়ে আনুষঙ্গিক দ্রব্য ব্যবহার করে স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনা।

নিম্নে বস্ত্র পরিষ্কারক এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্যের তালিকা দেওয়া হলো

পরিষ্কারক দ্রব্য	আনুষঙ্গিক দ্রব্য
সাবান : সাবান একটি সহজলভ্য উত্তম পরিষ্কারক উপকরণ। বাড়ির বেশির ভাগ কাপড়ই সাবান দিয়ে কাঢ়া হয়। বাজারে বিভিন্ন প্রকার সাবান পাওয়া যায়। সাবানে কস্টিক সোডার পরিমাণ বেশি থাকলে সেই সাবান বস্ত্র পরিষ্কার করার জন্য উপযোগী নয়। বস্ত্র পরিষ্কারক সাবানের কয়েকটা গুণ অবশ্যই থাকতে হবে। যেমন— সাবান দেখতে হল্দে বা গাঢ় রঙের হবে না; সাবান এমন শক্ত হবে যাতে আঙ্গুলের সাহায্যে চাপ দিলে গর্ত হবে না; সাবানের গা মস্ত হবে; সাবান পানির প্রসারণ ক্ষমতা ও ডিজানোর ক্ষমতা বাঢ়ায়; সাবান কাপড়ের ময়লাকে বের করে ধরে রাখে; পানি দিয়ে ধুলে ময়লাসহ সাবান ধুয়ে যায় এবং কাপড় পরিষ্কার হয়ে উঠে।	বোরাঙ্গ : বোরাঙ্গ নামের এই পরিষ্কারক দ্রব্যটি আমাদের দেশে সহজলভ্য নয়। বর্তমানে সোডিয়াম, কার্বন, বরিক এসিড হতেও কিছু কিছু পরিমাণ বোরাঙ্গ তৈরি করা হচ্ছে। বোরাঙ্গ জলীয় দ্রবণ ক্ষারীয় তাই কাপড়ে কাঠিন্য এবং উজ্জ্বল্য সৃষ্টি করতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই দ্রব্যটি অনেক সময় কাপড়ের দাগ তুলতেও ব্যবহার করা হয়।

<p>কাপড় কাচা সোডা : কাপড় কাচার সোডাকে সোডিয়াম কার্বনেট বলে। বেশি ময়লা তৈলাক্ত কাপড় সোডা দিয়ে সহজে পরিষ্কার করা যায়। বেশি ময়লা এবং তৈলাক্ত সুতি ও লিনেন কাপড় সিদ্ধ করা, জীবাণু মুক্ত করা ও দুর্বস্থামুক্ত করার জন্য সোডা ব্যবহার করা হয়। তবে সবরকম কাপড়ে সোডা ব্যবহার করা ঠিক নয়। সোডার অতিরিক্ত বারের প্রভাবে রেশমি ও পশমি কাপড় নষ্ট হয়ে যায়।</p>	<p>ফ্টার্চ : চাল, আঙু, ভুট্টা ইত্যাদি থেকে ফ্টার্চ প্রস্তুত করা হয়। ফ্টার্চ ব্যবহারে কাপড়ের স্বাভাবিক কাঠিন্য এবং ধ্বনিতে ভাব ফিরে আসে। ফ্টার্চ ব্যবহারের ফলে কাপড় সহজে ময়লা হয় না।</p>
<p>গুড়া সাবান : বর্তমানে আমাদের দেশে গুড়া সাবানের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। পাত্রে পরিমাণমতো পানি নিয়ে গুড়া সাবান দিয়ে সহজে অনেক কাপড় কাচা যায়। বাজারে বিভিন্ন নামে গুড়া সাবান পাওয়া যায়। এইসব গুড়া সাবানে বার জাতীয় উপাদান থাকে বলে কাপড়ের ধরন বুঝে ব্যবহার করতে হয়।</p>	<p>নীল : কাপড় পরিষ্কার করার সময় সাবান ব্যবহারের ফলে কাপড়ে হলদে ভাবের সৃষ্টি হয়, একমাত্র নীল ব্যবহারের ফলে হলদে ভাব কেটে নীলাত শুভ্রতা দেখা দেয়। কাপড়ে ব্যবহারের জন্য আল্ট্রামেরিন (Ultramarine), প্রিশিয়ান (Prussian) এবং ইনডিগো বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। নীল তরল ও পাউডার দুইভাবেই বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।</p>
<p>তুষের জল : তুষের জলকেও পরিষ্কারক দ্রব্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তুষের জল দিয়ে সিনটেজ এবং কিটোন জাতীয় ছাপা ও রঙিন বস্ত্রাদি পরিষ্কার করা হয়। তুষকে ভূসি ও বলা হয়। তুষকে একটা ন্যাকড়ায় জড়িয়ে পানিতে ডিজিয়ে রেখে যখন পানি বাদামি বর্ণ ধারণ করবে তখনই তুষের পানি ব্যবহার উপযোগী হবে।</p>	<p>কাপড় মোলায়েমকারক : সিনথেটিক কাপড়ের জামাকাপড় কিছুদিন ব্যবহার করার পর একটু দৃঢ় প্রকৃতির হয়ে যায়। কাপড় মোলায়েমকারক ব্যবহার করলে কাপড় নরম ও কোমল থাকে। তবে বেশি ব্যবহার করলে কাপড়ের পানি শোষণ ক্ষমতা হ্রাস পায়।</p>
<p>অ্যামোনিয়া : এটা এক প্রকার তীব্র গ্যাস। সাধারণত পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। সাদা রেশম ও পশমের বস্ত্রাদি পরিষ্কার করার জন্য খর পানি এই অ্যামোনিয়ার সাহায্যে মৃদু করা হয়। রঙিন বস্ত্রাদি এই প্রকার মৃদু জলে পরিষ্কার করা হয় না। কারণ অ্যামোনিয়ার ফলে রং চঠে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। কখনো কখনো কাপড়ের দাগ উঠানের জন্যও ব্যবহার করা হয়।</p>	<p>জীবাণুনাশক: কোনো সংক্রামক রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করার পর ব্যবহৃত জামাকাপড় জীবাণুমুক্ত করার জন্য জীবাণুনাশক উপকরণ দিয়ে দোয়া হয়। যেমন : ক্লোরিন, প্লিচিং।</p>
<p>রিঠা : প্রাচীনকাল থেকেই এই রিঠা ফল রেশম, পশমের বস্ত্রাদি পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। রিঠার খোসার মধ্যে স্যাপোনিন নামে একটা পদার্থ আছে এই স্যাপোনিনই কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করে। এতে কাপড়ের উজ্জ্বলতা, কোমলতা বাড়ায় ও রং তালো থাকে।</p>	<p>তিনিগার : বস্ত্র পরিষ্কারক দ্রব্য তিনিগারকে কাপড়ের অতিরিক্ত নীল দূর করার জন্য ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া রঙিন কাপড়ের রং চঠে গেলে পানিতে সামান্য তিনিগার মিশিয়ে ওই পানিতে কিছুক্ষণ রাখলে রং ফিরে আসে।</p>
<p>সিনথেটিক ডিটারজেন্ট : ডিটারজেন্ট এক ধরনের বারবিহীন পরিষ্কারক উপকরণ। রেশম, পশম ইত্যাদি মূল্যবান বস্ত্রাদি ডিটারজেন্টের সাহায্যে নির্ভরে পরিষ্কার করা যায়। রঙিন বস্ত্রাদির রং চঠে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না।</p>	<p>লবণ : নতুন রঙিন কাপড়ের কাঁচা রং পাকা করার জন্য লবণের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। রঙিন বস্ত্রাদি পরিষ্কার করার সময় সাবান পানিতে সামান্য পরিমাণে লবণ গুলে নিলে কাপড়ের রং নষ্ট হয় না। কাপড়ের দাগ তুলতেও লবণ ব্যবহার করা হয়।</p>

কাজ - গৃহে ব্যবহৃত পরিষ্কারক এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির একটি তালিকা তৈরি কর।

পাঠ-২ : বস্ত্র ধৌতকরণের পূর্ব প্রস্তুতি

‘বস্ত্র ধৌতকরণ’ পরিবারের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার একটা উল্লেখযোগ্য দিক। কেননা প্রতিদিনই ব্যবহার্য কাপড় পরিষ্কার করতে হয়। আবার কখনো কখনো সাম্প্রতিক কিংবা মৌসুম ভিত্তিক ধৌতকরণ প্রক্রিয়া চলে। কাপড় ধোয়া পরিশ্রমের কাজ। এই কাজটি সুষ্ঠুভাবে শেষ করার জন্য কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়। যেমন,

ময়লা কাপড় বাছাই করা—

পরিষ্কার করার সূবিধার জন্য ময়লার তারতম্য অনুসারে জামাকাপড়, বিছানার চাদর, নিত্যব্যবহার্য কাপড়, ছোট কাপড় ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভাগ করে নিলে সুবিধা হয়।

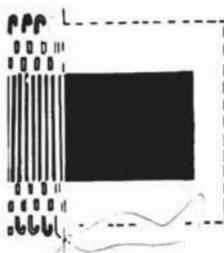
আবার বিভিন্ন ধরনের তত্ত্বাবধারক কাপড়ে (যেমন, সুতি, সিলেন, ব্রেশম, নাইলন, টেটন ইত্যাদি) একই পরিষ্কারক দ্রব্য বা ধৌতকরণ পদ্ধতি প্রযোজ্য নয়। বাছাইকরণের সময় যেসব কাপড়ের প্রকৃতি এবং ধোয়ার পদ্ধতি একই রকম সেগুলো সব এক সাথে রাখা উচিত। কাজেই বস্ত্র ধৌতকরণের পূর্বে তন্ত্র, রং, আকার ও ময়লা অনুযায়ী বস্ত্র বাছাই করতে হবে। কাপড়ে বা পোশাকের গায়ে যদি কোনো নির্দেশনা থাকে তবে তা অনুসরণ করা উচিত।

মেরামত করা—

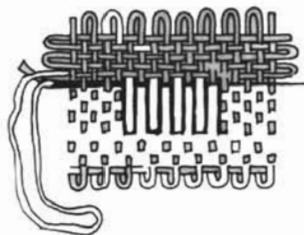
ধৌত করার পূর্বে পোশাকের বা বস্ত্রের প্রয়োজনীয় মেরামত করে নিতে হয়। কাপড়ের কোনো অংশে ছেঁড়া থাকলে তা রিফু বা তালি দিয়ে ঠিক করে নিতে হয়। তা না হলে ধৌত করার সময় আরও বেশি ছিঁড়ে যেতে পারে। এই ছেঁড়া বড় হলে পোশাক পরার অযোগ্য হয়ে পড়ে। এ ছাড়া বোতাম, হুক, বকলেস ইত্যাদি টিলা কি না পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কোনো আলঙ্কারিক বোতাম, ক্লিপ থাকলে তা খুলে রাখতে হবে।

মেরামতের নমুনা

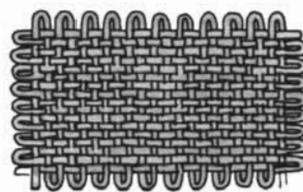
ক) **রিফু করা :** পোশাকের কোনো স্থানে খোঁচা লেগে ছিঁড়ে গেলে বা ফেঁসে গেলে ছেঁড়া স্থানের পড়েন সূতা সূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে সূচের সাহায্যে তরে দেওয়াকে রিফু বলা হয়। এজন্য বস্ত্রের সূতা অনুযায়ী সূচ ও সূতার প্রয়োজন। তা ছাড়া রিফু করার সূতা ও কাপড়ের রং এক হতে হয়। রিফু করার সময় ছেঁড়া অংশের চারদিকে প্রথমে পেনসিলের দাগ দিয়ে নিতে হয়। দাগের উপর দিয়ে ছোট করে রান ফোড় দিয়ে সেলাই করলে কাপড়ের সূতা খুলে আসবে না। এরপর এক একটি সূতার তেজর দিয়ে সূচ দিয়ে প্রথমে টানা সূতার (Warp yarn) অংশ পরিপূরণ করতে হয়। ছেঁড়া অংশের সম্পূর্ণটা টানা সূতায় তরে তুলে একই পদ্ধতিতে তরা সূতার (Filling yarn) অংশের একটা সূতার উপর ও নিচ দিয়ে সেলাই করে পূরণ করতে হয়। এক্ষেত্রে ফ্রেম ব্যবহার করলে সুবিধা হয়।



রিফুর প্রথম পর্যায়



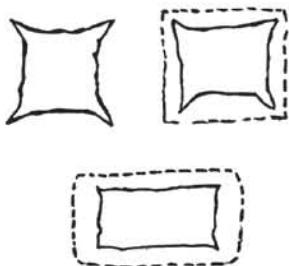
রিফুর দ্বিতীয় পর্যায়



রিফুর তৃতীয় পর্যায়

৬) তালি দেওয়া : বস্ত্র ও পোশাকের কোনো অংশ ছিড়ে গেলে এক পরতা কাপড়ের উপর আরেক পরতা কাপড় রেখে সেলাই করে আটকানোকেই তালি দেওয়া বলা হয়। পোশাক পরিচ্ছেদের কোনো অংশ ছিল হলে, মুড়ে গেলে বা পোকায় কাটলে তালি দেওয়ার প্রয়োজন হয়। তালি দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা—

- (i) সাধারণ তালি : তালি গোলাকার বা চারকোনাকার হতে পারে। যে কাপড়ে তালি দেওয়া হবে তার অনুরূপ রং ও জমিনের বড় একবৃক্ষ কাপড় নিতে হবে। তালির কাপড় ছেঁড়া অংশ অপেক্ষা বড় হবে। টুকরা কাপড়টি তালি দেওয়ার আগে তালোভাবে ধূয়ে ইস্ত্রি করে নিতে হয়। যে কাপড়টি দিয়ে তালি দিতে হবে সে কাপড়ের টুকরা ছেঁড়া জায়গায় বসিয়ে ধার মুড়ে চারদিকে হেম ফৌড় দিয়ে কাপড়ের সাথে আটকাতে হবে। এবার কাপড়টাকে উল্টো করে ছেঁড়া জায়গাটা কোনাকুনি কেটে মুড়ে টুকরা কাপড়ের সাথে হেম ফৌড় দিয়ে সেলাই করে দুই পাশে ইস্ত্রি করে বসাতে হবে।
- (ii) নকশা তালি : সাধারণ তালির জন্য কাপড়ের রঙের তালির কাপড় পাওয়া না গেলে অথবা তালি দিলে দেখতে খারাপ লাগবে মনে হলে অথবা ব্যবহৃত কাপড়টি এতই নতুন যে সৌন্দর্য নষ্ট করতে মন চাচ্ছে না, এখনো অনেক দিন ব্যবহার করতে হবে— এমন অবস্থায় নকশা তালির মাধ্যমে মেরামত করা যায়। এক্ষেত্রে ছেঁড়া কাপড়ের উপর অন্য রঙের কাপড় দিয়ে নকশা করে কেটে প্রথমে টাক দিয়ে আটকিয়ে পরে বোতাম ফৌড় দিয়ে সেলাই করতে হবে। উল্টা দিকের ছেঁড়া কাপড় সাধারণ তালির মতো সেলাই করতে হবে। যাতে সূতা বের হতে না পারে। এই নকশা তালির মতো আরও নকশা করে সমস্ত কাপড়ে সামঞ্জস্য বজায় রেখে আরও নকশা বসিয়ে নিলে তালি দেওয়ার ব্যাপারটি বোৰা যায় না। অনেকটা এপ্টিক নকশার মতো দেখায়। ছেঁলেদের প্যান্ট, শিশুদের জামায় নকশা তালি হিসেবে বড় স্টিকার ব্যবহার করা যায়।



সাধারণ তালি



নকশা তালি

দাগ অপসারণ— নানা কারণে জামাকাপড়ে দাগ লাগে এবং ব্যবহারের অনুপযোগি হয়। দেখতেও খারাপ লাগে। তাই সম্পূর্ণ কাপড়টি ধোয়ার আগে দাগমুক্ত স্থানটির দাগের উৎস, তত্ত্ব প্রকৃতি জ্ঞানতে হবে। কেননা রং অন্যান্য পরিস্কারক দ্রব্যের সংসর্ষে এসে দাগটি স্থায়ীভাবে বসে যেতে পারে।

বস্ত্র পরিষ্কারক উপকরণ নির্বাচন— বস্ত্র খৌতকরণের আগেই বস্ত্রের তত্ত্ব প্রকৃতি, ময়লার ধরন, রং, আকার-আয়তন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে উপযুক্ত পরিষ্কারক দ্রব্য সঞ্চাহ করে নিতে হবে। বস্ত্র অনুযায়ী গুরম বা ইষদুক্ত পানি কিংবা ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করা হয়। আবার কাপড়ের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য নীল, মাঝ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। যেমন: সূতি ও লিনেন কাপড়ে সাধারণ সাবান ও ঠাণ্ডা পানি দিয়ে পরিষ্কার করতে হয়। কিন্তু ব্রেশমি ও পশমি বস্ত্র ডিটারজেন্ট পাউডার এবং ইষদুক্ত পানি দিয়ে ধূতে হয়। সাবান মাখানোর পর প্রায় আধুনিক মতো রেখে নিলে কাপড়ের ময়লা আলগা হয় এবং কাপড় তালো পরিষ্কার হয়।

পানিতে তেজানো— বেশি ময়লা কাপড় (মশারি, পর্দা, টেবিল ক্লথ ইত্যাদি) সাবান পানিতে দেওয়ার আগে ঠাণ্ডা বা ইষদুষ পানিতে আধিষ্ঠান বা একঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে কাপড়ের ময়লা আলগা হয়। এরপর সাবান পানি দিয়ে ধূলে কাপড় ভালো পরিষ্কার হয় এবং সাবানও কম খরচ হয়।

কাপড় কাচা— সাবান দিয়ে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখার পর জামাকাপড়ের বেশি ময়লা অংশগুলো ঘমে পরিষ্কার করতে হয়। শার্টের কলার, হাতা, কাফ, প্যান্টের পেছনের অংশ, পাজামা-পেটিকোটের ঝুলের প্রান্ত প্রভৃতি স্থান বেশি ময়লা হয়। এ জন্য সম্পূর্ণ কাপড়টি কাচার আগে এই অংশগুলো একটু বেশি করে সাবান দিয়ে ঘমে পরিষ্কার করতে হয়। প্রয়োজনে নরম ত্রাশ ব্যবহার করা যায়। এরপর সম্পূর্ণ কাপড় অল্প অল্প পানি দিয়ে থুপে থুপে ধুতে হয়। তবে রেশমি কাপড় না কেচে দুহাতে চাপ দিয়ে ধুতে হয়— রাগড়ানো ঠিক নয়। এতে কাপড়ের কোমল আঁশের ক্ষতি হয়।

প্রক্ষালন— কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করার পর বড় বালতি বা গামলায় বেশি করে পানি নিয়ে কাপড় বারবার ধুয়ে ময়লা ও সাবান ছাড়াতে হয়। ময়লা ও সাবান ছাড়ানোর জন্য বারবার পানি বদলানোর প্রক্রিয়াকেই প্রক্ষালন বলা হয়।

এরপর কাপড় নিংড়ে পানি বের করতে হয়। রেশমি কাপড়ের পানি নিংড়ানোর সময় না মুচড়িয়ে চেপে চেপে পানি বের করতে হয়। ধোয়া পশমি কাপড় মোটা তোয়ালের মধ্যে জড়িয়ে চাপ দিয়ে পানি শোষণ করাতে হবে। রেশমি ও পশমি কাপড় শেষবার ধোয়ার সময় পানিতে সামান্য পরিমাণ ভিনিগার মিশিয়ে নিলে কাপড়ের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়।

নীল ও মাড় প্রয়োগ— সাধারণত সুতি ও লিনেনের কাপড়ে মাড় দেওয়ার প্রয়োজন হয়। কতোটা ঘন মাড় দেওয়া হবে তা নির্ভর করে কাপড়ের প্রকৃতির উপর। মোটা কাপড়ে পাতলা মাড় দেওয়া হয়। সাদা কাপড়ে নীল প্রয়োগ করা হয়। যখন কাপড়ে নীল ও মাড় দেওয়ার প্রয়োজন হয় তখন মাড়ের মতো নীল গুলে নেওয়া হয়। ধোয়া কাপড় নীল মেশানো মাড়ে ডুবিয়ে নিংড়ে নিয়ে রোদে শুকাতে হয়। এভাবে সুতি সাদা কাপড় এবং গাঢ় রঙের (নীল/কাল) কাপড়ের উজ্জ্বলতা বাড়ে।

কাপড় শুকানো— কাপড় ধোয়ার পর ঠিকভাবে না শুকালে কাপড়ের ধৰ্বধরে এবং কড়কড়ে ভাবটা আসে না। মেটমেটে ভাব এবং স্যাতসেতে গন্ধ হতে পারে। সাদা কাপড় রোদে শুকালে আরও সাদা হয়ে উঠে। রঙিন কাপড়, রেশমি কাপড় ছায়ায় শুকানো ভালো। পশমি কাপড় বাতাসপূর্ণ খোলামেলা ছায়াযুক্ত কোনো সমতল জায়গায় বিছিয়ে শুকাতে হয়। কাপড় বা পোশাকের ভারী মজবুত অংশ উপরের দিকে রেখে শুকাতে দিতে হয়।

ইস্ত্রি করা— ধোয়ার পর প্রায় সব কাপড়েই কুঞ্চন সৃষ্টি হয়। কাপড় মসৃণ ও পরিপাটি করার জন্য ইস্ত্রি করা হয়। ইস্ত্রি করার আগে মাড় দেওয়া সুতি কাপড়গুলো সামান্য পানি ছিটিয়ে নরম করে নিতে হয়। কাপড়ের প্রকৃতি অনুসারে ইস্ত্রির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যেমন : রেশম ও কৃত্রিম তস্তুর কাপড় সর্বনিম্ন তাপে, পশম 300°F তাপে, সুতি $800^{\circ}-850^{\circ}\text{F}$ তাপে, লিনেন $875^{\circ}-900^{\circ}\text{F}$ তাপে ইস্ত্রি করা হয়।

হাওয়া লাগানো— ইস্ত্রি করার পর বস্ত্রাদিতে আর্দ্ধভাব থাকে। এই অবস্থায় বক্স বা আলমারিতে রাখা ঠিক নয়। সেজন্য কিছুক্ষণ খোলা বাতাসে রেখে আর্দ্ধভাব দূর করতে হয়। কাপড় শুকালে যথাস্থানে সংরক্ষণ করতে হয়।

পাঠ-৩: রেশমি বস্ত্র ধৌতকরণ

রেশমি বস্ত্র বেশি উত্তাপ, ক্ষার ও ঘর্ষণ সহ্য করতে পারে না। ঘাম, ময়লাযুক্ত রেশমি বস্ত্র দ্রুত ধোয়া উচিত। কারণ ঘামের এসিড রেশমকে দুর্বল করে।

এই ধরনের বস্ত্র ধৌতকরণের লক্ষণীয় বিষয়গুলো নিম্নরূপ-

- ধোয়ার সময় সাদা ও রঙিন রেশমি বস্ত্র আলাদা করে নিতে হয়। রঙিন রেশমি বস্ত্র ভিজিয়ে রাখলে রং উঠে এবং সাদা রেশমি বস্ত্রের সাথে একত্রে ধূলে সাদা বস্ত্রে রং লেগে যেতে পারে। তাই সাদা ও রঙিন বস্ত্র আলাদা ধোয়া উচিত।
- সব সময় রেশমি বস্ত্র মৃদু গরম পানি এবং কম ক্ষারযুক্ত সাবান ব্যবহার করতে হয়। রেশমি বস্ত্র ধোয়ার জন্য ডিজারজেন্ট হিসাবে রিঠা, তালো সাবান বা সাবানের গুঁড়া ব্যবহার করা উচিত। এই ধরনের যে কোনো একটি পরিষ্কারক উপকরণ প্রয়োগ করে সামান্য মৃদু পানি সহযোগে অল্প সময় ধরে নেড়ে-চেড়ে নিলে ময়লা বের হয়ে যায়।
- ময়লা ও সাবান দূর করার জন্য বড় গামলা বা বালতিতে পরিষ্কার পানিতে একাধিকবার নেড়ে-চেড়ে নিতে হয়। রঙিন কাপড়ের বেলায় শেষবার প্রক্ষালনের সময় ঠাণ্ডা পানিতে প্রতি গ্যালনে বড় এক চামচ লবণ ও সমপরিমাণ ভিনিগার মিশিয়ে নেওয়া উচিত। এতে রঙিন রেশমের উজ্জ্বলতা ঠিক থাকে। হাত দিয়ে চেপে পানি বের করতে হয়।
- অনেকবার ধোয়া হয়েছে এমন রেশমি বস্ত্রের কাঠিন্য ঠিক রাখার জন্য এরারুটের দ্বারা তৈরি মাড় প্রয়োগ করা হয়। গীদও রেশমি বস্ত্রের কাঠিন্য ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিতে ব্যবহার করা হয়।
- রেশমি বস্ত্র সব সময় ছায়ায় শুকাতে হয়। সূর্যের তাপ রেশমি বস্ত্রের রং ও উজ্জ্বলতা নষ্ট করে।
- রেশমি বস্ত্র কিছুটা আর্দ্র অবস্থায় ইস্ত্রি করতে হয়। সুতি কাপড়ের মতো রেশমি বস্ত্রে পানি ছিটানো বা স্প্রে করতে হয় না। এতে কাপড়ে পানির ফেঁটার দাগ বসে যায়। রেশমি কাপড় উল্টা পিঠে মৃদু তাপে ইস্ত্রি করলে উজ্জ্বলতা ঠিক থাকে। ইস্ত্রি শেষে কাপড়ের জলীয় বাষ্প শুকিয়ে গেলে যথাস্থানে সংরক্ষণ করতে হয়।

পশমি বস্ত্র ধৌতকরণ-

পশমি কাপড় প্রাণিজ তন্তু থেকে উৎপন্ন হয়। পানি, উভাপ, ক্ষার ও ঘর্ষণ পশম তন্তুকে দুর্বল করে। এ জন্য পশমি কাপড় ধোয়ার সময় ইষদুষ্ক পানি, কম ক্ষারযুক্ত পরিষ্কারক দ্রব্য ব্যবহার করতে হয়।

ধোয়ার পদ্ধতি-

- পশমি কাপড় চোপড় ধোয়ার আগে প্রয়োজন অনুসারে মেরামত, দাগ অপসারণের কাজটি করে নিতে হয়। সাদা ও রঙিন কাপড়গুলো ভাগ করতে হয় কারণ এগুলো আলাদা ধোয়া উচিত। তারপর কাপড়গুলো হালকাভাবে ত্বাশ করে আলগা ধূলাবালি পরিষ্কার করতে হয়। হাতে বোনা পশমের জামাকাপড় বেশ নমনীয় প্রকৃতির হয়। ধোয়ার পর এগুলির আকৃতি প্রায়ই ঠিক থাকে না। এ জন্য ধোয়ার আগে এসব পোশাকের আকৃতি বা নকশা একটা কাগজের উপর ঢেকে রাখতে হয়। ধোয়ার পর ওই নকশা আঁকা কাগজের উপর পোশাক রেখে হাত দিয়ে টেনে আকৃতি ঠিক করে নেওয়া যায়।



পশমি কাপড় খোয়ার আগে নকশা অঙ্কন

- পশমি কাপড় খোয়ার কাজে ইয়দুকৃ পানি ব্যবহার করতে হয়। কম ক্ষারযুক্ত গুড়া সাবান যেমন: জেট পাউডার ইত্যাদি পশমি বস্ত্র খোয়ার জন্য উপযোগী। একটা বড় গামলায় ইয়দুকৃ পানিতে সাবান গুলে কাপড় কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখে তারপর দুই হাত দিয়ে ধরে এপিট-ওপিট করে সাবান লাগাতে হয়। পশমি কাপড় বেশিক্ষণ পানিতে থাকলে দুর্বল হয়ে পড়ে। এ জন্য বেশিক্ষণ সাবান মাঝিয়ে রাখা ঠিক নয়।
- সাবান লাগাবার পর দুই হাত দিয়ে হালকাভাবে চাপ দিয়ে নেড়েচেড়ে এপিট-ওপিট করে কেচে পরিষ্কার করতে হয়। মাঝে মাঝে পানি দিয়ে নিতে হয়।
- কাপড়ের ময়লা ভালোভাবে দূর হওয়ার পর সাবান ও ময়লা পর্যাপ্ত পরিমাণে নতুন পানি দিয়ে ধূয়ে ধূয়ে ছাড়াতে হয়। তিনি-চারবার ইয়দুকৃ পানি দিয়ে ভালোভাবে খোয়া উচিত। একই সাথে একাধিক পাত্রে একই ভাগমাত্রায় পানি রাখলে কাপড় খোয়ার কাজ সহজ ও সুন্ত হয়। পশমের সাদা জামাকাপড় শেববার পানি দিয়ে খোয়ার সময় পানির মধ্যে কয়েক ফৌটা সাইট্রিক এসিড বা লেবুর রস মিশিয়ে নিলে কাপড়ের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্রীয় পশমি কাপড় খোয়ার সময় পানিতে ভিনিগার মিশিয়ে নিলে কাপড়ের রং ভালো থাকে। খোয়ার পর একটি মোটা বড় পরিষ্কার তোয়ালের মধ্যে ভেজা কাপড়টিকে জড়িয়ে দুই হাতে চেপে চেপে পানি বের করতে হয়। কাপড় কখনই মুচড়িয়ে নিন্দ্রাতে হয় না। এতে কাপড়ের ক্ষতি হয়।
- পশমি বস্ত্র মৃদু সূর্য কিরণ অথবা আলো বাতাসপূর্ণ ছায়াযুক্ত স্থানে শুকাতে হয়। মেশিনে তৈরি পশমি বস্ত্র সমতল স্থানে পাটি, মাদুর, কাঁথা প্রভৃতি মেলে তার উপর ভেজা কাপড়গুলো বিছিয়ে শুকাতে হয়। মাঝে মাঝে কাপড়গুলো এপিট-ওপিট করে নেড়ে দিলে তাড়াতাড়ি শুকায়।
- পশমি বস্ত্র কিছুটা আর্দ্র অবস্থায় উল্টা দিক দিয়ে মৃদু তাপে এবং হালকা চাপে ইস্ত্র করতে হয়। ইস্ত্র করার সময় একটা পাতলা ভেজা কাপড় উপরে বিছিয়ে নিয়ে তার উপর ইস্ত্র চালাতে হয়। এতে তন্তুর ক্ষতি হয় না এবং উজ্জ্বলতা বজায় থাকে। কাপড় ইস্ত্র করার পর কিছুক্ষণ বাতাসে রেখে উষ্মময়ে জলীয় বাত্তা দূর করে নিতে হয়। তারপর ব্যাস্থানে সঞ্চাকণ করতে হয়।

পাঠ-৪: শুক ধোতকরণ

পানি ব্যবহার না করে বিশেষ ধরনের কিছু রাসায়নিক পরিষ্কারক দ্রব্য ব্যবহার করে কাপড় পরিষ্কার করাকেই শুক ধোতকরণ বলা হয়। কিছু কিছু রেশমি ও পশমি কাপড় সাবান পানিতে ধূলে সংকুচিত হয় কিন্বা রং চটে ঘাবার আশঙ্কা থাকে। এই পদ্ধতিতে কাপড় খোয়া হলে কাপড়ের আকার আকৃতি ও উজ্জ্বলতা বজায় থাকে।

ব্যবহৃত উপকরণ : শুষ্ক ধোলাইয়ের জন্য অনেক প্রকার রাসায়নিক দ্রাবক ব্যবহৃত হয়। এসব তরল পদার্থ সম্পূর্ণ পানিশূন্য থাকে। আর তাতে কিছুটা পানি থাকলেও তা তুলা বা কোনো প্রকার শোষক দিয়ে পানিশূন্য করা হয়। কেননা এ জাতীয় তরলে পানি থাকলে তা দিয়ে কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করা যায় না।

উপকরণের যে সব বিশেষত্ব থাকা প্রয়োজন তা হলো—

- শুষ্ক ধোলাইয়ে ব্যবহৃত তরলের কারণে যেন বস্ত্রে গল্প তৈরি না হয়।
- কিছু তরল আছে যা বেশি উদ্বায়ী—বাতাসে সহজে উড়ে যায় এবং এর ফলে ধোলাইয়ে বেশি খরচ হয়। আবার কিছু তরল পদার্থ আছে কম উদ্বায়ী—এতে কাপড় দেরিতে শুকায়। সে কারণে মাঝামাঝি উদ্বায়ী তরলই শুষ্ক ধোলাইয়ের জন্য উত্তম। তবে দুই বা ততোধিক তরলের মিশ্রিত দ্রাবকে শুষ্ক ধোলাই ভালো হয়।
- শুষ্ক ধৌতিতে ব্যবহৃত পরিষ্কারক দ্রব্যাদি বা তরল পদার্থের মধ্যে পেট্রলিয়াম ইথার, টারপেনটাইন কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, বেনজল, বেনজিন ও পেট্রল উল্লেখযোগ্য। এসব কয়টি পরিষ্কারক দ্রব্যের মধ্যে পেট্রলই বেশি ব্যবহৃত হয়। কারণ পেট্রল অপেক্ষাকৃত সস্তা ও সহজলভ্য।

ধোয়ার নিয়ম : শুষ্ক ধৌতকরণের বিভিন্ন ধাপগুলো নিম্নরূপ

- প্রথমে কাপড় থেকে আলগা ময়লা ঘোড়ে ফেলতে হয়।
- পরিষ্কারক তরল পদার্থটিকে পানিশূন্য করে নিতে হয়।
- পরপর চারটি পাত্রে এই পানিশূন্য তরল পদার্থ ঢেলে নিতে হয়।

প্রথম পাত্রের তরলে কিছুটা বেনজিন সাবান বা লিসাপল জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্য মেশালে ভালো হয়। কাপড়টি প্রথম পাত্রের তরলে ডুবিয়ে রাগড়িয়ে তুলতে হয়।

- তারপর কাপড়টি হাতে চেপে যথাসম্ভব তরল পদার্থ বের করে পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পাত্রের তরলে ধূয়ে নিতে হয়। চতুর্থ পাত্রের তরলে কিছুটা ভিনিগার মিশিয়ে নেওয়া উত্তম।
- এভাবে ধোয়ার পর কাপড়টি ছায়ায় শুকাতে হয়। শুকানোর সময় কাপড়টির মূল আকার সংরক্ষণের জন্য মাঝে মাঝে টেনে পূর্বাকারে এনে নিতে হয়। এতে কাপড়ের আকার সংরক্ষিত হয় না।
- কাপড়টি এভাবে শুকানোর পর এর উপর ভেজা কাপড় বিহিয়ে ইস্ত্র করে নিতে হয়।

শুষ্ক ধৌতকরণ পদ্ধতিতে কয়েকটি সর্তকার্তামূলক ব্যবস্থা নিতে হয়। যেমন—কাপড় ধোয়ার স্থানে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকা দরকার—

- কাপড় ধোয়ার স্থানে বা কাছাকাছি স্থানে যেন আগুন না থাকে
- কাপড় ধোয়ার তরল যেন মেঝেতে না পড়ে। এভাবে রেশমি ও পশমি বস্ত্র শুষ্ক উপায়ে বাড়িতেও ধোয়া যায়।

নাইলন, পলিয়েফ্টাইল ইত্যাদি কৃত্রিম তন্তুর কাপড় ধোয়ার পদ্ধতি : এসব সিনথেটিক তন্তুর বস্ত্রাদি পানিতে ভিজিয়ে রাখলে সহজে নষ্ট হয় না। বেশি ময়লা বস্ত্রাদি দ্বিদুষণ সাবান জলে ভিজিয়ে রাখলে সহজে পরিষ্কার হয়। ভালো সাবানের গুঁড়া, বার ব্যবহার করা যায়। ধোয়ার সময় কখনো মোচড়াতে হয় না। আস্তে থুপে থুপে ধূতে হয়। পরিষ্কার পানি একাধিকবার ব্যবহার করে ময়লা ও সাবান দূর করতে হয়। তারপর ছায়াযুক্ত স্থানে দড়িতে টানিয়ে শুকাতে হয়। এই তন্তুর বস্ত্রগুলি ধৌতকরণের ফলে তেমন কুম্ভন পড়ে না বলে ইস্ত্র না করলেও চলে।

কাজ – বস্ত্র ধৌতকরণের পূর্ব প্রস্তুতি বর্ণনা কর।

পাঠ-৫: সংরক্ষণ

সংরক্ষণ বলতে সঠিক নিয়মে রেখে দেওয়াকে বোবায়। এখানে ব্যবহৃত বস্ত্রাদি ধোয়া ও ইস্ত্রি করার পর যথাযথ স্থানে স্বল্পমেয়াদি বা দীর্ঘমেয়াদি সময়ের জন্য রেখে দেওয়ার কথা বোবানো হয়েছে। আমরা নানা ধরনের কাপড়চেপড় ব্যবহার করি। এদের মধ্যে ঘরোয়া পোশাক, বাইরের পোশাক, উৎসব-অনুষ্ঠানের পোশাক, মৌসুমি পোশাক অন্তর্গত। এ ছাড়া প্রায় সব বাড়িতে বিছানাপত্র এবং গৃহসজ্জার নানা টেবিল ক্লথ, কুশন কভার, ন্যাপকিন, ট্রে ক্লথ ইত্যাদি থাকে। এগুলোর উজ্জ্বলতা, সৌন্দর্য ও স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য সঠিকভাবে যত্ন ও সংরক্ষণ করতে হয়। সংরক্ষণ একক হিসেবে স্টিল ও কাঠের আলমারি, বড় স্টিলের বক্স, সুটকেস ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়।

কাপড় সংরক্ষণের শক্তিগীয় বিষয় :

- দামি কাপড়, সাধারণ কাপড় ভাগ করে রাখলে সুবিধা হয়।
- বড় কাপড়, ছোট ছোট কাপড় ভাগে ভাগে সংরক্ষণ করা হলে প্রয়োজনের সময় সহজে ঝুঁজে পাওয়া যায়।
- কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে ন্যাপথলিন দিতে হয়।
- লেপের কভার, বিছানার চাদর, কম্বল প্রভৃতি ভাঁজে ভাঁজে কালোজিরা, শুকনা চা পাতা কাপড়ের পুটলিতে বেঁধে রেখে দেওয়া যায়। নিমগাতাও রাখা ভালো।
- মাঝে মাঝে রোদে দিয়ে শুকিয়ে নিলে কাপড়ের স্যাতসেঁতে ভাব দূর হয়।

শীতকাল ছাড়া বছরের অন্য সময়ে পশমি বস্ত্র ব্যবহৃত হয় না। বছরের ২-৩ মাস পশমি বস্ত্র ব্যবহৃত হয়। বছরের বাকি সময় এগুলো তোলাই থাকে। পশমি বস্ত্রের দাম তুলনামূলক বেশি। সঠিক উপায়ে সংরক্ষণ করতে পারলে পশমি কাপড় অনেক দিন পর্যন্ত টেকে।

সংরক্ষণের উপায়গুলো নিম্নরূপ-

- পশমের সবচেয়ে বড় শত্রু মথ। ময়লা পশমি কাপড়ে এদের আরও বেশি উপদ্রব হয়। মথ পোকার হাত থেকে রক্ষা করতে হলে কাপড় সংরক্ষণের আগেই সঠিক নিয়মে ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হবে।
- এরপর ইস্ত্রি করে বাতাসে শুকিয়ে আর্দ্রতামুক্ত করে নিতে হয়। তারপর ভাগে ভাগে আলমারি বা বক্সের মধ্যে ভরে রাখতে হয়।
- কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে ন্যাপথলিন দিতে হবে। এ ছাড়া শুকনো নিমগাতা, তামাক পাতা কাপড়ে জড়িয়ে ভাঁজে ভাঁজে রাখা যায়।
- সংরক্ষণ করার আগে আলমারি বা বক্সে কীটনাশক স্প্রে করে নিলে ভালো হয়।
- সংরক্ষিত কাপড়গুলো মাঝে মাঝে বের করে হালকা রোদে মেলে বাতাসে লাগিয়ে স্যাতসেঁতে ভাব দূর করতে হয়।
- পশমি কোট, প্যান্ট, জ্যাকেট প্রভৃতি আলমারির ভেতর হ্যাঙারে ঝুলিয়ে রাখলে ভালো থাকে।
- রেশমি বস্ত্র মূল্যবান হয়ে থাকে। এসব বস্ত্র ব্যবহারোপযোগী রাখার জন্য যত্নের সাথে সংরক্ষণ করতে হয়।

সংরক্ষণের উজ্জ্বলযোগ্য বিষয়গুলো নিম্নরূপ-

- সংরক্ষণ করার আগেই নিয়মানুযায়ী ধোতকরণ, শুকানো ও ইস্ত্রির কাজটি করে নিতে হবে।
- ইস্ত্রি করা রেশমি বস্ত্রের জলীয়বাস্প উত্তমরূপে দূরীভূত করতে হবে। তা না হলে ফাঙ্গাস সৃষ্টি হয়ে বস্ত্রের তন্তু দুর্বল হয়ে যায় এবং ব্যবহারের সময় ফেঁসে যায়।

- রেশমি কাপড়ের চরম শত্রু কাপড় কাটার বুপালি পোকা। তাই অবশ্যই সংরক্ষিত স্থানটি আর্দ্রতামুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মাঝে মাঝে হালকা রোদে বাতাস চালনা করে শুকিয়ে নিতে হবে।

কাজ - বিভিন্ন ধরনের তত্ত্ব বস্ত্র সংরক্ষণে সতর্কতামূলক বিষয় সম্পর্কে লেখ।

পাঠ-৬: পারিপাট্যতা ও দৈহিক পরিচ্ছন্নতা

নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এ জন্য সে নিজেকে মনের মতো সাজায়। কোনো ব্যক্তির সাজসজ্জার পারিপাট্য বলতে ব্যক্তির দেহের সাথে মানানসই পোশাক পরিচ্ছদ ও আনুষঙ্গিক প্রসাধন কার্যের মিলিত অবস্থাকে বোঝায়। শারীরিক সৌন্দর্য তখনই উত্সাহিত হয় যখন শরীর সুস্থ থাকে। সুস্থ দেহে সুস্থ মন থাকে। সুস্থ মনই শৈলিকভাবে পরিপাটি থাকতে তাগিদ সৃষ্টি করে।

পারিপাট্য বজায় রাখার জন্য করণীয় বিষয়গুলো নিম্নরূপ-

- পারিপাট্যের জন্য পোশাক পরিচ্ছদের নিয়মিত যত্ন তথা ধোয়া, ইস্ত্র ও মেরামত প্রয়োজন।
- সময়োপযোগী পোশাক নির্বাচন ও পরিধান করা পারিপাট্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
- ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা যেমন, চুল, চোখ, দাঁত, নখ ইত্যাদির পরিচ্ছন্নতা ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য বজায় রাখতে হবে।
- দেহে সৌষ্ঠবের ভঙ্গিতে ঝাজুতা ও সাবলীলতা এবং কথা বলার স্বাভাবিক ভঙ্গি বজায় রাখতে হবে।
- অনুষ্ঠান, উপলক্ষ, স্থান, আবহাওয়া, বয়স, পেশা, দেহের আকার আয়তন ইত্যাদি বিবেচনা করে মানানসই পোশাক পরা উচিত। সব ধরনের ডিজাইন, সব টাইপের পোশাক সবার জন্য প্রযোজ্য নয়।
- পরিপাটি হওয়ার জন্য দামি পোশাকের প্রয়োজন নেই। অত্যধুনিক পোশাক না পরেও প্রচলিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পোশাক পরিধান করে পরিপাটি হওয়া যায়।
- সাধারণ পোশাকের সাথে আনুষঙ্গিক প্রসাধনের সুসমন্বয় ঘটিয়ে আকর্ষণীয় হয়ে উঠা যায়।
- সাংস্কৃতিক রীতি অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করা উচিত। যেমন- একজন বাঙালি মেয়েকে শাড়িতেই সুন্দর লাগে।
- পোশাকে শিল্পের সৃষ্টির উপকরণ ও নীতিগুলোর সমন্বয় ঘটাতে পারলে পরিধানকারী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে। পোশাকের বিভিন্ন অংশের সাথে রং, রেখা ও জমিনের মিল পরিপাট্য আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ যেমন : সালোয়ার-কামিজের সাথে উপযুক্ত ওড়নার ব্যবহার মার্জিত বুচির পরিচয় বহন করে।
- পোশাকের সাথে জুতা, হাতব্যাগ, গহনা এবং মেকআপ ইত্যাদির সমন্বয় সাধন করা সুপরিপাট্যের অন্যতম শর্ত। যেমন- শাড়ির সাথে কেডস মানানসই নয়। একইভাবে স্কুলের পোশাকের সাথে উঁচু হিল পরা অসামঞ্জস্যপূর্ণ। স্কুলের মেয়েদের লিপস্টিক, কাজল, গহনা ইত্যাদির ব্যবহার পারিপাট্যের পরিপন্থী। অর্থাৎ পরিপাট্যের জন্য পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছদ ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে হবে।

দৈহিক পরিচ্ছন্নতা

ব্যক্তির আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অন্যতম শর্ত হলো সুস্থাস্থ্য। সুস্থাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যও ভালো থাকে। সুস্থাস্থ্য গঠনের জন্য প্রয়োজন দেহের পরিচ্ছন্নতা ও যত্ন। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে মানবদেহ গঠিত যথা: হাত, পা, দাঁত, চোখ, নখ, কান, নাক, গলা, চুল, ত্বক ইত্যাদি। এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর পরিচ্ছন্নতার

সার্বিক বৃপ্তি হলো দৈহিক পরিচ্ছন্নতা। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য অটুট রাখাই দৈহিক পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্য। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যত্নের মাধ্যমে দাঁত, ত্বক, চুল তথা সমগ্র দেহাবয়ব মোহনীয় হয়ে উঠলে মানসিক জড়তা দূর হয়ে ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা ফুটে উঠে। নিজেকে ব্যক্তিত্বসম্পন্নভাবে সবার সামনে প্রকাশ করতে কোনো সংকোচ থাকে না।

দৈহিক পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্য করণীয় বিষয়গুলো হলো—

ক) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের-পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা—

হাতের যত্ন : ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে প্রথমেই আসে হাত। মসৃণ ও সুড়োল হাত সৌন্দর্য ও সুস্থিতা প্রকাশ করে। হাতের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য যেসব বিষয় লক্ষ রাখা প্রয়োজন সেগুলো হলো—

- কোনো কাজ করার পর হাত সাবান দিয়ে ধূয়ে ফেলতে হবে।
- হাতের মসৃণতা বজায় রাখার জন্য ক্লিম বা লোশন ব্যবহার করতে হবে।
- হাতে বিভিন্ন তরকারির ক্ষেত্রে দাগ কিংবা রান্নার মসলার দাগ লাগলে গেবু দিয়ে ঘষলে হাত দাগমুক্ত হয়ে যায়।
- হাতের নখ কেটে ছেট করতে হবে। নখের মধ্যে ময়লা টুকলে তা পেটে গিয়ে রোগ সৃষ্টি করে সুস্থিতায় বিস্তৃ ঘটায়।

পায়ের যত্ন : পায়ের যত্নে লক্ষণীয় বিষয়গুলো হলো—

- প্রতিদিন পা সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে ময়লা তুলে পরিষ্কার করতে হবে এবং মসৃণতা রক্ষার জন্য তেল, লোশন, প্লিসারিন, পেট্রোলিয়াম জেলি ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।
- মাঝে মাঝে ইষদুষ্ণ গরম পানিতে লবণ গুলে পা ৩০-৩৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখলে পায়ের ময়লা এবং ক্লান্তি দূর হয়।

দাঁতের যত্ন : দাঁতের যত্নে লক্ষণীয় বিষয়গুলো—

- প্রতিদিন মানসম্মত পেষ্ট বা দাঁতের মাজন ব্যবহার করতে হবে।
- খাওয়ার পর দাঁত পরিষ্কার করে নিতে হবে।
- দাঁত মাজার জন্য ছাই, কয়লা, পোড়ামাটি স্বাস্থ্যসম্মত নয়। এগুলো ব্যবহারে দাঁতের ক্ষতি হয়।
- দুর্গম্বিমুক্ত উজ্জ্বল দাঁত সৌন্দর্য ও সুস্বাস্থ্যের পরিচায়ক।

চোখের যত্ন : মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে চোখই সবচেয়ে কোমল ও সূক্ষ্ম। উত্তেজনাপ্রবণ কালিমাবিহীন, স্বচ্ছ, চকচকে চোখ সুস্থিতার পরিচয় বহন করে। চোখের নিরাপত্তা বিধানে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ রাখতে হবে—

- প্রতিদিন ভোরে চোখ পরিষ্কার করে ঠাণ্ডা পানির ঝাপটা দিতে হবে।
- তীব্র বা উজ্জ্বল এবং কম বা নিষ্পত্ত এই দুই ধরনের আলোই চোখের জন্য ক্ষতিকর। কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- নীল বা সবুজ আলো চোখে স্লিপ্প অনুভূতি আনে। ক্লান্তি দূর করে।
- চোখের সুস্থিতার জন্য ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করতে হয়।
- চোখ চুলকালে বা লাল হলে কিংবা পানি ঝরলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

চুলের যত্ন : পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল ও মস্ণ এবং সুবিন্যস্ত চুল ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করে। যেসব নিয়মগুলো চুলের সৌন্দর্য ও সুস্থতা রক্ষা করে সেগুলো হলো—

- নিয়মিতভাবে চুল আঁচড়াতে হবে এবং পরিষ্কার রাখতে হবে। এ জন্য অল্প ক্ষারযুক্ত সাবান, প্রাকৃতিক উপকরণ যেমন মসুরের ডালের পানি, মেথি বাটা ও ডিমের মিশ্রণ, লেবুর রস ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।
- খুশি দূর করার জন্য লেবুর রস, মেথি বাটা, নিমপাতার পানি, ডিমের কুসুম ইত্যাদি ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।
- চুলের মস্ণতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত তেলের সাথে লেবুর রস, চায়ের লিকার, টকদই ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।
- ‘ডিটামিন এ’ জাতীয় খাবার গ্রহণ করলে চুল ভালো থাকে।

নাক, কান ও গলা : নাক, কান ও গলা এই নিকটবর্তী অঞ্জগুলোর সুস্থতা খুবই জরুরি। শ্রবণেন্দ্রীয় কান দিয়ে কথা ঠিকভাবে শুনেই আমরা নিজেরা কথার উন্তর দিই, চিন্তা করি। ঠাণ্ডা লাগলে নাক গলা বসে গেলে কিংবা নাক দিয়ে অনবরত পানি ঝরলে দেখতে যেমন খারাপ লাগে, তেমনি স্বাতাবিক জীবনেও বাধার সৃষ্টি হয়। স্পষ্ট ভাষায় মিষ্টি স্বরে কথা বললে সুন্দর ব্যক্তিত্বেরই পরিচয় ফুটে উঠে। গলার সুস্থতার জন্য লবণ্যযুক্ত গরম পানি তালো।

ত্বকের যত্ন : পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ত্বক উজ্জ্বল ও নীরোগ হয়। ত্বকের বর্ণ যেমনই হোক না কেন তা যদি কোমল, মস্ণ ও পরিচ্ছন্ন হয় তাহলে তা ব্যক্তিত্বেরই পরিচয় দেয়। ত্বকের সুস্থতার জন্য প্রয়োজন—

- নিয়মিত গোসলের অভ্যাস ত্বকের পরিচ্ছন্নতা বাড়ায়।
- কখনোই বেশি গরম বা বেশি ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করা ঠিক নয়।
- ক্ষারহীন ভালো সাবান দিয়ে প্রতিদিন গা রংগড়িয়ে গোসল করা উচিত।
- গোসল কিংবা হাত মুখ ধোয়ার পর ত্বকের মস্ণতা বাড়ানোর জন্য ক্রিম/অলিতয়েল/গ্লিসারিন ব্যবহার করতে হয়।

খ) পোশাক-পরিচ্ছন্নের পরিচ্ছন্নতা—

শুধুমাত্র অঙ্গ-প্রত্যক্ষের পরিচ্ছন্নতা দেহের সার্বিক পরিচ্ছন্নতা আনয়ন করতে পারে না। এ জন্য প্রয়োজন পোশাক- পরিচ্ছন্নের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। পোশাকের-পরিচ্ছন্নতার সাথে দেহের সুস্থতা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ পোশাক মানুষের দেহের সাথে সংলগ্ন থাকে এবং দেহের পরিচ্ছন্নতাকে সংরক্ষণ করে। অপরিচ্ছন্ন পোশাক দৈহিক পরিচ্ছন্নতাকে বাধাপ্রাপ্ত করে। এই অপরিচ্ছন্ন পোশাক পরিপাট্যের অন্তরায়। এ জন্য দৈহিক পরিচ্ছন্নতাকে নিশ্চিত করার জন্য পোশাক পরিচ্ছন্নের পরিচ্ছন্নতা অপরিহার্য।

কাজ – পারিপাট্যতার উপায়গুলো কী বর্ণনা কর।

পাঠ-৭: পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ

পোশাক ব্যক্তিসম্ভাব একটা অপরিহার্য অঙ্গ। পোশাক পরিধান মানুষের মৌলিক, মানবিক অধিকার। আর ব্যক্তিত্ব শব্দটির মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হলো ‘সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ব্যক্তির গঠন, আচরণের ধরন, আঘাত, ভাবভঙ্গ, সামর্থ্য এবং প্রবণতার সংহতি এবং ঐক্য।’ অর্থাৎ ব্যক্তি দেহ ও মনের জীবন্ত ঐক্য বিশেষ।

পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তি তার মনের অঙ্গনীহিত অনুভূতিকে প্রকাশ করে থাকে। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পোশাকের সুনির্বিড় সম্পর্ক রয়েছে। পোশাক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম বা হাতিয়ার। যেমন-

- পোশাকের সাথে মনের সম্পর্ক রয়েছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অথবা পুরানো পোশাক বদলিয়ে নতুন পোশাক পরলে মন প্রফল্লতায় ভরে উঠে।
- পোশাক পরিবেশের সাথে মানানসই হলে মনে কোনো সংশয় থাকে না, নিজেকে নিঃসংকোচে প্রকাশ করা যায়। ব্যক্তিত্বে সাবলীল ভাব ফুটে উঠে।
- পরিবেশ অনুযায়ী সঠিক পোশাক না হলে মনে অস্বস্থি সৃষ্টি হয় এবং জড়তা তৈরি হয়। ফলে শরীর, মন আড়ষ্ট হয়ে ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশে বাধা সৃষ্টি হয়। নিজেকে আড়ল করার প্রবণতা দেখা যায়।
- পোশাকের আকার, নকশা, জমিন, রং ইত্যাদি ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব ফেলে। ঝাঁকজমকপূর্ণ নকশা বহুল, বড় ছাপা ও ভারী জমিনের বস্ত্রের পোশাকে স্তুল দেহাকৃতির ব্যক্তিকে আরও স্তুল দেখায়। কম নকশাযুক্ত ছোট ছোট ছাপা এবং হালকা জমিনের বস্ত্রের তৈরি পোশাক খর্বকায় ও স্তুল দেহাকৃতির ব্যক্তিদের জন্য উপযোগী। হালকা গড়নের ব্যক্তির জন্য টিলেটালা, পুরো হাতা, বড় ছাপা, গাঢ় রং ও ছোট গলার পোশাক উপযোগী। চেক বা ডুরে কাপড় ব্যবহারেও দেহের উপর প্রভাব পড়ে। যেমন— লম্বা বা খাড়া রেখার পোশাকে খর্বকায় ব্যক্তির দেহাকৃতি কিছুটা লম্বা দেখায়। অপর দিকে আড়াআড়ি রেখায় অতিরিক্ত লম্বা ব্যক্তিদের কিছুটা কম লম্বা মনে হয়।
- দেহের ত্বক, চুল, চোখের রঞ্জের সাথে মানানসই পোশাকের রং নির্বাচন করে দেহের ক্ষীণতা ও স্থুলতা ঢাকা যায়। নীল, সবুজ, নীলাত সবুজ ইত্যাদি স্লিপ্র রঞ্জের পোশাকগুলো স্থুল দেহের ব্যক্তিদের আপাতভাবে হালকা দেখায়। অন্যদিকে লাল, হলুদ, কমলা ইত্যাদি প্রথর রংগুলো হালকা গড়নের ব্যক্তির জন্য উপযোগী। অনুজ্জ্বল বর্ণের ব্যক্তিদের জন্য হালকা প্রতিফলনকারী কমলা, হলুদ, গোলাপি ইত্যাদি রঞ্জের প্রতিফলনে দেহের বর্ণ কিছুটা উজ্জ্বল দেখায়।
- উজ্জ্বল রংকে আনন্দদায়ক রং বলা হয়। বিভিন্ন আনন্দ উৎসবে এই রংগুলো পোশাকে ব্যবহার করা হলে ব্যক্তিত্বেও তার প্রভাব পড়ে। আবার কোনো শোক অনুষ্ঠানে হালকা রং, সাধাসিধে ডিজাইনের পোশাক পরা হলে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে।
- সামাজিক রীতি-নীতি ও সংস্কৃতির প্রতি লক্ষ রেখে পোশাক পরিধান করা হলে অধিক ব্যক্তিত্বপূর্ণ মনে হয়। উগ্র, অমার্জিত পোশাক সুন্দর ব্যক্তিত্বের পরিপন্থী।
- পোশাক ও ব্যক্তিত্বের পারস্পরিক ঐক্য স্থাপনের জন্য সাজসজ্জার আনুষঙ্গিক উপকরণগুলোর যেমন— জুতা, ব্যাগ, বেল্ট, কেশ বিল্যাস ইত্যাদির সমন্বয় ঘটাতে হয়।
- পোশাকের মাধ্যমে সামগ্রিক সাজসজ্জায় পারিপাট্য সৃষ্টি করার একটা অন্যতম শর্ত হলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। এলোমেলো চুল, ময়লা যুক্ত বড় বড় নখ পোশাকের মাধ্যমে সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে বাধা সৃষ্টি করে।

অন্তর্মুখী, বহির্মুখী এবং উভয়মুখী ব্যক্তিত্বের লোক রয়েছে। ব্যক্তিত্বের ভিন্নতা বুঝিতে প্রভাব ফেলে। কিন্তু যে ধরনের ব্যক্তিত্বেরই হোকনা কেন রুচিশীল মানানসই পোশাক ব্যক্তিত্বকে উজ্জ্বল করে।

কাজ - পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ কীভাবে ঘটে বুঝিয়ে দেখ।

পাঠ-৮: অপ্রয়োজনীয় বস্ত্রের ব্যবহার

গৃহে নানা ধরনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয় এবং অব্যবহৃত জিনিসের সূচি হয়। এগুলোর মধ্যে জীর্ণ ও পুরানো বস্ত্র অন্যতম। এসব অপ্রয়োজনীয় বস্ত্রকে নানাভাবে কাজে লাগানো যায়। যেমন—

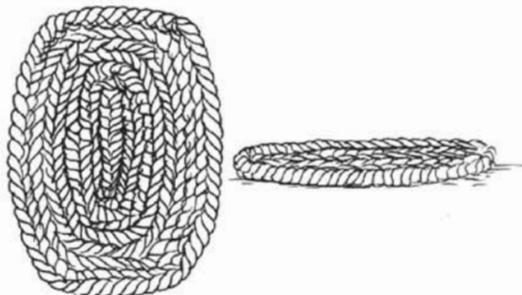
পুরানো বস্ত্র, শাঢ়ি, বিছানার চাদর, পর্দা ইত্যাদির রং চটে গেলে, সামান্য ছিড়ে গেলে ফেলে রাখা হয়। পুরানো কাপড়ের সাহায্যে আমের মেঝেরা সুন্দর করে নকশি কাঁথা বানায়। পুরানো কাপড়ের কাঁথায় নানা ধরনের লতাপাতা, দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়। এ ভাবে তৈরি হয় নকশি কাঁথা। বর্তমানে এসব কাঁথা শুধু শীতের আচ্ছাদন নয় বরং বিছানার চাদর, সোফার কাতার, দেয়াল সজ্জা, মেঝের আচ্ছাদন হিসেবেও ব্যবহার করা হয়।

পুরানো চাদর দিয়ে পা মোছার পাপোস তৈরি করা যায়, ধাপগুলো নিম্নরূপ—

- প্রথমে চাদরের একমাথায় গিট দিয়ে নিতে হবে
- এবার চাদরটিকে লম্বালম্বিভাবে তিন ভাগে ভাগ করে নিতে হবে
- তারপর চাদরটিকে কোথাও কুলিয়ে নিয়ে লম্বালম্বি করে শক্তভাবে বেলি করে নিতে হবে
- এখন কাপড়ের বেলীটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটার সাথে অন্যটা সুচ সুতা দিয়ে আঠকিয়ে ফেলতে হবে
- এই পাপোস গোলাকার বা ডিম্বাকৃতির হবে।

টুকরা কাপড়ের ব্যবহার :

বাড়িতে কাপড় সেলাইয়ের কাজ করার পর বিভিন্ন টুকরা কাপড় অপ্রয়োজনীয় অংশ হিসেবে বের হয়। বড় টুকরাগুলোকে একত্র করে একই মাপ ও একই আকৃতিতে কেটে সবগুলো কাপড় পরপর মেশিনে জোড়া লাগিয়ে চারপাশে কাপড়ের পাড় বা অন্য কাপড়ের বর্ডার দিয়ে বেড করার, টেবিল কভার ইত্যাদি তৈরি করা যায়।



পুরানো কাপড় দিয়ে তৈরি পাপোস

কাজ – গৃহে অপ্রয়োজনীয় বস্ত্র ব্যবহার করে পাপোস তৈরি করে দেখাও।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সহজলভ্য উভয় পরিষ্কারক দ্রব্য কোনটি?

- | | |
|---------------|----------|
| ক) ডিটারজেন্ট | খ) রিঠা |
| গ) শৈদ | ঘ) সাবান |

২। বারবার পানি দিয়ে ধূয়ে কাপড় থেকে সাবান ও ময়লা বের করাকে কী বলা হয়?

- | | |
|------------------|------------------|
| ক) কল্প দেওয়া | খ) হাওয়া লাগানো |
| গ) প্রক্ষালন করা | ঘ) শুষ্ক ধৌতকরণ |

নিচের উদ্দীপকটি গড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব রফিক শীতের মৌসুমের পর গরম কাপড়গুলো উঠিয়ে রাখেন। পরেরবার শীতের মৌসুমের আগে কাপড়গুলো ব্যবহার করতে শিয়ে দেখেন অনেকগুলো কাপড় পোকার দ্বারা নষ্ট হয়েছে।

৩। জনাব রফিক কাপড়টি সংরক্ষণের আগে প্রথমেই কী করতে হতো?

- ক) কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে নেপথলিন দেওয়া খ) নিমপাতা, তামাকপাতা কাপড়ে দেওয়া
- গ) সঠিক নিয়মে কাপড় ধুয়ে শুকিয়ে রাখা ঘ) সংরক্ষণের আগে আলমারিতে কীটনাশক স্প্রে করা।

৪। কাপড়টি নষ্ট হওয়ার কারণ—

- i. কাপড়গুলোর উপর কীটনাশক ওষুধ স্প্রে করা হয়নি।
- ii. মাঝে মাঝে হালকা রোদ ও বাতাসে কাপড় শুকানো হয়নি।
- iii. কালো জিরা, চাপাতা, নিমপাতা ব্যবহার করা হয়নি।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। রূপা পরিবারের বড় মেয়ে। ঘরের বিভিন্ন কাজের সাথে পরিবারের সদস্যদের পোশাকও তাকে পরিষ্কার করতে হয়। কয়েক দিন আগে কমলা রঙের রেশমি কাপড়টি ধোয়ার পর তিনি দেখতে পান তার কাপড়টির রং উঠে গেছে এবং সাদা কাপড়ের জমিনে সে রং লেগে গেছে। কাপড়টিও সংকুচিত হয়ে গেছে। কিন্তু তার নাইলন, পলিয়েস্টার কাপড়গুলো নষ্ট হয়নি।

- ক. রেশম বস্ত্রের কাঠিন্য ঠিক করতে কী ব্যবহার করা হয়?
- খ. কাপড়ে রিফু করা হয় কেন?
- গ. নাইলন ও পলিয়েস্টার কাপড়গুলো নষ্ট না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. রঙিন রেশমি বস্ত্রটি যথাযথ নিয়মে ধোয়াটাই যুক্তিযুক্ত ছিল— এ বিষয়ে তোমার মতামত দাও।

২। তানহা একটি গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য সাদা রঙের সালোয়ার-কামিজ পরে সাজসজ্জা করে উপস্থিত হয়। অনুষ্ঠানে যাওয়ার পর তাকে বেশ বিমর্শ দেখাচ্ছিল। তার মন খারাপ দেখে বাবা তাকে বললেন, ‘পরিবেশের সাথে মানানসই পোশাক ও সাজসজ্জা ব্যক্তিকে আকর্ষণীয় করে।’

- ক. আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অন্যতম শর্ত কী?
- খ. পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা প্রয়োজন কেন?
- গ. তানহাকে বিমর্শ দেখানোর কারণ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. তানহার জন্য বাবার মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।



দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা প্রহণ করতে হবে

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নারীশিক্ষা ব্যতীত জাতীয় উন্নতি অসম্ভব

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টেল ফি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য